প্রথম প্রকাশ : "রথযাত্রা" ১৩৬২

প্রকাশক :—
শ্রীবাসুদেব লাহিড়ী
ইষ্টলাইট বুক হাউস,
২০, ষ্ট্রাণ্ড রোড,
কলিকাতা—১

মুদ্রক :—
শ্রীনারায়ণ লাহিড়ী
লয়াল আর্ট প্রেস লিঃ
কলিকাতা—১

মূল্য :— তিন টাকা চার আনা।

ফুটবল বলতে বাংলাকেই বোঝায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই ফুটবলের কোন ইতিবৃত্ত নেই এবং এর জন্য কোন সময়ে কোন চেষ্টা হয়েছে বলে মনে হয় না।

সকল স্বাধীন দেশেরই সকল কাজের একটা না একটা ক্রমবর্ধমান পূর্ব্ববৃত্তান্ত থাকে। তাই আজ যে এই বইটি বার হয়েছে, তার জন্য উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করি।

আপনারা যারা ফুটবল ভালবাসেন, এই বইখানা পড়লে বুঝতে পারবেন যে, এই ফুটবল খেলা ইংরেজের আমলে কি বিপ্লব এনেছিল, কেন ফুটবল এত জনপ্রিয় হয়েছে এবং ফুটবলে বাংলার কি অবদান।

শ্রী গোষ্ঠ পাল

৬-৬-৫৫

লেখকের নিবেদন

বর্তমান কলকাতার জীবনে ফুটবল এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তার অন্যতম প্রধান অংশ। গত একশ বছর ধরে অনেক গৌরবময় ও রোমাঞ্চকর পথ বেয়ে আজ তা বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁচেছে।

ছেলেবেলায় আমরা ফুটবলের পুরানো গল্প সাগ্রহে শুনেছি, আজ আমা-দের শোনাবার পালা। কিন্তু আগ্রহ মেটাবার একমাত্র উপাদান স্মৃতি ও শ্রুতি। অথচ এরই মধ্যে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতি ঝাপসা হয়ে এসেছে, শ্রুতির পথ বেয়ে কাহিনীর নিত্য রূপান্তর ঘটছে। তাই এখনো সময় থাকতে পুরানো কথা লিপিবদ্ধ করে রাখবার ইচ্ছা জাগলো।

কিন্তু উপাদান কোথায়? প্রথম যুগে বিদেশী-চালিত খবরের কাগজগুলো নেটিভদের খেলাধূলো নিয়ে মাথা ঘামাতো না, আর দেশী কাগজগুলো খেলাকে স্বীকৃতি দিয়েছে অনেক পরে। কাজেই মূল উপাদানই সংগ্রহ করতে হয়েছে প্রবীণদের মুখ থেকে। আর খবরের কাগজে যেসব খবর ছাপা হয়না, তা লোকমুখে ছাড়া কোথায়ই বা পাওয়া যাবে?

অথচ গল্প বলতে গিয়ে অনেকেই বলেছেন, ঠিক মনে নেই বোধহয় এই রকম। অনেক সময় একই বিষয়ের বিপরীত কাহিনী শুনেছি বিভিন্ন লোকের মুখে। তার উপর অনেকেরই যখন নিজের স্মৃতির উপর অনাস্থা, সংকলয়িতা তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অনেকের আবার গল্প বলার সময় নেই। প্রাচীন নথী যাঁদের কাছে আছে, তা খুঁজে গুছিয়ে দেবার সময় করতে পারেননি অনেকে। এই অবস্থায় সংকলনের কাজে প্রথম প্রচেষ্টার ত্রুটি অনেক থেকে গিয়েছে, অনেক ফাঁক ও অনেক ভুল নিশ্চয়ই আছে। যেমন গোষ্ঠ বাবু বলেছেন এরিয়ান্সে কখনও খেলেননি তিনি, অথচ অনেক প্রাচীনের কাছ থেকে অন্য কথা শুনেছিলাম।

এমনি আরও অনেক ভুল হয়তো আছে। সঠিক বিবরণ দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি; তবু যা ভুল থেকে গেছে, তার জন্য কেউ তিরস্কার না করেন এই নিবেদন। খেলোয়াড়ি মনোভাব নিয়ে ভুল-ত্রুটি জানিয়ে দিলে বারান্তরে তা কৃতজ্ঞচিত্তে সংশোধন করবো।

এই প্রচেষ্টায় যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অগ্রজ-সাংবাদিক রমেশ গঙ্গোপাধ্যায় ও চণ্ডী চট্টোপাধ্যায় এবং বন্ধু-সাংবাদিক গোপাল মুখোপাধ্যায় ও অনিন্দ্য দাশগুপ্ত বিশেষ সহায়তা করেছেন। গোপাল বাবু তাঁর অমূল্য নথীপত্র যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকার না দিলে এক-পাও এগোতে পারতাম না। খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রবীণতম পি. কে. বিশ্বাস, ১৯১১ সালের হাবুল সরকার, তাঁর সমসাময়িক সুবল ঘোষ ও ফকির শীল এবং পরবর্তী যুগের সন্তোষ দত্ত, বীরেন ঘোষ, ছোনে মজুমদার, সন্মথ দত্ত, দুলাল বাবু ও সুশীল চট্টোপাধ্যায় অনেক তথ্য সরবরাহ করেছেন। আরও করেছেন এরিয়ান ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায় এবং শোভাবাজার রাজপরিবারের বিখ্যাত পণ্ডিত হারিতকৃষ্ণ দেব। বন্ধুবর সুনীলকুমার ধর প্রতিপদে আমাকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন। গোষ্ঠ বাবু তথ্য সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন। এই সংকলনে যদি কিছু কৃতিত্ব থাকে তো তা এঁদেরই প্রাপ্য।

অগ্রজোপম অজিত লাহিড়ী এবং বন্ধু স্বরাজ দাশগুপ্তের সৌজন্যে কতকগুলি ছবির ব্লক ব্যবহার করতে পেরেছি, তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞতা জানাই।

একটি ছোট্ট কাহিনী

এক ছিল কিশোর। মামার বাড়ী বেড়াতে গিয়ে সদ্য কলেজের পাঠ সাঙ্গ-করা ছোট মামার বৈঠকে ফুটবলের গল্প শুনে এল, সে রাজ্যের জনকয়েক দিক্‌পালকে দেখেও এলো চোখে। তারপর বাড়ী ফিরে সব গল্প বললে তার ছোট ভাইটিকে। শেষে একদিন চুপি চুপি কাউকে কিছু না বলে দুভাই চলে গেল গড়ের মাঠে।

প্রথম দর্শনে সেই যে প্রেমসঞ্চার হল, বছরের পর বছর বেড়েই চললো তা। কৈশোর ছাড়িয়ে এল তারুণ্য, তার পর এল যৌবন, সংসারের বোঝা পড়লো মাথায়, তবু সারা ফুটবল মরশুম জুড়ে ময়দানে যাওয়ার বিরাম নেই দুটি ভাইয়ের। ফুটবল ধ্যানজ্ঞান, মোহনবাগানের জেতা-হারায় মনে হাসি-কান্নার দোলা—প্রথমে আকাশকুসুম, তার পর হতাশা। ছোট ভাইটির ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রশ্নই ওঠেনি কোনদিন, দাদার হুকুমে তার সাথী হতে হয়েছে।

একবার ফুটবল মরশুমে রোগে পড়লো সে। সমস্ত দায়িত্বের সঙ্গে ছোট ভাইটির আর একটি কাজ হল, নিত্য খেলা দেখে এসে রোগশয্যাশায়ী দাদাকে তার বিশদ রিপোর্ট দেওয়া। মোহনবাগানের লীগের আশা যেদিন শেষ মিলিয়ে গেল, সেদিন যে কী দীর্ঘশ্বাস, "এ জীবনে আর হলনা"। কিছুদিন পরেই জীবনান্ত ঘটলো তার। পরের বছরই লীগ চ্যাম্পিয়ান হল মোহনবাগান। ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে ছোটভাই ময়দান, ফুটবল ও মোহনবাগানের সংস্পর্শ ছেড়ে দিলে একেবারে।

অনেক দিন পর আবার তাকে ময়দানে আসতে হল ও ফুটবলে মিশতে হল, এবার বৃত্তির আহ্বানে। মনের মধ্যে কিন্তু অতীতের দিনগুলিই তোলাপাড়া করে। সেই স্মৃতির রোমন্থন থেকে জন্ম নিল "কলকাতার ফুটবল," আর তা উৎসর্গীকৃত হল লেখকের সখা, সুহৃৎ, বন্ধু ও ফুটবল রসের দীক্ষাদাতা অগ্রজ গোপাল ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশে।

কেন টানে ফুটবল

মে মাসের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত বিকেল হতে না হতেই এসপ্লানেড-ড্যালহৌসীর পথ ধরে কাতারে কাতারে লোক ছোটে গড়ের মাঠ বা ময়দানের দিকে। দিনের পর দিন। একমাত্র রবিবারটা-ই যা ব্যতিক্রম। এর উপর মাঝে মাঝেই আবার আসে বিশেষ দিন। রাজনীতিতে নেহেরুর মিটিং-এর মত সেদিন সব পথেরই গতি একদিকে, অবাধ জনস্রোত বয়ে নিয়ে যায় পথগুলো।

সকাল নটা-দশটা, বাংলায় যাকে বলে 'অপিশ-টাইম', সেই সময় চাকরি-মুখো জনতা তর তর করে বয়ে চলে প্রতিদিন, একই সময়ে, একই ভাবে, একই দিকে। সে যাওয়ার প্রেরণা সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু এই বিকেলে যাওয়া? সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত দেহকে নিয়েও ছুটছে মানুষ হন হন করে, ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাবার কি ব্যগ্রতা!

গরমের দিনে সন্ধ্যা নামতে না-নামতেই ঝির ঝির করে হাওয়া বয় মুক্ত উদার গড়ের মাঠের বুক জুড়ে। কখনও বা সে হাওয়া হু হু করে ছুটে চলে। সারাদিনের পরিশ্রম চুকিয়ে দিয়ে দুদণ্ড তার মাঝে বসে বেড়িয়ে শরীর মন চাঙ্গা করে নেবার জন্য যদি ছোটে লোকে, তাতে আশ্চর্যের কিছুই থাকে না, ঘর-মুখো বলে যতই অপবাদ থাক না বাঙালীর।

কিন্তু কোথায় ঠাণ্ডা আর কোথায় হাওয়া? মে-জুনের রোদ তখন গায়ে পিন ফোটাচ্ছে, ঝর ঝর করে ঘাম ঝরছে গা কপাল বেয়ে। তার পর যখন বর্ষা নামে, তখন আকাশ-ঝাঁঝরা-হওয়া বৃষ্টি, হয়তো ঝড়ের মাতামাতি, ধুলোয়

সব ধূলাকার। লোহার দানার মত ভারি, ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ বৃষ্টির ফোঁটাগুলি গায়ে এসে শেলের মত বেঁধে। তা যা-ই হোক না কেন, যেমন করেই হোক যেতে হবেই।

কিসের এ দুর্বার আকর্ষণ? কোন কৃষ্ণের বাঁশি এমন করে অনিবার্য ভাবে টান্‌ছে সারা ব্রজকে!

তেত্রিশ বছর আগে স্কুলের ছাত্র যখন ছিলাম, তখন আমার কানে সে বাঁশি প্রথম বেজেছিল, আজও আমি ছুট্‌ছি। ছুটে চলতে চলতে এমন বুড়োদের সহযাত্রী পেয়ে যাই, যারা কর্মজীবন থেকে অনেকদিন অবকাশ নিয়েছে, এই ময়দানকেই কাশী-বৃন্দাবনের মত সার করেছে শেষ জীবনের পাড়ানির কড়ি হিসেবে। আর অনুদ্ভিন্নযৌবন কিশোরের দল, তারাও শুরু করেছে যাওয়া। গঙ্গা-যাত্রার আগে এ যাওয়া অনেকেরই ব্যাহত হবে কি না সন্দেহ।

কোথায় যায় এরা? কেন, ফুটবল দেখতে। একটা চামড়ার গোল থলে, তার মধ্যে হাওয়া পুরে সেটাকে নিয়ে দুদলের বাইশটা লোক লাথি মারছে, ছুটোছুটি করে লাথির চোটে কোন দল সেটা অপর দলের সুরক্ষিত তে-খোঁটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতারই এত নেশা।

শুধু কি দেখতে যাওয়াতেই শেষ? সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে খবরের কাগজে খেলার পাতাটাই দেখতে হবে সবার আগে। তাও একখানা কাগজ নয়, সব কখানা খুঁটিয়ে পড়তে হবে, কে কতটা মনের মত কথা লিখেছে। বেয়াড়া কিছু লিখে থাকলে সে রাগও চেপে রাখা সম্ভব নয়। তার পর আগামী বিকেলের পূর্বাভাষের জল্পনা-কল্পনাই কি কম? অফিসে স্কুলে কলেজে এই কটা মাস দুপুরের আলোচ্য বিষয়ই হল ফুটবল। খেলার শেষে মনের ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটবে যদি জিতে থাকি, আমি—মানে আমার প্রিয় দল। নইলে মহরমের ঘোড়ার মত বে-রাশ হয়েও মাথা নিচু করে

চলবে, কোন মতে শরীরটাকে টেনে নিয়ে। তার পর ট্রামে বাসে আলোচনা শেষ করে শুরু হবে গলির মোড়ে বা র'কে বা বৈঠকখানায় গুলতানি। ঠাকুর-মা বলতেন, সাধু-সন্ন্যাসী এতখানি কৃষ্ণ চিন্তা করে না, তোরা মোহনবাগানের মোহে যেমন পাগল গোরাচাঁদ বনে যাস।

যেদিন ভারিক্কি কোন খেলা, সেদিন মাত্র সতের হাজারের বেশি লোক মোটা টাকা খরচ করেও মাঠে ঢুকতে পারবে না, একথা জেনেও যে জন-সমুদ্র মাঠের চার পাশে জমা হয়, সারা বাংলার এক দিনের সিনেমা দর্শকের সংখ্যাও তার কাছে হার মানে। এখানে ছোট-বড় নেই, পণ্ডিত-মূর্খ নেই, সবাইকে ছুটতে হয় একটানে। সবাই এক মন্ত্রের সাধক, যেন একই গুরুর চেলা। জয়-পরাজয়ে সবারই মনে আনন্দ-বিষাদের জোয়ার-ভাঁটা বয়, কিছু কম-বেশি, এই যা।

আর গোল যখন হয়-হয় হয় না, তখনকার শঙ্কা ও বিরক্তি যেভাবে ভাবা, অর্থহীন শব্দ, মুখভাব ও হাত-পা নাড়ার মধ্যে ফুটে বেরয়, তাকে রূপ দেবার মত দক্ষ শিল্পী ত চোখে পড়ে না। সবশেষে গোলের উৎকট উল্লাস, ছাতা জুতো জামা গেঞ্জি বে-পরোয়া ওড়ে আকাশে।

এক শ্রেণীর লোক আছেন, উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ নীলরক্তের রেওয়াজমত মাপা হাসি, বিজ্ঞতাপূর্ণ গাম্ভীর্য এবং মৃদু ও স্বল্প ভাষণ ছাড়া অন্যভাবে মনোভাব প্রকাশ যাঁরা কোন মতে বরদাস্ত করতে পারেন না, তাঁরা গোলের শেষে এই উদ্দাম হর্ষ-প্রকাশকে শ্লেষ করেন, ইতর-জনোচিত বলে ফুটবল মাঠটাকেই অসংস্কৃতের জমায়েত বলে অবজ্ঞা করেন। কিন্তু বাধা-বন্ধহীন বল্গাছাড়া যে আনন্দ, তার প্রকাশের সুযোগ স্বাভাবিক জীবনে মেলে না বলেই ত মানুষ রিক্রিয়েশন খোঁজে। আর যে রিক্রিয়েশনে মনের আনন্দকে উজাড় করে উড়িয়ে দেওয়া যায়, আকাশে বাতাসে ঢেউ তুলে, তারই প্রতি সাধারণ মানুষের বেশি টান। ছাতা জুতো জামা উড়িয়ে যারা মনের উল্লাস

প্রকাশ করে, তারা পরের কথা যেমন ভাবে না, নিজের কথাও ত তেমনি একেবারে ভুলে যায়। নইলে জামা ছাতা ছিঁড়ে উড়িয়ে দেবার মত অবস্থা কি তাদের ? সমাজের কোন ক্ষতি না করে মনের অবাধ আনন্দ প্রকাশের সুযোগ ফুটবলেই মেলে, যে আনন্দ প্রকাশের অবকাশকে কবি, সাহিত্যিক, সমাজতাত্ত্বিক ও মনোবিজ্ঞানীরা সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অপরিহার্য জ্ঞান করে থাকেন।

দু'শ' বছর ইংরেজের প্রজা থেকে পশ্চিম দুনিয়ায় ভালোমন্দ অনেক কিছুই আমরা পেয়েছি। মাত্র ক'বছরের স্বাধীনতায় তার অবাঞ্ছনীয় অংশের অনেক কিছুই এখনও ঝেড়ে ফেলতে পারিনি। কিন্তু অনেক কিছুই যে দূর হবে, তাও জানা এবং বোঝা গিয়েছে, দুদিন আগে না হয় পরে। কাঁচা রঙ্ যা কিছু, তা ফিকে হতে আরম্ভ করেছে এরই মধ্যে।

কিন্তু সবই তো আর কাঁচা রঙ্ নয়। ইংরেজের কাছ থেকে শিখেছি বা পেয়েছি বলেই তা পরধর্ম নয়। কলের জল, বিজলীর আলো-পাখা, রেল জাহাজ মোটর এরোপ্লেন, আধুনিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, প্রজা হিসেবে রাজার জাতের কাছ থেকে প্রথম পেয়েছিলাম—একথা মনে করে কেউ কি এগুলো বাতিল করার কথা ভাবেন ?

এমনি একটা কোনদিন বাতিল না হওয়ার মত পশ্চিমী সভ্যতার ছাপ যা আমাদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে, তা হল ফুটবল। আধুনিক জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন না হলেও, আধুনিক মনের দুর্নিবার আকর্ষণ।

কলকাতার শহরটা ইংরেজ পত্তন করেছিল, লালনও করেছিল তারাই। আর তাদেরই আওতায় কলকাতার নতুন জীবনধারা গড়ে উঠেছিল। ইংরেজরা যে আমাদের সুসভ্য করার ব্রত নিয়েছিল, একদল মুষ্টিমেয় নেটিভকে

শিক্ষায় দীক্ষায় রুচিতে অভ্যাসে মনে ও প্রাণে সাহেব বানাবার যে চেষ্টা করেছিল, বর্তমানের ক্যালকাটা কালচার তার থেকেই জন্মলাভ করেছে। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও মিশনারি কলেজগুলি, শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও মেডিকেল কলেজ—এগুলিই ছিল সেই দেশী-সাহেব গড়ার কারখানা। বাঙলার বনেদী ঘরের ছেলেরা সেখানে সাহেবীআনায় দীক্ষা নিলেও স্বজাতিগর্বকে একেবারে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেনি মন থেকে। তাই, দিয়ে নিয়ে তারা যে মিশ্র সংস্কৃতি সৃষ্টি করলো, তাতেই হল ক্যালকাটা কালচারের শুরু। সেই সব কলেজী বাচ্চা-বাগানে লালিত হয়েই তা ছড়িয়ে পড়লো বৃহত্তর সমাজে। ইংরেজীআনার যে প্রলেপ চড়িয়ে বাঙালীআনা নবরূপ পরিগ্রহ করেছিল, ক্রমে তার বাইরের রং শুষে ভিতরে গিয়ে এমনভাবে মিশে গেল যে, আজ তার প্রথম পরিচয় খুঁজে পাওয়াই ভার।

বিদেশে বিজাতীয় পরিবেশে ইংরেজরা মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে তাদের স্বদেশী খেলা ফুটবল খেলে আনন্দ করতো। একে রাজার জাত, তায় চাকুরি ও ব্যবসায় জীবনে অন্ন-বস্ত্রের মালিক। তারও উপর সুসভ্য ইংরেজ। তাদের প্রতি ভক্তিতে নেটিভরা গদ গদ ছিল। তারা যখন অদ্ভুত একটা কিছু করছে, তা দেখবারই শুধু আগ্রহ হত না, অনুকরণে স্পৃহাও জাগতো। সে স্পৃহায় প্রথম ইন্ধন জুটলো নকল-সাহেব তৈরীর কারখানারূপী কলেজগুলিতে। তারপর নকল করতে গিয়ে যে মজা পেলে লোকে তার মধ্যে, তারই ফলে ফুটবল ছড়িয়ে পড়লো শহরের সর্বসাধারণে।

ক্রমে শহর থেকে তা গেল শহরতলীতে। তারপর মফস্বল শহরে; এবং সেখান থেকে পল্লী-অঞ্চলে তা অনুপ্রবেশ করলো। মোহনবাগানের শীল্ড পাওয়াকে যদিও ফুটবলের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বলা চলে, কিন্তু তার আগেই গণ্ডগ্রামে পর্যন্ত ফুটবল ছড়িয়ে পড়েছিল। নইলে শীল্ড-বিজয়ী মোহনবাগান

দলে পল্লী-বাঙলা থেকে সদ্য এসে যোগ দেওয়া খেলোয়াড়দের সন্ধান মেলে কেমন করে!

ফুটবলের আদি কথা ঘাঁটতে গেলে তার প্রথম আবির্ভাব যে দেশেই হোকনা না কেন, খেলাটা মুখ্যত ইংরেজেরই খেলা। তাদের দেশেই সর্বপ্রথম সাধারণ মানুষ এই খেলা দেখবার নেশায় মশগুল হয়ে পড়ে। অবশ্য মাত্র একশো বছর আগেও, যখন এদেশে প্রথম ফুটবলের বীজ ছড়ায় কলকাতার ইংরেজ বড়-সাহেবরা, তখন পর্যন্ত ফুটবল ইংলণ্ডে ব্রাত্য, র‍্যাবল বা ফালতু আদমিদের খেলা। ইটন হ্যারোর ছাত্রদের মধ্যে ফুটবল তখনও কোন মর্যাদার আসন পায়নি। কিন্তু স্বদেশে জাতে উঠতেই ফুটবলের যতটুকু দেরি হয়েছিল। তারপর তা বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত দুনিয়াময় প্লাবন বইয়ে দিয়েছে। দেশজাতি-নির্বিশেষে ফুটবলই আজ জনসাধারণের প্রধানতম খেলা, দেহসঞ্চালন ও মনোবিনোদনের উপকরণ।

তবু একথা বোধ হয় জোর করেই বলা যেতে পারে যে, বাঙালী-ই এশিয়ার প্রথম নেটিভ সমাজ, যারা ফুটবলকে নিজের ঘরে আপন করে তুলে নিয়েছে। অবশ্য শুধু ফুটবলই নয়, পশ্চিমী সংস্কৃতির ভালোমন্দ যা-কিছু আজ সমগ্র পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত, পূব-দুনিয়ায় বাঙলা-ই সবার আগে তার সব কিছু রপ্ত করেছে।

কিন্তু দুষ্কুল থেকে স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে তোলা তখনই শাস্ত্রবিহিত, যখন সেই স্ত্রী হয় রত্নভূতা। ইংরেজের ফুটবলকেও শেষ পর্যন্ত বাঙালী যে আপন করে নিতে পেরেছে, তাতে ফুটবলের নিজস্ব আকর্ষণ নিশ্চয়ই কাজ করেছে।

বাঙালী ছাত্রসমাজকে সাহেবীআনায় দীক্ষিত করার অপরিসীম আগ্রহ ছিল শাসক জাতির। দু'শ' বছর ধরে ভারতের মাটিতে যে-সব সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করে ইংরেজ সরকার দুনিয়াময় বাহাদুরি কুড়িয়েছে, তারও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাহেবী সভ্যতায় দীক্ষিত করে আমাদের মনে জাতীয় সভ্যতা

ও সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞার ভাব জাগানো, সম্ভবমত তা একেবারে ভুলিয়ে দেওয়া। তাই চেষ্টা চলেছে আমাদের হ্যাট কোট নেক-টাই পরানো, টেবিলে বসে কাঁটা চামচ দিয়ে স্যুপ মাংস আর পেষ্ট্রি খাওয়ানো, চোস্ত ইংলিশ বুলি বলানো রাজদরবারের সঠিক উচ্চারণে, আর ইংরেজী সমাজিক জীবনের প্রধান অঙ্গ ক্রিকেট ও ফুটবল খেলানো। একথা আজ আর গোপন নেই যে বাঙলার প্রথম সন্ত্রাসবাদ এবং অনুশীলন সমিতির আকর্ষণ থেকে যুবসমাজকে টেনে সরিয়ে রাখার জন্যই ফুটবলের বিকল্প আকর্ষণ জনসমাজে প্রসার করার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ চেষ্টা হয়েছিল অনেক। সরকারী ও বে-সরকারী সব রকম মাধ্যমই ব্যবহার হয়েছিল তাতে। বলতে কি, স্কুল-কলেজের এবং সরকারী আগ্রহের ফলেই সেদিন ফুটবল এত সহজে প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। আর সে আগ্রহের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাঙালী যুবসমাজকে যে কোন রকম জাতীয় আন্দোলন থেকে পথভ্রষ্ট করা।

কিন্তু সেদিনের ইংরেজ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে একদিন এই সব মনেপ্রাণে ও বহিরাবরণে ইংরেজীআনায় দীক্ষিতের দলই ইংরেজের জাতীয়তা-বাদ ও স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজভাষাকে রাজদ্রোহ প্রচারে ব্যবহার করবে, বিতাড়িত বিদূরিত করবে তাদের। ফুটবলে মোহনবাগানকে কেন্দ্র করেই ইংরেজ-বিদ্বেষ ও জাতীয়তাবাদ প্রবল হয়ে উঠবে। ক্রিকেটে ইংরেজ ব্যাট্‌স্‌ম্যানকে ভারতীয় বোলারদের হাতে আউট হতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ জাতকেই ভারতের মাটি থেকে আউট করার স্বপ্ন দেখবে লোকে।

অল্প খরচায় বা একান্ত নিখরচায় বাতাবী লেবু বা চালতা দিয়ে প্রথম কৈশোরে ফুটবল শুরু করা সম্ভব পল্লীপ্রধান বাঙলার খোলা মাঠে। এক

ঘণ্টার মার-মার কাট-কাট, যুদ্ধের বিকল্প উন্মাদনা অনুভব করার সহজ সুযোগ বৈচিত্র্যহীন জীবনে। এই আকর্ষণেই রাজার জাতের খেলা সাধারণ বাঙালী সমাজ প্রথম গ্রহণ করেছিল। খেলা দেখার মধ্যেও যে আসল উত্তেজনার সবটুকু উপভোগ করা যায়, এই অভিজ্ঞতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র দর্শকসংখ্যা বাড়তে লাগলো, আর অনেক লোকের বাহবা কুড়িয়ে বীর বলে প্রতিভাত হবার মোহে বাড়তে লাগলো খেলার আগ্রহ।

পায়ে করে একটা হাওয়া-ভরা চর্ম-গোলককে লাথি মেরে এপার ওপার করার মধ্যে কি কৃতিত্ব আছে, মননগর্বে কেউ কেউ সে রহস্য সমাধান করতে না পেরে জনসাধারণের মূর্খতায় হতাশা প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনোরাজ্যে এই লাথি-মারা ওস্তাদরা এক একজন মহাবীর। তাদের শুধু চোখের দেখাটুকু দেখবার জন্য কি আকুল আগ্রহ নিয়ে জমা হয় লোকে! একথা কোনমতে অস্বীকার করতে পারবেন না কেউ, যে যুগে গোষ্ঠ পাল ফুটবল খেলতেন, সে যুগের সব চেয়ে প্রখ্যাত ও জনপ্রিয় বাঙালী ছিলেন তিনিই। নিজে দেখে এসেছি সুদূর পল্লীগ্রামে, যেখানে সপ্তাহে একদিন ডাক যেতো, সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী ও হিতবাদী-ই বাইরের জগতের যা-কিছু সংবাদ পরিবেশন করতো, সেখানকার কিশোর চাষীর ছেলে চালতায় লাথি মেরে গোষ্ঠ পালকে স্মরণ করছে, আর শিক্ষিত ভদ্রসমাজে ত তাঁর নাম দিনে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। বুদ্ধিপন্থী সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রণী যে অন্নদাশঙ্কর, তাঁরও গল্পের উন্নাসিক কয়েকটি চরিত্র সা-রে-গা মা'র প্রসঙ্গ শুরু করে, গামা পালোয়ান হয়ে গোষ্ঠ পালের আলোচনায় আপনা থেকেই চলে আসে।

আজ স্বাধীন দেশে দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। কিন্তু একদিন আমরা পরাধীনতার জ্বালায় সব কিছুকেই মনের দৃঢ়মূল ইংরেজবিদ্বেষের রঙে রঙীন করে দেখেছি। বড় ইংরেজ লেখক বা বক্তার মত ইংরেজী কোন ভারতীয়

লিখতে বা বলতে পারলে, তার ভিতর আমরা যেমন সেদিন আমাদের সমযোগ্যতার সন্ধান করেছি, সে যুগে কলকাতা ফুটবলের প্রধান আকর্ষণও ছিল সেই সমযোগ্যতা বা যোগ্যতরতার প্রমাণে।

১৮১২ সালে ভেতো বাঙালী দল শোভাবাজার—সাহেবরা যাদের অবজ্ঞাভরে 'বাবুর দল' বলতো—তারা যেদিন প্রথম ইংরেজের খেলা ফুটবলে এক ইংরেজ গোরা দলকে হারিয়ে দিয়েছিল, সেই মুহূর্তে আমরা ফুটবলকে মনের সিংহাসনে আসন দিয়েছিলাম। শুধু আমরা কেন, লণ্ডন টাইমসের সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাকে একটি বিশেষ ঘটনা বলে মন্তব্য করা হয়েছিল।

তারপর ১৯১১ সালে যখন আর এক নাঙ্গা-পা 'বাবুর দল' মোহন বাগান বৃটিশ সামরিক ও বে-সামরিক সব দলের মধ্যে প্রতিযোগিতায় আই. এফ. এ. শীল্ডে বিজয়ী হল, সেদিন থেকে আমরা ফুটবলকেই আমাদের তুলনামূলক অযোগ্যতার বিরুদ্ধে প্রধান প্রমাণ হিসেবে আঁকড়ে ধরলাম।

তখনও গঙ্গার ধার, ইডেন গার্ডেন, ময়দান ও চৌরঙ্গী অঞ্চল সাহেবদের নিজস্ব এলাকা। নেটিভরা শান্ত শিষ্ট ছেলের মত এক-আধ বার পার হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এতটুকু তেড়িয়াগিরি প্রকাশ পেলে গোরা পল্টনের লাথি, ছড়ি ও গলাধাক্কা অনিবার্য।

ইংরেজের অফিসে বড় ছোট মেজ সাহেব গণ্ডায় গণ্ডায়। যোগ্যতা তাদের যাই হোক, দাপট—বাদশাহী এবং মাইনের তাদের সীমা পরিসীমা নেই। অথচ যথেষ্ট যোগ্যতা নিয়েও বাঙালীর ছেলে সেখানে কেরানীগিরির বেশি স্বপ্ন দেখতে পারে না। সতত ভয়ে ও সমীহায় সন্ত্রস্ত হয়ে চাকুরি বাঁচায়। কিন্তু মনে ত বিক্ষোভ জাগেই, নিষ্ফল আক্রোশে তা দিন দিন মনের ভিতর পুঞ্জীভূত হতে থাকে।

চারদিকে লৌহ প্রাচীরের বেষ্টনীতে মনকে চেপে রেখে চলতে চলতে মন যখন হাঁপিয়ে উঠেছে, তখন মুক্তি মিলেছে একমাত্র ফুটবল মাঠে।

সাহেবদের জন্ত সুরক্ষিত সাদা আসনের এলাকার দিকে পা বাড়ানো যেতো না বটে। কিন্তু চার আনা দিয়ে সবুজ গ্যালারিতে গিয়ে বসে একটা বিড়ি ধরিয়েই নিজেকে নির্বিবাদে যে-কোন গোরা পল্টন বা বড় সাহেবের সমকক্ষ মনে করার কোন বাধা ছিল না, মাত্র ঐ সময়টুকুর জন্য।

মনে করবোই বা না কেন ? আমারই জাত ভাই-এর দল যখন খেলার মাঠে তোমাদের নাকাল করছে, তখন তুমি দুর্ধর্ষ গোরাই হও বা আমার অফিসের বড় সাহেবই হও, তুমি নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ছোট; অন্তত বড় নও কোনমতে। তাছাড়া, কোন জারিজুরি চলবে না তোমার এখানে। তোমার জাত-ভাই রেফারি তোমার শয়তানি সহ্য করলেও গোষ্ঠ পাল বলাই চাটুজ্যেকে ভয় করবে না তুমি, এত বড় বুকের পাটা নেই তোমার। বেশি তেড়িবেড়ি করলে দেবে হাসপাতালে কি যমের বাড়ি পাঠিয়ে, এক চোখের পলকে একটা লাথি মেরে, সাপের ছোবলের মত বিদ্যুৎ-গতিতে।

তাছাড়া, সামাদকে ত জান। যখন গোঁফে একটা মোচড় মেরে তোমার দিকে খানিক নাকের শিকনি ঝেড়ে দেবে, তারপর বল নিয়ে শুরু করবে ভানুমতীর খেল, তখন তোমাদের এগার জনের ত তালে তালে বাঁদর নাচা ছাড়া অন্য উপায় থাকবে না।

ওখানেই শেষ নয়, আমরাও আছি। গ্যালারিতে যতক্ষণ বসে আছি, আমার গলা আর জিভের উপর কোন রাশ নেই। গালাগাল দিয়ে বাপান্ত করে ভূত ভাগিয়ে দেব। বড়সাহেবী ফলাবে অফিসে গিয়ে। গোরা পল্টন দিয়ে ছড়ির বাড়ি, লাথি ও গলাধাক্কা দেবে, তাও মাঠের বাইরে বেরুলে। কিন্তু ফুটবল মাঠে, আমার স্বজাতির জন্য নির্দিষ্ট আসনে, এই সময়টুকু আমি স্বাধীন বে-পরোয়া। আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ব্যাহত ব্যর্থ জীবনযাত্রায় এই দু-এক ঘণ্টার বাদশাহীর নেশা যে কি, আজকের

তরুণ দল তা কোন মতেই অনুভব করতে পারবে না। আর সেই কারণেই আজ বোঝা সম্ভব নয়, কি করে সেদিনের ফুটবল সমগ্র জাতীয় জীবনকে চেতনার কষাঘাতে জর্জর করে দিয়েছিল, পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করিয়েছিল হাতে হাতে। যে রোগ নিরাময়ের জন্য ফুটবল প্রসারে এত-খানি পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল রাজার জাত এবং তাদের বন্ধু স্থানীয় বাঙালীর দল, ফুটবলের ভিতর দিয়ে সেই রোগই কি-না শেষ পর্য্যন্ত বেড়ে গেল।

আরে ! যে মোহনবাগান শীল্ড জিতলে ১৯১১ সালে, বছরের পর বছর তারা শুধু হেরেই চলেছে, না শীল্ড না লীগ, না ক্যালকাটাকে হারানো। এ দুঃখ কি সওয়া যায় ! যায় না, কিন্তু উপায়ও নেই, তাই সান্ত্বনা খুঁজতে হয়।

জিতবে কি করে ? সাহেব দলগুলো খেলবে চোদ্দ জনে। তার মধ্যে তিনজন আবার বিচারক, অর্থাৎ রেফারি ও লাইনস্‌ম্যান হিসেবে খেলোয়াড়দের ন্যায়-অন্যায় বিচার করবার অধিকার তাদের। মোহনবাগান গোল করলে বাঁশি বাজিয়ে গোলের সামনে আঙুল দেখিয়ে সাহেব দলকেই শট মারতে দেবে রেফারি, অফ-সাইড, ফাউল বা হ্যাণ্ড-বলের ওজুহাতে। আর সাহেব দল কোন মতে গোলে বল ঢোকালেই রেফারির মুখের বাঁশির সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হাত নির্দেশ করবে মাঝ-মাঠের দিকে। লাইনসম্যানের ফ্লাগ, সে ত কর্ণার চুরি করবার জন্য, অকারণ অফ-সাইডের নির্দেশ দিয়ে আক্রমণ ছত্রভঙ্গ করবার জন্যই আছে।

খেলার মাঠ, তারিখ ও ফিক্সচার—সব ইংরেজের আই. এফ. এ. এমন ভাবে করবে, যাতে ১৯১১ সালের পুনরাবৃত্তি আর না ঘটতে পারে। অর্থাৎ নেটিভরা যে কোন মতেই কোন কিছুতে সাহেবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, এই স্বপ্রতিষ্ঠ সত্যে যেন আর ব্যতিক্রম না ঘটে কোন রকমেই। সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনেই খেলা-পরিচালকদের সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলে না জানলে সে জাতকে রাজসম্মান দেবে কেমন করে প্রজাকুল !

এমনি অবিচার যে হামেশা ঘটতো এমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু পরাজয় ও ব্যর্থতার সঙ্গে পরিবেশকে মিলিয়ে সে যুগের জনগণ এই ব্যাখ্যাই করতো সব সময়, আর তারই ফলে ইংরেজ-বিদ্বেষ ও পরাধীনতার জ্বালা ফুট-বলের ভিতর দিয়ে ক্রমশ প্রবলতর হতে থাকে। রাজনৈতিক অধীনতা যে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রকেও ব্যাহত করে, এই তত্ত্ব সাধারণ মানুষ ফুটবলের মাধ্যমেই উপলব্ধি করতে শেখে।

আজ স্বাধীন দেশে এ সব গল্পকথার মত শোনায়। কিন্তু নিজ বাসভূমে পরবাসী যারা, তাদের ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন নামক পরিচালক সমিতিতে একদিন ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার ছিল না। লীগ ফুটবল, তা প্রথম বিভাগ বা দ্বিতীয় বিভাগ যাই হোক না কেন, সেখানেও ভারতীয়দের খেলার অধিকার মিলেছে মোহনবাগানের শীল্ড বিজয়েরও তিন বছর পরে। তারপরেও বহুদিন প্রথম বিভাগ লীগে গোণা দুটির বেশি দলকে জায়গা দেওয়ার নিয়ম ছিল না। ইংরেজদের প্রবর্তিত ও পরিচালিত ইংরেজী খেলায় দয়া করে উঠোনের কোণে যেটুকু সামান্য স্থান দেওয়া হয়েছিল, আইনের বেড়া ভেদ করে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ন্যায্য অধিকার দাবি করতে অনেক সময় লেগেছিল ভারতীয় ফুটবলারদের। অবশ্য তাদের হয়ে সংগ্রাম করেছে জনসাধারণ, আর জনসাধারণের মনে প্রেরণা দিয়েছে খেলোয়াড় ও ক্লাবগুলির ক্রীড়ানৈপুণ্য। এর মধ্যে বিক্ষুব্ধ জনতা গ্যালারি পুড়িয়েছে, আত্মসম্মান রক্ষায় মোহনবাগান মাঠের ভিতরে ও বাইরে অসহযোগ করেছে, আর সেই নেতৃত্বে আন্দোলনে সহযোগিতা করেছে আর সব ভারতীয় খেলোয়াড় ও ক্লাব।

এমনি করে নানা পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা বেয়ে আজ ফুটবল সর্ব-ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ইংরেজের রাজনৈতিক সংস্কার প্রবর্তনের মত শম্বুক গতিতে ভারতীয় দলের স্বীকৃতি বেড়েছে, কি লীগে, কি পরিচালক

সংস্থায়। আর জনগণের ফুটবলপ্রিয়তায় কত লক্ষ টাকা যে কামিয়েছে মাঠ ঘেরার ঠিকেদার কোম্পানি, তার লেখা-জোখা নেই। ফুটবল থেকে খয়রাতও করা হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, নানা যোগ্য-অযোগ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে।

সাহেব ও গোরা পল্টনের যুগেই জেগে উঠ্‌লো মোহনবাগান, জনগণের আশা-আশঙ্কাকে কেন্দ্রীভূত করে। তারপর ইষ্ট বেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং আত্মপ্রতিষ্ঠা করে দিগ্বিজয়ী কেতন উড়িয়ে দিলে দিকে দিকে। আজ এক কলকাতা ময়দানের নিয়মিত ফুটবল খেলাতেই যোগ দেয় কমসেকম আড়াই হাজার খেলোয়াড়। তারপর কলকাতার আঞ্চলিক সংস্থাগুলির নিজস্ব ব্যবস্থা আছে ; আছে জেলায় জেলায়, সারা ভারতের শহরে ও গ্রামে।

এমন গ্রাম নেই পল্লী অঞ্চলে, এমন গলি নেই শহরে যেখানে ফুটবল খেলা নেই। মাঠ বা বল না থাকলেও, যে কোন ভাবে ফুটবল খেলবেই ছেলেরা। স্কুল কলেজ আফিস—সর্বত্র ফুটবল খেলার প্রচলন। আর যারা ফুটবলের স্বপ্নে মশগুল হয়ে ফাটাচ্ছে রক, জমিয়ে তুলছে গলির মোড়ের গুলতানি, ঝড় তুলছে চায়ের দোকানের হাফ-কাপে, ওড়াচ্ছে প্রিয়দলের বিজয় স্বপ্নের রঙীন বেলুন, তাদের সংখ্যা গোণা-গুণতির বাইরে। তেমন তেমন খেলা দেখবার জন্য গৌহাটি দলসিংপাড়া থেকেও লোক আসে কলকাতায়। ঝড়-বৃষ্টি-রোদ মাথায় করে ১০৮ ঘণ্টা খোলা মাঠে লাইন দিয়ে বসে থাকে। কলিযুগে এতখানি কৃচ্ছ্রসাধনা আর কোন কিছুর জন্যই করে না মানুষ।

আজ এই বিরাট ভারত-পাকিস্তান উপ-মহাদেশের অখ্যাত অবজ্ঞাত দরিদ্র গ্রাম্য কিশোর থেকে শুরু করে, রাজধানীর নয়া ওমরাহ-সমাজ পর্যন্ত সমান আগ্রহ নিয়ে থাকে ফুটবলে। জাতীয় প্রতিযোগিতায় ভারত রাষ্ট্রের প্রতিটি রাজ্য প্রতিনিধিমূলক দল নিয়ে সোৎসাহে যোগদান করে। বড়

বড় প্রতিযোগিতা, তা যে কেন্দ্রেই অনুষ্ঠিত হোক না কেন, তাতে অংশগ্রহণ করতে দল বেঁধে লোক ছুটে আসে দূর দুরান্তর থেকে। একথা নির্বিবাদে মেনে নিতে হবে, যে ফুটবল আজ আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সংস্কৃতি বলতে অবশ্য আমি বাস্তব ও জীবন্ত সংস্কৃতিকেই বোঝাতে চাই।

সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় বাঙলার নৈপুণ্য সাময়িক ভাবে ব্যাহত হতে দেখে আজ আমরা ব্যথিত। কিন্তু ভালোয় মন্দয়, নানা দুর্যোগের মধ্যে বুকে আঁকড়ে ধরে ও পরম যত্নে লালিত করে, বাঙলাই যে ফুটবলকে সারা ভারতের জনসমাজে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে, সে কাহিনী নব ভারত বিবর্তনের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট অধ্যায় বলে বিবেচিত হবার দাবি রাখে।

আজি হতে শত বর্ষ আগে

এই যে ফুটবল ফুলে-ফলে শোভিত অরণ্যানী হয়ে আজ সারা ভারতের মনোজগৎ জয় করে সমাজ-জীবনেও ছায়া বিস্তার করেছে, এর ইতিহাস কিন্তু বেশিদিনের নয়। মাত্র একশ বছরের। অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের কয়েক বছর আগে মাত্র ফুটবলের বীজ এদেশে প্রথম রোপিত হয়েছিল। তাও অঙ্কুরিত হয়েছিল অনেক পরে, উনিশ শতকের শেষের দিকে।

শতবর্ষ আগে যা ঘটেছিল, সে ঘটনা তখনকার দিনে এত নগণ্য ছিল, যে তার কোন খবরই কেউ রাখেনি। সনটা আজ উদ্ধার করা গেলেও, তার সঠিক তারিখের হদিশ পাওয়ার কোন উপায় নেই।

ঠিক শতবর্ষ আজ আর বলা চলে না, কারণ ১৮৫৪ সালে ঘটেছিল ব্যাপারটা। এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে।

কলকাতা তখন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী। তার সেদিনকার চেহারাও যেমন আজ বুঝবার উপায় নেই, সেদিনকার সমাজও আজ বিলুপ্ত এবং বিস্মৃত।

তাছাড়া, সেদিন ইংরেজ রাজপুরুষ এবং বেনিয়ারা সবাই ছিল আমাদের সবার কাছে সত্যিকার দেবতা। সেদিনের ঐতিহ্য বহন করেই না এই শতকের প্রথমদিকে এক মুখোপাধ্যায় তাঁর বিধবা মেয়েকে দিয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া-তনয় ওয়েল্‌সের যুবরাজের চরণার্চনা করিয়েছিলেন। সেই যুগের প্রচলিত খেলা গোলকধামের ছক কিনলে দেখতে পাবেন, তার মধ্যে শ্বেতদ্বীপ কৈলাসের চেয়ে অনেক ওপরে, প্রায় গোলক-ধামের কাছাকাছি:

সেই শ্বেতদ্বীপের দেবতারা এসে লীলা করতেন, আমাদের দর্শনের মধ্যে— একেই পরম ভাগ্য বলে মানতাম। তা'বলে দেবতাদের 'নিলে' কি সব বুঝতে পারে মানুষে! সত্যি, সেদিন যখন এস্‌প্ল্যানেডের ময়দানে সর্বপ্রথম দু'দল ইংরেজ এক ফুটবল ম্যাচ খেলেছিল ভারতের মাটিতে, এই নতুন লীলা বুঝবার সাধ্য কারও ছিল না। তাই দেশের লোক তা দেখতে জমায়েত হয়নি। আর যাবেই বা কোন্ সাহসে, সে দিনের এস্‌প্ল্যানেডে, ইংরেজের সামাজিক অনুষ্ঠানে?

অনুষ্ঠানটি আসলে সামাজিকই ছিল। কলকাতার উচ্চতম রাজপুরুষের দল ক্যালকাটা ক্লাব অফ্ সিভিলিয়ানস্, আর জেণ্টেলমেন অফ বারাকপুর অর্থাৎ বারাকপুরের শ্বেতচর্ম ভদ্রলোকের দল বন্ধুভাবে তাদের স্বদেশী খেলা ফুটবলে পরস্পরের শক্তি পরীক্ষা করেছিলো। যারা খেলেছিল তাদের বন্ধুবান্ধবীরা ছত্রবাহী পরিবৃত হয়ে অনেক হাসি-মশকরা খানা-পিনা করেছিল। খেলাটা ছিল উপলক্ষ্য মাত্র। এমনি খানা-পিনার মজলিশি পার্টি হামেশা বসতো বলেই, এইদিনের ব্যাপারে অধিকন্তু বিশেষ কিছু থাকা সত্ত্বেও তা খবর হয়ে ওঠেনি। ইংরেজ পরিচালিত খবরের কাগজে তাদের আর পাঁচটা সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে এটারও উল্লেখ করা হয়েছিল বটে; কিন্তু ইংরেজের অ-বনেদী খেলা ফুটবল যদি বিদেশী পরিবেশে পড়ে একটু মজা করবার জন্য খেলেই থাকে বনেদী ইংরেজরা, খেলা হিসেবে সেটাকে স্বীকৃতি দিয়ে খবরের কাগজে তার ফলাফল ছাপার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

তাই সেই সময় যে একটি ফুটবল খেলায় দু'দল সাহেব খেলেছিল এইটুকুই খবর। কবে ও কেন এবং কি তার ফলাফল তা জানার কোন উপায় নেই।

ব্যস ওই একদিনের খেলা। তারপর চোদ্দ বছর কেটে গেল। বনবাসে গিয়ে রাক্ষসবংশ ধ্বংস করে রামচন্দ্রের দেশে ফিরে আসার সময় হয়ে গেল।

এর মধ্যে ফুটবলের আর সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। পাওয়া যাবেই বা কেমন করে! নেটিভদের মুলুকে বসেও একটু 'হোম' 'হোম' স্বপ্ন দেখার লোভ হয় বটে, তা বলে র‍্যাব্‌ল-এর ফুটবল নিয়ে বেশি মাতামাতি করলে ত আর নিজেদের নীলরক্তের মর্যাদা থাকে না।

তাই কেটে গেল চোদ্দ বছর। এক জেনারেশান পেরিয়ে আর এক জেনারেশানের উদ্ভব হল। সিপাহী বিদ্রোহে টলে উঠ্‌লো ইংরেজ সাম্রাজ্য। কোম্পানির রাজত্ব অবসান হয়ে মহারানীর রাজ-মুকুটে উঠ্‌লো ভারতবর্ষ, তার উজ্জ্বলতম রত্ন হয়ে।

সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা পাকাপাকি হওয়াতে ওদের মনে আবার শখ জাগ্‌লো ফ্যান্সি-ড্রেস বল-এর মত তোড়জোড় করে আর একদিন ফুটবল খেলবে। সে খেলা হল ইটোনিয়ান্স-এর সঙ্গে অবশিষ্ট দলের, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে। ইংল্যাণ্ডে নীলরক্তের বিখ্যাত বিদ্যায়তন ইটন-এর ভূতপূর্ব ছাত্র-দলের হয়ে তখনকার কলকাতার ইংরেজ-সমাজের অনেকেই সে খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল। স্বয়ং কলকাতার গভর্নর রবার্ট ভ্যান্‌সিটার্ট ইটন দলের হয়ে দুটো গোল করেন, আর একটা গোল করেন ডব্লু. এইচ. ট্রান্ট। তিন গোলে জেতে ইটোনিয়ান্স্‌। অবশিষ্ট দলও অবশ্য আই. সি. এস-দের নিয়ে গঠিত হয়েছিল।

এতদিনে সাম্রাজ্য ও বাণিজ্যের বাগানে পরিপূর্ণ বসন্ত জেগেছে। ইংল্যাণ্ডেও ফুটবলের ব্রাত্য দোষ কেটে এসেছে। ফলে ফুটবল খেলা এবার একটু ঘন ঘন হতে লাগলো। দুবছরের মধ্যেই এসপ্লানেডের মাঠে আবার পড়লো বল। একদিকে পাব্লিক স্কুলের ভূতপূর্ব ছাত্র—ইটন, হ্যারো ও উইনচেস্টার-এর দল। আর একদিকে ছিল প্রাইভেট স্কুল অর্থাৎ মিস টিনার ছাত্র। মিস টিনা কলকাতাতেই স্কুল চালাতেন অনুমান করা যেতে পারে; কিন্তু তার বেশি জানবার মত নথীপত্র কিছুই পাওয়া যায় নি।

আই. সি. এস. ও রাজপুরুষদের উৎসাহ দেখে বেনিয়া সাহেবদের মনেও ভাব জাগলো। তারাও একদিন দল পাকিয়ে ম্যাচ খেললে আই. সি. এস্-দের সঙ্গে, এক গোলে হেরে গেল অবশ্য।

পূর্ব-মহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও সওদাগরির প্রধান ঘাঁটি কলকাতায়। তখন দূর প্রাচ্যের মহাসাগরীয় বাণিজ্য ও বাণিজ্যকেন্দ্র পাহারায় টহলদার ব্রিটিশ রণতরীগুলি তাদের তরঙ্গ-শাসন-সফরে মাঝে মাঝে এখানে এসে নোঙর ফেলে। আর কলকাতার কেল্লা ও ব্যারাকপুরের ছাউনিতে তখন ব্রিটিশ ফৌজের বাথান।

কাজেই কলকাতার ফুটবলের ক্ষেত্রে নাবিক ও ফৌজীদলের আবির্ভাব হতে দেরি হল না। ইংরেজ গোরা-পল্টনরা যে সমাজ থেকে আসতো, সে সমাজে ফুটবলের রেওয়াজ খুব বেশি। কাজেই ফুটবলে সিদ্ধপদ ফৌজীদল কলকাতায় তাদের প্রথম খেলায় অবশিষ্ট অর্থাৎ বড়সাহেবের দলকে চার গোলে নস্যাৎ করে দিলে। নাবিক দলও খেলেছে এই সময়, কিন্তু তাদের খেলার সঠিক বিবরণী কিছুই পাওয়া যায়নি।

এমনি করে ঠুকরে ঠুকরে চলে গেল দশ বছর। ১৮৭৮ সালে বেনিয়া সাহেবরা ফুটবল খেলার জন্য ভারতের মাটিতে সর্বপ্রথম ক্লাব গঠন করে তার নাম দিলে ট্রেড্স্ ক্লাব। তখন ড্যালহৌসী ইন্স্টিটিউট ছিল ক্যালকাটা ট্রেড্স্ এ্যাসোসিয়েশন বা কলিকাতা বণিক-সঙ্ঘের প্রধান কর্মকেন্দ্র। তারই অনুসরণে বেনিয়া সাহেবদের এই ক্লাবটি একদিন নাম বদলে হয়ে গেল ড্যালহৌসী এথলেটিক ক্লাব। বলা বাহুল্য, আজও টিম্ টিম্ করে টিকে থাকা ড্যালহৌসী এথলেটিক ক্লাবই কলকাতার প্রাচীনতম ফুটবল ক্লাব। তার জীবনধারায় এর মাঝে কোন দিন কোন ছেদ পড়েনি। একদিন শক্তিতে ও দাপটে তারা কলকাতা ফুটবলের অন্যতম প্রধান ছিল।

কলকাতার আর এক দল বড়সাহেব, আরও একটু বনেদী, অধিকাংশই

বিলেতী পাব্লিক স্কুলের ছাত্র। বিলেতী জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি, যাকে কলকাতার কক্‌নি ভাষায় বলা হত 'হৌস', সেখানকার কেউ-কেটা এরা। তারা ১৮৭২ সালে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব পত্তন করেছিল। কিন্তু ওদের ফুটবল ছিল অন্য ধরনের। তাতে ইংরেজী বনেদীআনার মার্কা ছিল। অর্থাৎ নিছক পায়ে মেরে ফুটবল খেলতে মাতেনি ওরা। ইংল্যাণ্ডের অন্যতম প্রধান বিদ্যালয় রাগবি স্কুলের এক বিদ্রোহী ছাত্র একদিন ফুটবলের নিয়ম-কানুন অবহেলা করে যে হাতে করে বল নিয়ে ছুট দিয়েছিল, তারপর মাঠ পার হয়ে গোলের কাছাকাছি এসে তবে বলে মেরেছিল লাথি—সেই থেকে ইংল্যাণ্ডে অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল ও রাগবি ফুটবল দুভাগ হয়ে যায়। বনেদী স্কুল রাগবি থেকে উদ্ভূত বলেই ইংরেজ রাগবি ফুটবলকে বেশি মর্যাদা দিত। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবও তাই রাগবি ফুটবলই খেললে। কিন্তু ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে, মাত্র চার বছর বয়সে, সে ক্লাবের ঘটলো অকাল মৃত্যু।

ড্যালহৌসী ক্লাবের উৎসাহ দেখে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব আবার জন্মগ্রহণ করে ১৮৭৭ সালে। কিন্তু এবারও ক্লাবের মূল উদ্দেশ্য রইল রাগবি খেলা। দু-চার দিন কখনও সখনও শখ করে এমনি ফুটবল যে তারা খেলেনি তা নয়, যেমন খেলেছে হকি।

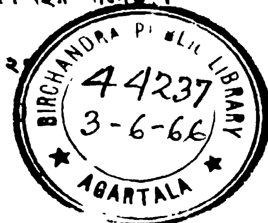
ওই একই বছরে নদীর এপারে নেভাল ভলাণ্টিয়ার্স আর ওপারে হাওড়া ইউনাইটেড ক্লাবের পত্তন হয়। দুই-ই ইংরেজের আখড়া। নেভাল ভলাণ্টিয়ার্স পরে নাম বদল করে ক্যালকাটা রেঞ্জার্স ক্লাব হয়েছে। এই সময়ই আর্মেনিয়ানরাও একটা ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে। এর সব কটাই পুরোপুরি ফুটবল ক্লাব।

এতদিনে ফুটবলের ছোঁয়াচ কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছে। ফুটবল কি, তার কিছু কিছু খবর নেটিভ সমাজের এক নগণ্য অংশ বুঝে নিয়েছে এতদিনে। বিশেষ করে সরকারী ও মিশনারী শিক্ষায়তনগুলিতে ইংরেজ ও প্রায়-

ইংরেজ অধ্যাপকবৃন্দ ছাত্রমহলে তখন বিলেতী খেলা প্রবর্তন করছেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ বি. ভি. গুপ্টা (গুপ্ত) পত্তন করলেন প্রেসিডেন্সি কলেজ ক্লাব। প্রথম প্রথম সে ক্লাব শুধু ক্রিকেট খেলেছে। তারপর অধ্যাপক স্ট্যাক সাহেব নিজের পয়সায় ছাত্রদের ফুটবল কিনে দেন, খেলার আইন-কানুন ব্যাখ্যা করে তাদের মাঠে নামান। নথীমত ১৮৭৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজেই বাঙালীরা প্রথম ফুটবল খেলে।

সেণ্ট জেভিয়াস´ কলেজ, শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং মেডিকেল কলেজের ছাত্রমহলও তখন ফুটবল নিয়ে বেশ মেতে উঠেছে। কিন্তু এই সব কলেজে সেদিন ছাত্রসংখ্যায় খাঁটি ভারতীয় যুবক বেশি ছিল না। যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ বর্তমান সংবিধানে ভারতীয় নাগরিক বলে স্বীকৃত, সেকালে তারা নিজেদের বলতো ডোমিসাইল্ড ইয়োরোপীয়ান্স। তাদের সম্পর্কে ব্রিটিশদের বিশেষ দায়িত্ব ছিল, আর তারা নিজেরা ত নিজেদের ইংরেজত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলই। এই ফিরিঙ্গীরাই ছিল উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মোড়ল ছাত্র। খাঁটি ভারতীয় তথা বাঙালী ছাত্র যারা ছিল, তারা সেখানে ছিল ব্যাকবেঞ্চার, অপাঙ্‌ক্তেয়। দু-চারজন ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক অবশ্য ছিল। কিন্তু মোটামুটি সবাইকেই একরকম কোয়ারেণ্টাইনে থাকতে হত, ডোমিসাইল্ড ইয়োরোপীয়ান ছাত্রসমাজের শুচিতা যাতে নষ্ট না হয়।

কাজেই কলেজের ফুটবল খেলায় দেশীয় ছাত্ররা পাত্তা পেত না। বস্তুত কলকাতার তথা ভারতের প্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রথম বছরে সেণ্ট জেভিয়াস´ কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও শিবপুর কলেজ সবাই ইয়োরোপীয়ান দল হিসেবেই যোগদান করেছিল। আরও যোগ দিয়েছিল খাঁটি ফিরিঙ্গী কলেজ লা'মার্টিনিয়ার। ফুটবলে ইয়োরোপীয়ান ও ইণ্ডিয়ান-এই এপার্থিয়েড ব্যবস্থা চালু ছিল বিশ বছর আগেও।



কিন্তু খেলতে না পেলে কি হয়! কলেজের খেলা দেখতে পেত বাঙালী ছাত্ররাও। সাহেব যুবকদের কৃতিত্ব মুগ্ধনেত্রে দেখবার সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজনও ছিল, ইংরেজভক্তি প্রসারিত হত তাতে। ফুটবল খেলা দেখত বাঙালী ছাত্ররা, অনুভব করতো তার উত্তেজনা। নিয়মগুলো বুঝে নিতেও তাদের দেরী হয়নি।

সাহেবদের কলেজে যারা পড়েছে, আত্মীয় বন্ধু ও অন্যান্য যুবক মহলে তাদের মোড়লি ছিল স্বতঃস্বীকৃত। তাই স্বজাতি যুবজন পরম আগ্রহ ও উৎসাহে তাদের কাছ থেকে ফুটবলের গল্প শুনতো। আসর গরম হয়ে উঠলে প্রেরণা বোধ করতো। এমনি করেই এখানে সেখানে কলেজের ছাত্রদের যোগসূত্রে বাঙালীসমাজে ঢুকে পড়লো ফুটবল।

এত হল সাহেবিআনার নকলনবিশীর একটা দিক।

ওদিকে সাহেবদের সকল বিষয়ে তারিফ করে এবং তাদের জীবনধারাকে সমীহ এবং শ্রদ্ধা করেও বাঙালীআনার নিজস্ব গর্বে গর্বিত ছিল বাংলার জমিদার সমাজ। আর তাঁদের মধ্যেও অগ্রণী ছিলেন শোভাবাজারের রাজপরিবার। ক্যালাকটা কালচারের তথা বাঙালীর বর্তমান সমাজ-জীবনের বিবর্তনে তাঁদের দান অসামান্য। ইংরেজীআনার প্রতি শ্রদ্ধা, অথচ বাঙালী-আনার মর্যাদাবোধও ছিল প্রখর। তাই তাঁদের চেষ্টা ছিল জীবনে সাহেবী-আনার প্রবর্তন করে তাকে বাঙালী ধুতি-চাদর পরানো।

যে নবকৃষ্ণ মুন্সী ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর ডান হাত হিসেবে কোম্পানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিলেন, তারই বংশধর রাজা রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুম সংকলন ও বিধবাবিবাহ-বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও অগ্রণী হয়েছিলেন। খাঁটি ইংরেজী খেলা ফুটবলকে বাঙালীরূপ দিয়ে আপনার করে নিতে সেই শোভাবাজার রাজপরিবারই এগিয়ে এল।

১৮৭৯ সালে তদানীন্তন বড় হিস্যার প্রাঙ্গণে কুমার জিতেন্দ্রকৃষ্ণ

দেবের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল শোভাবাজার ক্লাব। সেখানে বাঙালী ছেলেরা নেমে পড়লো বাঙালীর মতন। যে ইংরেজ শোবার ঘর থেকে বাইরে আসতে জুতো মোজা নেকটাই না বেঁধে বার হতে পারে না, বলে লাথি মারার সময় তাদের যে জুতো পায়ে থাকবে এ নিয়ে কোন প্রশ্নই ছিল না। তাই তার উপযোগী বিশেষ জুতো তৈরী করে তারা নাম দিলে ফুটবল বুট, ঘোষণা করলে তাকে ফুটবলের অপরিহার্য অঙ্গ বলে।

এদিকে বাঙালী ছেলেদের জন্ম কাটে শুধু পায়ে, খুব জোর খড়ম কি চটি দিয়ে পায়ের তলার সঙ্গে মাটির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ বাঁচায়। আধুনিক জীবনের দাবিতে বাড়ির বাইরে যাবার সময় যদি বা পা-বাঁধা জুতো পরে ভদ্রতা রক্ষা করতে হয়, বাড়িতে ঢুকেই সঙ্গে সঙ্গে টান মেরে খুলে ফেলে সে জুতো, আলগা পায়ে হাওয়া লাগিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। তাই ফুটবল খেলতে তাদের বুটের কথা মনে উদয় হল না। শুধু পায়ে বল শুট করার, পায়ের আঙুল দিয়ে কৌশলে বল টেনে নেওয়ার এবং আলগা পায়ে তর তর করে দৌড়বার কায়দা রপ্ত করে ফুটবলকে তারা নতুন রূপ দিলে। ইংরেজের ফুটবলকে প্রকৃত ফুটবল রূপে দিলে নতুন প্রতিষ্ঠা।

দলে দলে উত্তর কলকাতার বাঙালী ছলেরা ফুটবল খেলতে আসে রাজবাড়িতে। নিজেদের মধ্যে দলভাগ করে খেলে, অন্যপাড়ার ছেলেদের ডেকে এনে ম্যাচে নামায়। তোড়জোড় হাঙ্গাম হুজ্জোতের বালাই নেই; গায়ে গেঞ্জি বা শার্ট, পরনে হাফপ্যাণ্ট বা হাঁটুতুলে এঁটে পরা ধুতি আর একটা বল। দুটো বাঁশ পুতে দু মাথায় দড়ি বাঁধলেই গোল তৈরী হয়। যে কেউ বাঁশি মুখে নেমে গেল রেফারি হয়ে। খেলার পর একটু খাওয়া দাওয়া? সে যুগে রাজবাড়িতে এমনিতেই তার ব্যবস্থা থাকতো।

দেখাদেখি পাশের পাড়াতে গজালো কুমারটুলি ক্লাব। ১৮৮৪ সালে কলেজী ছাত্রদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে অল্প কদিন বাদেই দলাদলির ফলে

উঠে যায় যে ওয়েলিংটন ক্লাব, তারই একদল পরের বছর মিঃ বি. ভি. গুপ্তের নেতৃত্বে টাউন ক্লাব পত্তন করে। ওদিকে দক্ষিণ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যাশানাল। এমনি করে ১৮৮৫ সালে, কলকাতার মাটিতে ফুটবলে প্রথম লাথি মারার একবিংশতি বছরে, প্রায় একই সঙ্গে চার চারটে বাঙালী ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হল। সাহেব ফুটবল-ওস্তাদরা এদের সম্পর্কে সচেতন না হলেও বাঙালী সমাজে এদের প্রসার প্রতিপত্তি এমন বেড়ে গেল যে রাজবাড়ির আঙ্গিনায় তাকে আর ধরে রাখা গেল না। রাজবাড়ির প্রভাবে গড়ের মাঠে সাহেবদের খেলার মাঠেরই প্রতিবেশী হিসেবে স্থান পেয়ে গেল শোভাবাজার। সাহেবরা 'বাবুদের' কাণ্ডকারখানা দেখে কিছুটা হাসলে, বিস্ময়ও মানলে কিছু। ইংরেজের নিজস্ব মুখপত্র একখানা ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করলে জিতেন্দ্রকৃষ্ণের স্থূলবপুর অনুকরণে বাঙালী ফুটবলার এঁকে।

তা করুক। ফুটবল বাঙালী সমাজে এমন আসর করে নিয়েছে এরই মধ্যে যে ১৮৮৯ সালে বেনিয়া সাহেবরা যখন পাঁচশ টাকায় একটা কাপ কিনে ড্যালহৌসী ক্লাবের হাতে তুলে দিলে ট্রেডস কাপ প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য, ভারতের সর্বপ্রথম সেই ফুটবল প্রতিযোগিতায় নেটিভদেরও খেলবার সুযোগ দেওয়াহল, ফুটবলে বাঙালী যুবসমাজকে উৎসাহিত করার নীতি অনুযায়ীই তা করা হয়। তবে এক শোভাবাজার ক্লাব ছাড়া আর কোন বাঙ্গালী বা ভারতীয় দল প্রথম বারে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেনি।

নিজ বাসভূমে পরবাসী

দিকে দিকে বাঙালী ফুটবল ক্লাব গজালে কি হবে, দেশের কর্ণধার তখন ইংরেজ। তা ছাড়া ফুটবল ততদিনে ইংরেজের জাতীয় খেলার পর্যায়ে পৌছে গেছে। সেই অবস্থায় তাদের রাজ্যে, তাদের প্রতিষ্ঠিত সহরে, তাদের জাতীয় খেলা ফুটবলের নেতৃত্ব যে তারা করবে, তাতে বিচিত্র কি আছে!

প্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা তারাই প্রবর্তন করলে, তারপর ফুটবল পরিচালনার জন্য আই. এফ. এ. তারাই প্রতিষ্ঠা করলে। আর খেলার মাঠে যে বৃটিশ সামরিক ও বে-সামরিক দলের প্রাধান্য থাকবে এর মধ্যেও কোন প্রশ্ন ছিল না। কারণ তাদের খেলায় স্কুল কলেজেই তারা পোক্ত হয়ে ওঠে। গোরা-পল্টনদের ত শান্তির সময় অনন্ত অবকাশ, ফুটবল নিয়ে দমাদম পিটছে। আর সাধারণ বাঙালীর চাইতে সাধারণ ব্রিটিশ যুবকের শরীর যে অনেক বেশী দড় ছিল, এর মধ্যেও কোন সন্দেহ নেই।

হয়তো কোন কারণ দেখিয়েই খেলার মাঠে ইংরেজ প্রাধান্যের যুক্তি খুঁজতে যাওয়া অনেকের মনঃপূত হবে না। তবে এ কথা না মেনেও উপায় নেই যে ১৯১১ সালে মোহনবাগানের শীল্ড পাওয়া ছাড়া ১৯৩৪ পর্যন্ত লীগ এবং শীল্ড বিলেতী দলগুলির একচেটিয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে একমাত্র মোহন-বাগান পাঁচবার লীগে রাণার্স-আপ হয়েছে, চুমুক দিতে গিয়ে হাত থেকে বাটিটা ফস্কে গেছে একবার। আর শীল্ডে রানার্স-আপ হয়েছে একবার কুমারটুলি, একবার মোহনবাগান।

কাগজে কলমে আমরা এ তথ্য মানতে বাধ্য হলেও, আমাদের সে

যুগের স্বজাতিপ্রিয়তা এবং ফুটবলে স্বজাতির প্রতীক বলে বিচার করতাম যে মোহনবাগানকে—তার প্রতি অকুণ্ঠ প্রেম কোন দিন সাহেবদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে দেয়নি আমাদের। বর্ষাকালে ও বিশেষ করে বৃষ্টির দিনে খেলতে বাধ্য হয়েই মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং শীল্ড-উইনার হবার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে বছরের পর বছর, আমাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূলই হয়েছিল। বৃষ্টির মধ্যে মোহনবাগান হেরে গেলে আমরা যখন বৃষ্টিদাতা দৈবকে দুষতাম, ফুটবলে উদাসীন মাঠে-না-যাওয়া বিজ্ঞ ও প্রবীণরা বলতেন—যুদ্ধে নেমে বারুদ ভিজে বলে লাভ কি?· তাদের কথাশুনে চটে আগুন হয়ে যেতাম আমরা। কারণ, মোহনবাগান তথা অন্যান্য বাঙালী দলের শুধু পায়ের ভেল্কির কাছে সাহেব ও গোরা-পল্টনরা যে নাস্তানাবুদ হয়ে যেত, তাতেই ছিল আমাদের আনন্দ ও গর্ব। কবে বৃষ্টির দিনে একটু সুবিধা হলেও হতে পারে, তাই বলে পায়ে বুট বেঁধে অমন সূক্ষ্ম কৌশলের মন-মাতানো প্রাণ-নাচানো ফুটবলই যদি বির্সজন দিতে হল, তবে আর ফুটবল থেকে লাভ কি। মোহনবাগান কি আর মোহনবাগান থাকে, যদি না থাকে তার মনোমোহন যাদুগিরি!

সাহেবদের প্রাধান্যের প্রধান কারণ আমরা ধরতুম, রেফারী ও লাইনস্ম্যানদের চুরি। চুরি তারা কতটা করতো তা বলা শক্ত। বিশেষ করে, বিখ্যাত রেফারী ক্লেটনের প্রধান কৃতিত্ব ছিল এই যে, সে যখন পুকুর চুরি করে মেরে দিত, তখন খুব ঝানু সমঝদার ছাড়া আর কেউ বুঝতেই পারতো না জুয়াচুরিটা কোথায়। কোথায় তার সন্ধান না পেলেও, তা যে সব সময় চলছে, এ বিষয়টিতে সাধারণ মানুষের মনে সংশয় ছিল না। মোহন-বাগান শুকনো মাঠে খুব জোর এক-দু'গোলের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। তার বেশী গোলে ভিজে মাঠে অনেকবার হেরেছে, কিন্তু খরার দিনেতে হেরেছে পঁচিশ বছরে পাঁচ বারেরও কম। এই যে দু-এক গোলের

পরাজয় তার মধ্যে মোহনবাগানের দেওয়া দু এক গোল অফ-সাইড বলে নাকচ হয়ে গেছে কত সময়। আমাদের প্রেমভরা চোখে মাঝে মাঝে রেফারী বাতিল করা এমন অনেক গোল ষোল আনা হকের গোল বলে মনে হয়েছে। বস্তুত ১৯১২ সালে আই. এফ. এ. শীল্ডের প্রথম রাউণ্ডেই মোহনবাগান যখন ক্যালকাটার কাছে হেরে গেল ২-১ গোলে, সেদিন মোহনবাগানের দেওয়া দুটো গোল অফ-সাইড বলে বাতিল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু জে. এফ. ম্যাডান কোম্পানী সে খেলার যে ফিল্ম তুলেছিল, তা দেখে অনেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিই বাতিল গোল দুটোকে সঠিক বলে বিবেচনা করে-ছিলেন।

মোহনবাগান এবং তারপর ইস্ট-বেঙ্গল যে সাহেব দলগুলিকে টপকে লীগ বা শীল্ড আর কখনও পেতে পারে নি, তার কারণ যাই হোক না কেন, প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত জয়-পরাজয়ে শ্রেষ্ঠত্বের যে মাপকাঠি, তাতে কলকাতায় ফুটবলের শুরু থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত সাহেব ও গোরা-পল্টনদের প্রাধান্য ছিল অবিসম্বাদী সত্য। ১৯১১ সালে যা ঘটেছিল, সে যুগের পারিপার্শ্বিক বিচারে তা অভাবনীয় অঘটন। একবার মাত্র ১৯২৯ সালে অ্যাংলো-বার্মিজ নিয়ে গড়া রেঙ্গুন কাস্টমস দল শীল্ড ফাইনালে উঠেছিল, আলস্টার রাইফ্‌লসের কাছে দু গোলে হেরে গেল। ১৯৫৩ সালে বোম্বাই-এর ইণ্ডিয়া কালচার লীগ-এর আগে কলকাতার বাইরেকার কোন বে-সামরিক দলের ফাইনালে ওঠার নজীর ওই ১৯২৯। অবশ্য রেঙ্গুন কাস্টমসকে আমরা এশিয়ান দল বললেও তারা নিজেরা নিশ্চয়ই নিজেদের ডোমিশাইল্ড ইয়োরোপীয়ান্স বলতো। কলকাতায় প্রচুর ভালো-ভালো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড় সে যুগে হওয়া সত্ত্বেও কোন মার্কামারা অ্যাংলো দল ছিল না। অ্যাংলো-খেলোয়াড় নিয়ে গড়া তথাকথিত ইয়োরোপীয়ান কোন দল লীগ পায়নি কোন দিন, শীল্ডও পেয়েছে সাহেবীযুগের অবসানের পর।

এতো গেল খেলার ফলাফলের বিচার। ফুটবলের সংগঠন ও পরিচালনা সাহেবরা শুরু না করলে সেই যুগে নিজেদের মধ্যেই খেলতে হত আমাদের। সাহেবরা কখনও আসতো আমাদের সংগঠনে শক্তির পরীক্ষা দিতে? আর তাতে না থাকতো উত্তেজনা, না থাকতো আনন্দ, না থাকতো গর্ব। গড়ের মাঠে খেলতে পাওয়াতেই ছিল সে যুগের বাঙ্গালী খেলোয়াড়ের শক্তির স্বীকৃতি। তার পর ইংরেজের খেলায় ইংরেজদলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, তার চেয়ে বড় গৌরব আর কি হতে পারে!

ইয়োরোপীয়ান ক্লাবের সংখ্যা যখন বেশ কিছু বেড়েছে, তখন এমনি বে-সরকারী খেলায় মন আর ভরে না। তাই ১৮৮৯ সালে ট্রেডস্ কাপ প্রতিযোগিতার পত্তন হল। ক্যালকাটা তখনও রাগবি নিয়ে ব্যস্ত, এতে তারা যোগ দেয়নি। ফৌজী দল ছিল চারটে, ড্যালহৌসী 'এ' ও 'বি' করে দুটো নাম দিয়েছিল, আর যারা নাম দিয়েছিল, তাদের আজকের বংশধরেরা যাই হোক না কেন, সেদিন সেগুলো সবই সাহেব খেলোয়াড় নিয়ে গড়া ইয়োরোপীয়ান মার্কাধারী ছিল। দলগুলির নাম শুনলে সে দিনের সমাজ জীবনে ইয়োরোপীয় প্রাধান্য বোঝা যাবে, যথা—আর্মেনিয়ান্স, মেডিক্যাল কলেজ, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও শিবপুর কলেজ। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের কাছে শোভাবাজার প্রথম রাউণ্ডে তিন গোলে হেরে যায়। নরম্যান প্রিচার্ড, ভারত থেকে সর্বপ্রথম অলিম্পিকে যোগদান করে যার মেডেল পাওয়া তথ্য ইদানীং আবিস্কৃত হয়েছে, সেই সবকটা গোল করে, করে ভারতের মাটিতে ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রথম হ্যাট্রিক। খেলাটি বৃষ্টিভেজা পিছল মাঠে হয়েছিল, শোভাবাজার গোলও করেছিল সবার আগে, সে গোল রেফারী দেয়নি।

হেরে গেলে কি হয়, স্বয়ং ছোটলাট বাবুদের কাণ্ডকারখানা দেখতে এসেছিলেন। ল্যাণ্ডোগাড়ীতে বসে খেলা দেখেছিলেন সারাক্ষণ, এবং তিনি

যে বাবুদের খেলা দেখেছিলেন তা পরদিন ফলাও করে ইংরেজের মুখপত্র ইংলিশম্যান-এ ছাপাও হয়েছিল।

অল্প কিছুদিন আগেও গভর্ণর বা ভাইসরয়ের দরবারে যাওয়ার জন্য যে আকুল আগ্রহ দেখেছি জ্ঞানীব্যক্তিদের মধ্যে এবং আজকের দিনেও গণ্যমান্য সভাপতি প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধকদের সামনে আত্মপ্রদর্শনীর যে আপ্রাণ চেষ্টা হামেশা চোখে পড়ে, তা থেকে যদি ভদ্রলোক-চরিত বলে কিছু ধারণা করা যায়, তবে শোভাবাজারের সেদিনের খেলোয়াড়েরা যে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেছিল, এমন ভাবা ভুল হবে না।

প্রথম বছরের ট্রেডস কাপ ড্যালহৌসী ক্লাবই জিতলে। কিন্তু কলেজ মহলে ফুটবল কি পরিমাণ উৎকর্ষ অর্জন করেছিল তা বোঝা যাবে ১৮৯৩ —১৮৯৬ পর্যন্ত চার বছর এই প্রতিযোগিতার জয় গৌরব সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও শিবপুর কলেজে ভাগাভাগি করে নেবার খবরে। অনেক সামরিক ও বে-সামরিক দলকে কাবু করে তবেই এই সার্থকতা অর্জন করেছিল, কলকাতার কলেজের ছেলেরা। অবশ্য ভারতীয় ছাত্র তার মধ্যে ছিল না।

ইতিমধ্যে ১৮৯৩ সালে ইণ্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে (সংক্ষেপে আই. এফ. এ) বলে ফুটবল পরিচালনার জন্য এক সংস্থা সাহেবরা খাড়া করলে। তার মধ্যে কেবল ইউরোপীয়ান ক্লাবগুলি থেকেই প্রতিনিধি ডাকা হল, এবং বহুদিন পর্যন্ত ভারতীয় কোন প্রতিনিধিকে সেখানে আসন দেওয়া হয়নি।

আই. এফ. এ. তৈরী হয়েছিল একটা বড় গোছের প্রতিযোগিতা যাতে চালান যায় সেই উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ আগে শীল্ড প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা করে পরে সেই উদ্দেশ্যে আই. এফ. এ. গড়া হল। আর সেই পরিকল্পনা যে বৈঠকে হয়েছিল তার মধ্যে ড্যালহৌসী ক্লাবের দুজন এবং ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের একজন সাহেবের সঙ্গে শোভাবাজার ক্লাবের নগেন্দ্র

প্রসাদ সর্বাধিকারীও ছিলেন। তা ছাড়া যাঁদের দানে শীল্ডখানা তৈরী হল, তাঁদের মধ্যে একদিকে যেমন ছিলেন আর্মানী সাহেব স্যার এ. এ. আপকার এবং ড্যালহৌসীর জে. সাদারল্যাণ্ড, অন্যদিকে কুচবিহার ও পাতিয়ালার মহারাজদ্বয়ও ছিলেন। সে যুগের নিয়ম মত ভালো করে যাতে শীল্ডটা তৈরী হয় তার জন্য কলকাতার ওয়াল্টার লক কোম্পানীর মারফতে লণ্ডনের এলকিংটন কোম্পানীতে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। তা সে যুগের আর দোষ কি! আজও ভালো জিনিষ বা বড় কাজের বিশেষজ্ঞ দরকার হলে আমরা নির্বিচারে ইংল্যাণ্ড আমেরিকায় অর্ডার দিচ্ছি।

আই. এফ. এ. শীল্ডকে ইংল্যাণ্ডের এফ. এ. কাপের পর্য্যায় তুলবার প্রচেষ্টায় অর্থাৎ সর্বভারতীয় রূপ দেবার উদ্দেশ্যে প্রথম বছর তাকে দুই অঞ্চলে ভাগ করে খেলান হয়েছিল। পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রতিযোগিতা হল এলাহাবাদে, মাত্র চারটি ফৌজীদল নিয়ে। আর কলকাতার পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল নটি দল। তার মধ্যে ফৌজী দল ছিল চারটি, বে-সামরিক সাহেব দল ছিল ড্যালহৌসী, ক্যালকাটা, হাওড়া ইউনাইডেট এবং নেভাল ভলান্টিয়ার্স অর্থাৎ রেঞ্জার্স ক্লাবের পূর্বপুরুষ। আর দেশী দল বলতে এবারেও সেই শোভাবাজার।

শোভাবাজার প্রথম খেলাতেই ৫ম রয়েল আর্টিলারীর বিরুদ্ধে এ যাত্রাও তিন গোলে হারলে। স্টেটসম্যান লিখলে—"বাবুর দল এক গোল খাওয়ার পর একটু হাঁকফাঁক করলেও তার পরেই তছনছ হয়ে গেল। ভাগ্যিস চাউড্রি (গোলকীপার) ও মোতীলাল (ব্যাক) ছিল, নইলে আরো অনেক গোল খেত।"

ক্যালকাটা ড্যালহৌসী পরের যুগে যতই বীরত্ব দেখাক, প্রথম বছর কেউ সুবিধা করতে পারেনি। ড্যালহৌসী দুবারের চেষ্টায় রয়েল সাসেক্সকে হারিয়ে তারপর হেরে গেল হাওড়া ইউনাইটেডের কাছে দুগোলে। ২১শে

রয়েল আর্টিলারির কাছে রেঞ্জার্স খেলে তিন গোল। আর ক্যালকাটা সবে তখন রাগ্‌বির সঙ্গে কিছু কিছু ফুটবলে মন দিয়েছে, তারা রাইফেল ব্রিগেডকে এক গোলে হারিয়ে তৃতীয় রাউণ্ডে উঠেছিল কিন্তু শোভা-বাজার-বিজয়ী দলের সঙ্গে তিনদিন ড্র খেলে রাগবি খেলার প্রয়োজনে সরে গেল, আর খেললে না। শেষ পর্যন্ত এলাহাবাদের বিজয়ী রয়েল আইরিশ কলকাতার বিজয়ী শোভাবাজার-হৃদন ৫ম আর্টিলারির সঙ্গে ড্যাল-হৌসীর মাঠে ফাইনাল খেললে ২রা সেপ্টেম্বর। বৃষ্টির মধ্যে ১-১ গোলে সে খেলা অমীমাংসিত হতে চারদিন বাদে আবার হল সে খেলা। এবার আইরিশ দল জিতে গেল এক গোলে।

শীল্ড ফাইনালের পর সেবারেই এক প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা হল, তার নাম হল শীল্ড বিজয়ী বনাম বাংলার নেটিভ দল। নেটিভ দলে কিন্তু নেটিভ একজনও ছিল না। কলকাতার প্রতিযোগী সামরিক ও বে-সামরিক দলগুলি থেকে বাছাই দলই হল বাংলার নেটিভ। এলাহাবাদ শীল্ড জিতলেও বাংলার কাছে তিন গোলে হেরে গেল। প্রথম শীল্ড ফাইন্যালের অনুষ্ঠানক্ষেত্র হিসেবে এখনকার অবজ্ঞাত ড্যালহৌসী মাঠই ক্যালকাটা মাঠের চেয়ে বনেদী।

ফুটবল যে খেলা হিসেবেই সাধারণ লোকের মনে ধরেছে, তার প্রমাণ হল যে প্রথম বছরেই শীল্ড ফাইনালের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান দেখতে দশহাজার লোক এসেছিল। গ্যালারি বা মাঠ ঘেরার কোন বালাই ছিল না। পরবর্তী যুগের খবর থেকে জানা যায় যে সাহেবী আসবাব-কোম্পানী বি. এইচ. স্মিথ ফুটবল খেলার মাঠে চেয়ার সাজিয়ে তাতে বসবার ভাড়া নিত। অবশ্য মাত্র একদিকে বিশিষ্ট সাহেব-সুবোর জন্য। নেটিভ অর্থাৎ বাঙালীদের সেখানে বসবার অধিকার অনেকদিনই ছিল না। তা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা কাঠের বাক্স পেতে যদি দশহাজার লোক দেখে থাকে প্রথম

বছরের শীল্ড ফাইনাল, সেদিনের কলকাতার জন সংখ্যার অনুপাতে সেই দর্শক সংখ্যা নিশ্চয়ই আজকের তুলনায় খুব পিছনে থাকার নয়। অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল কলকাতার জনচিত্ত জয় করেছিল একেবারে প্রথম পদার্পণে।

পয়সা ছিল না সেদিনের ফুটবলে। হিসেব ঘাঁটলে দেখা যায় যে প্রথম চ্যারিটি ম্যাচ হয় ১৮৯৪ সালের উত্তর-ফাইনাল সেই প্রদর্শনী ম্যাচ—শীল্ড-বিজয়ী বনাম বাংলার নেটিভ দল। সে খেলায় বিক্রী হয়েছিল ১৫০০৲টাকা। বেশী হবেই বা কোথাথেকে ! সেই বি. এইচ. স্মিথের চেয়ার কখানায় বসার জন্যই যা চ্যারিটি। নইলে ১৯১১ সালের শীল্ড ফাইনালের চ্যারিটি ম্যাচে বিক্রী শুনলে হাসি পাবে, মাত্র ৬৯১৪৲ টাকা। অথচ আশি হাজার লোক জমা হয়েছিল মোটমাট, সে যুগের সব খবরের কাগজেই তাই লিখেছিল।

শীল্ড পরিচালনার উদ্দেশ্যে আই. এফ. এ. যখন সংগঠিত হল, তাতে কিন্তু বড় সাহেবদের ক্লাব ক্যালকাটাই বেশী খাতির পেলে। তাদেরই সভাপতি হাইকোর্টের জজ ম্যাকফার্সন হলেন আই. এফ. এ-র প্রথম সভাপতি। তবে সম্পাদক পদ ট্রেডস কাপ কমিটির মত ড্যালহৌসীর হাতেই রইল। প্রথম সম্পাদক হল সে দলের রাইট হাফ এ. ব্রাউন।

কোন কোন ফুটবল-ইতিহাস পণ্ডিতের মতে ট্রেডস কাপ প্রতিযোগিতার সুরুকেই আই. এফ. এ. শীল্ড প্রতিযোগিতার সুরু বলা উচিত। কারণ ট্রফির নাম এবং চেহারা বদলালেও প্রতিযোগিতার স্বরূপ বদলায়নি। অতএব শীল্ড নাকি ট্রেডসের ধারাই বহন করেছে। শীল্ড প্রতিযোগিতা সুরু হতে ১৮৯৩ সাল থেকে ট্রেডসকে গৌণ প্রতিযোগিতা বলে মার্কা মেরে দেওয়া হল। অর্থাৎ শীল্ডের খেলোয়াড় কেউ ট্রেডস কাপে খেলতে পারবে না। এই নিয়ম আজও বহাল আছে।

ফুটবল শুধু খেলা নয়, সামাজিকতাও বটে। সেটা আরও পাকাপাকি এবং নিয়মিত যাতে চলে তার জন্য ১৮৯৮ সালে ক্যালকাটা ফুটবল লীগ সুরু করা হল, পৃথক ব্যবস্থাপনার অধীনে। যদিও আই. এফ. এ-র কর্মকর্তারাই লীগের কর্তা হয়েছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে, তবু সংস্থা দুটি আলাদা ছিল বহু দিন। লীগের পৃথক অস্তিত্ব তুলে দিয়ে তাকে আই. এফ. এ-র অধীনে আনা হয়েছে মাত্র ১৯৩৪ সাল থেকে।

সে যুগের কলকাতা ফুটবলে আমরা যে কেউ ছিলাম না, সাহেবদেরই মজলিশে বড় জোর হাততালি দিয়ে তারিফ করার বেশী কোন অধিকার ছিল না এই সহরের লাখকরা ৯৯.৯৯৯ জনের—এই নিজ বাসভূমে পরবাসী ব্যবস্থার প্রধান প্রমাণ ছিল লীগ খেলার পরিবেশে। লীগ প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়েছিল : "কলকাতা সহর ও সহরতলীতে অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল খেলার প্রসার যাতে বাড়ে, এবং বিভিন্ন দলের পরস্পর প্রতিযোগিতায় খেলার মান যাতে উন্নত হয়"। এর পর যদি শোনেন যে ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত এই ষোল বছর লীগে কোন ভারতীয় দলকে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হত না, ১৯০৪ সালে যখন ক্লাবের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় বিভাগের প্রবর্তন হল তখনও না, সেক্ষেত্রে কাদের মধ্যে প্রসার এবং কাদের খেলার মান বৃদ্ধি প্রবর্তক ও পরিচালকদের উদ্দেশ্য ছিল, তাকি আর বলে দিতে হয়!

মোহনবাগান শীল্ড পাওয়ার পরে যখন বাঙলা তথা কলকাতার জনসাধারণ মাঠে ভেঙে পড়তে লাগলো, তখনই বোধ হয় সাহেবদের টনক নড়েছিল। মোহনবাগানের খেলায় অজস্র ভিড়, আর লীগের খেলা তার তুলনায় দুখিনী, এই দেখেই নেটিভ জনতার প্রতি ঘৃণা পোষণ করেও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী ইয়োরোপীয়ান লীগ কমিটির মনে নিশ্চয়ই কেমন একটু খোঁচা লেগেছিল। ঠেকায় পড়ে লিবারেল হওয়া ইংরেজের জাতিগত বৈশিষ্ট্য।

১৯১৪ সালে মোহনবাগান ও এরিয়ান্সকে কোন মতে দ্বিতীয় বিভাগ লীগের এক কোণে একটু ঠাঁই দেওয়া হল। মোহনবাগান পরের বছরই প্রথম বিভাগে উঠলো, এরিয়ান্স উঠ্লো তারও পরের বছর। দ্বিতীয় বিভাগে মোহনবাগানের শূন্য আসন দেওয়া হল শোভাবাজারকে। আর এরিয়ান্সের আসন এক বছর খালি রেখে ১৯১৭ সালে দ্বিতীয় বিভাগে কিছুটা ভারতীয়করণ হল। কারণ, এই বছর কুমারটুলি, টাউন ক্লাব, গ্রীয়ার এবং মুসলমান দল ওরিয়েণ্টালসকে নেওয়া হল। ১৯১৯ সালে এল জোড়াবাগান, ১৯২০ সালে জায়গা পেল স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও তাজহাট। পরের বছর এল ইস্টবেঙ্গল, তাজহাট উঠে যাওয়ায় সেই শূন্য স্থান দখল করলো। ১৯২৩ সালে ভবানীপুর স্পোর্টিং দ্বিতীয় বিভাগে খেলে। পরের বছর খেলে ভবানীপুরের ছুটো দল, ভবানীপুর স্পোর্টিং ও ভবানীপুর ইম্পিরিয়াল। কিন্তু ১৯২৫ সালে ছুই ভবানীপুর মিলে হয়ে গেল এক ভবানীপুর ক্লাব।

মোহনবাগান আর এরিয়ান্স তো প্রথম বিভাগে উঠলো, কিন্তু নিয়ম করা হল যেটুকু আদর-আবদার তা দ্বিতীয় বিভাগেই মানা যাবে। প্রথম বিভাগে আর নয়, যে-টুকু জাত নেহাৎ মারা গেছে, তাই কোন মতে মুখ বুঁজে সহ্য করে যাওয়া। তাই দ্বিতীয় বিভাগ থেকে কুমারটুলি ১৯১৭-১৮-১৯ এই তিন তিনবার প্রথম বিভাগে উঠবার যোগ্যতা সপ্রমাণ করে দাবী জানান সত্ত্বেও তা গ্রাহ্য হয়নি। প্রথম ছুবার চ্যাম্পিয়ান হল লিঙ্কনস্ 'বি,' কুমারটুলি হ'ল রাণার্স-আপ। আর তৃতীয় বারে কুমারটুলি একেবারে শীর্ষে, পুরোপুরি চ্যাম্পিয়ান। প্রথম বাঙালী লীগ চ্যাম্পিয়ান দল বলতে কুমারটুলি-ই। তা বলে কি হবে! প্রথম বিভাগে তৃতীয় ভারতীয় দল নেওয়া চলবে না। অতএব লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং তারই পরের বছর শীল্ডে রাণার্স-আপ হয়েও কুমারটুলি ছোট ক্লাবই

রয়ে গেল। যে ক্লাব একদিন সামর্থ্য ও শক্তির যোগ্য মর্য্যাদা পেলে মস্ত ক্লাব হয়ে উঠ্‌তে পারত, সেদল এখন নামতে নামতে তৃতীয় বিভাগে। প্রাচীন প্রাসাদের মত শোভাবাজার ন্যাশনালের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শূন্যে মিলিয়েই যায় যদি একদিন, দুঃখ করবো কিন্তু বিস্মিত হব না। ফুটবলে বর্ণবিচারের শহীদ কুমারটুলি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা লক্ষ্য করবার যে কলকাতা ফুটবলের যারা ধুরন্ধর—মোহনবাগান, এরিয়ান্স, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং, এরা কেউ দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়ে প্রথম বিভাগে ওঠেনি। তবে ইস্টবেঙ্গল একবার নেমে গিয়ে পরের বছর যখন আবার উঠেছে, তখন উঠেছে স্বাধিকার বলেই, চ্যাম্পিয়ানশিপের গৌরব অর্জন করে।

লীগের কথায় পুলিশ এ সি'র কথা এসে পড়ে। এরা প্রথম ইয়োরোপীয়ান দল হিসেবে ১৯১২ সালে নিয়মিত দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে সুরু করে। ১৯৩৯ সালে ইযোরোপীয়ান দল হিসেবেই শীল্ডও জেতে। ১৯২৪ এবং ১৯২৬ সালে দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হযে এবং ১৯২৫ সালে ক্যামেরন্স 'বি'র পিছনে রাণার্স-আপ হয়ে, পর পর তিনবার প্রমোশন প্রত্যাখ্যান করেছে পুলিশ, পুলিশী কাজের অসুবিধা হবে বলে। তারপর ওরা প্রথম বিভাগে ওঠে ১৯২৭ সালে, নর্থ স্টাফোর্ড 'বি'র সঙ্গে রাণার্স-আপ হযে। বোধ হয খেলোয়াড়বৃন্দের আগ্রহাতিশয্যেই পুলিশ কর্তৃপক্ষ কাজের অসুবিধার প্রশ্ন তুলে ফুটবলে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের পথ রোধ করেন নি।

১৯২৪ সালে পুলিশ যখন উঠ্‌লো না, রাণার্স-আপ কামেরন্স 'বি'র ও উঠবার নিয়ম নেই, কারণ তাদের 'এ' টিম খেলছে প্রথম বিভাগে। তাই তৃতীয় স্থানের অধিকারী ইস্টবেঙ্গল দাবী জানালে প্রথম বিভাগে খেলবার, আর সেই দাবীর ফলেই লীগ ফুটবলে বিপ্লবের সৃষ্টি হল।

মোহনবাগানকে যেমন তাদের অতুলনীয় কৃতিত্ব—যার চূড়ান্ত পর্যায় ১৯১১ সালের শীল্ড বিজয়—তাই স্মরণ করে এবং তার জনপ্রিয়তার কথা ভেবে খাতির করে, আইন-কানুনকে কিছুটা চোখ ঠেরে তুলে দেওয়া হয়েছিল, অনুরূপ কারণেই ইস্টবেঙ্গলের দাবীর পক্ষে লড়াই করতে অনেকেই এগিয়ে এলেন।

এই দাবীর বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি প্রথম বিভাগে দুটোর বেশী ভারতীয় দল চলবে না। এদিকে ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয় বিভাগে এবং শীল্ডের খেলায় ক'বছরে মোহনবাগানের জাত-ভাই বলে প্রমাণ করেছে নিজেদের, তাদের জনপ্রিয়তাও হয়েছে প্রচুর। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের কয়েকজন উদার সাহেব এবং রেঞ্জার্সের রসার কোমর বেঁধে লাগলেন, আর লাগলেন সে যুগের তরুণ সংগ্রামী পঙ্কজ গুপ্ত। কিন্তু কাস্টম্‌সের চাকুরে আই. এফ. এ. ও লীগের সেক্রেটারী মেডলিকট তেড়িয়া ফিরিঙ্গী, তার নামের দুই আদ্য অক্ষর— এইচ. ই. হল লাটসাহেবের উপসর্গ। তাই দেমাকেও সে লাট, একেবারে জঙ্গীলাট। মেডলিকট কোমর বেঁধে লাগলো, প্রথম বিভাগ লীগের শুচিতা ব্যাহত হতে দেওয়া হবেনা। তার মেজাজ নরম করার জন্য তাকে কেউ মোটরগাড়ী উপহার দিয়েছে, তার নতুন গাড়ীর দিকে আঙুল দেখিয়ে এমন কথাও বলতে লাগলো লোকে, কিন্তু দাম যদি নিয়েই থাকে, তার জন্য কাজ দিতে হবেই, এমন বিবেকী পুরুষ মেডলিকট ছিল না।

আই. এফ. এ-র সভাপতি জাস্টিস ইউয়াট গ্রীভ্‌সের সহযোগিতায় রাতারাতি এমন ব্যবস্থা হল যে, মেডলিকট পদত্যাগ না করলে, তার পদচ্যুতি অনিবার্য। অগত্যা পদচ্যুত হয়েই পদত্যাগে বাধ্য হল মেডলিকট। ফলে শুধু ইস্টবেঙ্গল যোগ্যতার পুরস্কার পেয়ে প্রথম বিভাগে উঠলো তাই নয়, ভারতীয় দলের সংখ্যা সম্পর্কে বাধানিষেধ উঠে গেল চিরদিনের মতন।

ভারতীয় তথা বাঙ্গালীদলের বিরুদ্ধে লীগ ফুটবল খেলার বাধানিষেধ

উঠে গেলে কি হবে, পরিচালনার কর্তৃত্ব তারপরেও পুরোপুরি সাহেবদের হাতের মুঠোতেই রয়ে গেল।

প্রথম যখন আই. এফ. এ. তৈরী হয়, তাতে কোন ভারতীয় দলকে জায়গা দেওয়া হয়নি। পরে ১৮৯৭ সালে তা নিয়ে বাঙালী দলগুলির মধ্যে প্রচুর বিক্ষোভ জেগে ওঠে। তখন আই. এফ. এ-র চার চারটে প্রতিযোগিতা। শীল্ড এবং ট্রেডস কাপ আছেই সবার জন্য মুক্ত। কিন্তু ভারতীয় ফুটবল দল ততদিনে অনেকগুলো গজিয়ে গেছে ; ট্রেডস কাপে বা শীল্ডে জয় লাভের সম্ভাবনা তাদের কম। তাই কুচবিহারের মহারাজ নিছক ভারতীয় দল-গুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য কুচবিহার কাপ দিলেন ১৮৯৩ সালেই। ফুটবলের প্রসার ও জনপ্রিয়তা ছাত্রমহলেই সবচেয়ে বেশী। তাই পরের বছর কলেজী প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করা হল। কিন্তু সেখানেও সেই ছুৎমার্গ, রাজার জাত ও প্রজার জাত, জেণ্টলমেন ছাত্র ও নেটিভ ছাত্রের জন্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। অর্থাৎ কলেজের জন্যও দুটো আলাদা প্রতিযোগিতা হল। দেশী ছাত্রবহুল কলেজগুলির জন্য হল এলিয়ট শীল্ড, আর তথাকথিত ইয়োরোপীয়ান কলেজগুলির জন্য ক্যাডেট চ্যালেঞ্জ কাপ। এশিয়ার অন্তর্গত আর্মানী জাতির স্থানীয় কলেজও ইয়োরোপীয়ান দলে পড়লো।

ভারতীয় দলগুলির বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে দেখেও ইংরেজ প্রথমে গা করেনি। ক্রমে তা ঘনীভূত হয়ে ওঠে। আবেদনপন্থী দু'চারজন বাঙালী সমাজনেতা ও ক্লাবনেতার মধ্যস্থতায় ১৯০০ সালে একজন ভারতীয় ক্লাব-প্রতিনিধিকে আই. এফ. এ-তে আসন দেওয়া হল। শোভাবাজারের অধিনায়ক কালী মিত্র হলেন প্রথম ভারতীয় সদস্য। তারপরই আই. এফ. এ-তে আসন পান ন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মন্মথ গাঙ্গুলী।

ক্রমে আই. এফ. এ-র কাজ বেড়ে গেল। অবৈতনিক সাহেব সম্পাদক শাসন করতে পারে, হুকুমও দিতে পারে ; কিন্তু সারা ফুটবল মরশুমে

দৈনন্দিন কাজের চাপ যা হয়ে পড়েছে, সে সব ঠিকমত করার যা খাটুনি, তাতে তার না আছে সময়, আর তা মানায়ও না তাকে। অতএব আর এক ফোঁটা উদারতার ডোজ ছাড়লে সাহেবরা। ১৯০৩ সালে একজন ভারতীয় জয়েণ্ট সেক্রেটারী নেওয়া হল। বিবেক নিয়ে, দায়িত্ব নিয়ে, নিজের কথা না ভেবে সর্বতোযত্নে কাজ করতে বাঙালী যে পরম নিপুণ, এ খ্যাতি তার তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। নীতিবিদ, নিরপেক্ষ এবং সচ্চরিত্র অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতী, অথচ বাঙালী ফুটবলার সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং সর্বজনমান্য মন্মথ গাঙ্গুলীকে দেওয়া হল সে পদ। সেই থেকে ইংরেজ আধিপত্যের শেষ যুগ পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চালু থেকেছে—একজন সাহেব সম্পাদক আর সঙ্গে একজন ভারতীয় যুগ্ম। একজনের জন্য পদমর্যাদা ও পদাধিকারের ক্ষমতা, আর একজনের জন্য কাজের দায়িত্ব। যুগ্ম সম্পাদকের ক্ষমতা যে কত সীমাবদ্ধ তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বহুবার।

কিন্তু মূল ক্ষমতা ছিল প্রথম থেকেই আই. এফ. এ. কাউন্সিলের হাতে। গভর্ণিংবডি প্রতি বছরে একবার বসে কাউন্সিল নির্বাচন করেই খালাস হত। প্রথম যুগে মুষ্টিমেয় সদস্য ক্লাবের প্রতিনিধি নিয়ে ছিল গভর্ণিং বডি। আজকের দিনে দুশ'র উপর অ্যাফিলিয়েটেড ক্লাব বছরে একদিন বসে গভর্ণিংবডি নির্বাচন করেই খালাস হয়েযায়। কিন্তু সেদিন গভর্ণিং বডিই ছিল মূল সদস্য ক্লাবদের সম্মেলন। একেত গভর্ণিং বডিতে সাহেবদের প্রাধান্য কায়েম ছিল, তার উপর আবার কাউন্সিলেও তাদেরই সংখ্যাধিক্য আইন করে স্থির করা ছিল। ক্রমে ভারতীয় সদস্য-ক্লাবের সংখ্যাবৃদ্ধিতে গভর্ণিং বডিতে ভারতীয় আসন সংখ্যা বাড়লো, কিন্তু কাউন্সিলে রইলো সেই চিরন্তন বৃটিশ ব্যবস্থা। অর্থাৎ যে যুগের খবর ও নথীপত্র ভালোভাবে পাওয়া যায়, সে যুগে গভর্ণিং বডির দশজন ইয়োরোপীয় সদস্যের তরফে কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব করতো আটজন, আর ভারতীয় সদস্য দশজনের প্রতিনিধি হয়ে থাকতো

চারজন। গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনমূলক বহিরাবরণে ইংরেজ শাসন ও প্রভূত্ব অব্যাহত রাখার এই ব্যবস্থাটুকুও অনেক সংগ্রাম করে আদায় করা হয়েছিল মন্মথ গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে।

মন্মথ গাঙ্গুলী যে কিরকম কড়া লোক ছিলেন, তার খবর মেডলিকট হাড়ে হাড়ে জানতো। কাজেই খুব বেশী বাড়াবাড়ি করতে সাহস পায়নি। আই. এফ. এ. শীল্ডে ন্যাশনাল তখন হেরে গেছে। নিয়ম আজও আছে, সেদিনও ছিল, যে প্রতিযোগিতায় যে ক্লাব যোগ দেবে, সেই প্রতিযোগিতা খেলার প্রয়োজনে মাঠ ছেড়ে দিতে হবে ক্লাবকে। ন্যাশানালের ছেলেরা দল ভাগ করে খেলছে। এমন সময় দুই গোরা দল এসে হাজির ন্যাশানালের মাঠে অর্থাৎ বর্তমান মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মাঠে। সঙ্গে রেফারী। বললে—ভাগো, আমাদের প্রতিযোগিতার খেলা এখানে হবে, মেডলিকটের নির্দেশ। ছেলেরা কেউ প্রমাদ গুণলে, কেউ ভয় পেল, কেউ কেউ বা রুখে উঠ্‌লো। ভূকৈলাস রাজপরিবারের সত্য মোহন ঘোষাল ছিলেন শেষ দলে। গোরাদের শুনিয়ে দিলেন, এ মেডলিকটের বাবার মাঠ নয়, অতএব গেট আউট।

সূর্পণখার নাক কাণ কাটা যাওয়ার খবর শুনে রাবণের দশ মুখে যে ক্রোধরক্তিমা ফুটে উঠেছিল, মেডলিকটের এক মুখ তার চেয়ে বেশী লাল হল। সাহেবের অসম্মান, সংস্থার অসম্মান, নেটিভের আস্পর্ধা। রাতারাতি সিদ্ধান্ত হয়ে গেল—ন্যাশানাল সাস্‌পেণ্ড। আর ইতর অভদ্র ভাষায় চিঠি লিখে সে খবর জানিয়ে দিলে মেডলিকট।

ক্লাব-কর্ণধার মন্মথ বাবু শুনে গুম হয়ে গেলেন। সত্য মোহনের ছেলে-মানুষীতে বিরক্ত এবং বিব্রত বোধ করলেন যথেষ্ট; কিন্তু তা বলে ফিরিঙ্গী মেডলিকটের ঔদ্ধত্য তাঁর মোটেই বরদাস্ত হল না। প্রথমে আবেদন করলেন, তারপর তদ্বিরও ব্যর্থ হল। অগত্যা নিরুপায় হয়ে আইনের

শরণ নিলেন মন্মথবাবু। আই. এফ. এ-র সেদিনের আইনের ভাষায় যা বোঝাত তা হল, যে ক্লাব তখনও অংশগ্রহণ করেছে তারাই মাঠ দিতে বাধ্য। সলিসিটার বললেন, ক্লাব যখন হেরে গেছে তখন আর তারা অংশগ্রহণ করছে না, অতএব মাঠ দিতে আইনত বাধ্য নয়। চলে গেল আই. এফ. এ-র নামে এটর্নির চিঠি। হয় সাসপেনশন তুলে নাও, নয় আদালতে বোঝা পড়া হবে। আই. এফ. এ-র সভাপতি বি. এন. আর-এর এজেণ্ট স্যার ক্লড ইজ্‌মে ছুটে এলেন কালীঘাটে স্কুল-মাষ্টার মন্মথ গাঙ্গুলীর বাড়িতে। মামলা করে কি হবে, মিটমাট করে নাও। উপযুক্ত ছেলে থাকলে তাকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারেন, এমন লোভও মন্মথবাবুকে দেখালেন বড় সাহেব ইজ্‌মে। সে প্রস্তাবে কাণ না দিয়েও মিটমাট মন্মথ বাবু করে-ছিলেন। সত্য মোহন বাবুর সঙ্গে সঙ্গে অভদ্র চিঠির জন্য মেডলিকটকেও মাপ চাইতে হয়েছিল, সাসপেনশন তো ওঠাতে হয়েছিল বটেই।

মন্মথবাবু-ই আই. এফ. এ-র সংবিধান লিখেপড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন সর্ব-প্রথম। অবশ্য সংশোধনে ও পরিবর্তনে আজ তার অনেক রূপান্তর এবং চরিত্রান্তর ঘটেছে। আই. এফ. এ-র শাসনব্যবস্থায় মন্মথবাবু ঐ মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিফর্মসের যুগে পৌঁছে দিয়েছিলেন। পরবর্তী শাসন সংস্কার এল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভিতর দিয়ে।

কলকাতার ফুটবলের একছত্র শাসনক্ষমতা ইয়োরোপীয়ানদের হাতে থাকার ফলে ভারতীয় দলগুলিকে যে যথেচ্ছাচার সইতে হত সাহেবদের প্রভুত্ব এবং প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য, তার বিরুদ্ধে সমস্ত ভারতীয় দল কোমর বেঁধে রণক্ষেত্রে নেমে পড়েছিল ১৯২৯ সালে। এ দিক থেকে চরম অস্ত্র-প্রয়োগের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি বুঝতে পেরেই, শেষ পর্যন্ত ইয়োরোপীয়ানরা ক্ষমতার ভাগাভাগিতে রাজী হয়।

ঘটনাটা এমন বিশেষ কিছু নয়। তবে বছরের পর বছর সাহেব রেফারি

ও লাইন্সম্যান থেকে সুরুকরে, খোদ আই. এফ. এ. কাউন্সিল এবং ফুটবল লীগ কমিটির অবিরাম পক্ষপাতিত্ব, ভারতীয় দলের জয়ের পথে সবসময় সাধ্যমত অন্তরায় সৃষ্টি—এর ফলে দর্শকসাধারণ, খেলোয়াড় ও ক্লাব-কর্তৃপক্ষের মনে যে ক্ষোভ দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, সেই বারুদস্তূপে বিস্ফোরণ ঘটাতে যে কোন সামান্য শলাকাই ছিল যথেষ্ট।

ড্যালহৌসী ও মোহনবাগানের মধ্যে লীগের প্রথম খেলা ড্যালহৌসীর মাঠে। ওদের লেফ্‌ট-ইন কুক-এর সেণ্টার থেকে রাইট আউট উইলিয়াম্‌স্‌ শট করায় সে শট ধরতে গোল-কীপার সন্তোষ দত্ত ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলে, টাল সামলে নিয়ে তার পর বল বার করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সকলকে স্তম্ভিত করে ফুর্‌র শব্দে গোলের নির্দেশ দেয় রেফারির বাঁশি। শরীর বেঁকে যাওয়াতে বল শুদ্ধ দত্তর হাত গোল লাইনের ওপারে চলে গিয়েছিল, এই ছিল রেফারির মত। চরম অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়লো দর্শক ও খেলোয়াড়দের মধ্যে। উত্তেজনায় ও রাগে মোহনবাগানের খেলায় উৎকর্ষের লক্ষণ লোপ পেয়ে গেল। মাত্র মিনিট খানেক বাকি ; কুক-এর আর একটা সেণ্টার থেকে গোলকীপারকে চার্জ করতে গেছে উইলিয়াম্‌স্‌, মুষ্টিযোদ্ধা সন্তোষ দত্ত বল বার করে দিতেই দেখা গেল, দুহাতে চোয়াল চেপে বেরিয়ে যাচ্ছে উইলিয়াম্‌স্‌। পরে জানা গিয়েছিল, তার চোয়ালের হাড় দুটুকরো হয়ে গেছে। সাহেবের অবস্থা দেখে রেফারি টি. ক্যামেরণ সে দিকের লাইন্সম্যান ম্যাকলারেনকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলে। তারপর দত্তকে দিলে ওয়ার্ণিং। সঙ্গে সঙ্গে বেড়া টপকে গ্যালারি থেকে লোক নেমে পড়লো মাঠে। ম্যাকলারেনের পিছনে লাথি পড়লো, ক্যামেরণ বাঁশি বাজিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল মাঠ থেকে। আর ফৌজী দর্শকের দল ছড়ি হাতে ছুটে এল জনতাকে পিটতে। তারপর এল পুলিশ। যথেষ্ট হৈ হল্লার পর শান্ত হল সব। পরে অবশ্য সাহেবরা প্রচার করলে যে ড্যালহৌসীর তাঁবুও ঘেরাও হয়েছিল এবং এসপ্লানেডে

সাহেবদের মোটর গাড়ীতেও ঢিল পড়েছিল। মাঠে অজস্র ইট পাটকেল বর্ষিত হয়েছিল, এমন অভিযোগও করেছিল ওরা।

খেলা শেষের ৩৫ সেকেণ্ড আগেই খেলা বন্ধ হয়েছে, এই কারণে পরদিন লীগ কমিটি ডি. এন. বসুর সভাপতিত্বে খেলাটি পুনরানুষ্ঠানের জন্য নির্দেশ দিলে। কিন্তু তারও পরের দিন যখন আই. এফ. এ. কাউন্সিল বসলো, সে খানেই বাঁধলো গোল। সভার প্রারম্ভেই সভাপতি স্যার টমাস ল্যাম্ব পরম উল্লাসহকারে ঘোষণা করলেন যে, ভারতীয় দর্শকদের এই দাঙ্গা বাঁধানোর প্রচেষ্টা কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না তিনি। ফুটবল যতই ভালো জিনিষ হোক, তার ফল যদি হয় ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয়ানদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তা হলে ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয়ানদের মধ্যে ফুটবল খেলা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া উচিত, এমন অভিমত ল্যাম্ব প্রকাশ করলেন। এবং ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব যে সর্বাগ্রে এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হবে এমন আশ্বাসও তিনি দিলেন। এর পর সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রতিনিধি ফাদার পপলে-য়ারের প্রস্তাবে সন্তোষ দত্তকে দুবছরের জন্য সাসপেণ্ড করা হল। সন্তোষ দত্ত উদ্দেশ্য নিয়েই উইলিয়াম্‌স্‌কে ঘুষি মেরে ছিল কি না রেফারি এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলতে না পারলেও, ম্যাকলারেনের সাক্ষ্যেই শাস্তি হয়ে গেল। খেলাটি পুনরানুষ্ঠানের জন্য লীগ কমিটির নির্দেশ নাকচ করে দিলে কাউন্সিল। অথচ আই. এফ. এ-র সহকারী সভাপতি ডি. এন. বসু তখন মোহনবাগানের জেনারেল সেক্রেটারী আর মোহনবাগানের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট জেনারেল সেক্রেটারী ডি. এন. গুঁই ওরফে গাইসবাবু তখন আই. এফ. এ-র যুগ্ম সম্পাদক।

দুদিন বাদেই মোহনবাগানের সঙ্গে ডি. সি. এল. আই-এর খেলা। দলে দলে লোক ক্যালকাটা মাঠ বন্ধ দেখে ছুটে এল মোহনবাগান তাঁবুতে। খবর জানা গেল, ল্যাম্বের এ শাসানি সহ্য করবে না কোন

ভারতীয় দল। ইয়োরোপীয়ানরা পাল্টা দাঙ্গা করতে পারে এমন ইঙ্গিত করতেও যখন কসুর করে নি ল্যাম্ব।

শ্যামবাজার বোসেদের বাড়ীতে সমস্ত ভারতীয় দলের সভা বসলো, অ্যাডভোকেট-জেনার্ল নৃপেন্দ্র নাথ সরকারের সভাপতিত্বে। সবার মেজাজ গরম। সুদীর্ঘ আলোচনার শেষে সিদ্ধান্ত হল, আই. এফ. এ-র সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেশী দলগুলি ইণ্ডিয়ান স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েসান নামে নতুন সংস্থা গড়বে। একমাত্র এরিয়ান্স ক্লাবের প্রফুল্ল মুখার্জী প্রস্তাব করেছিলেন, আই. এফ. এ-র কাছে প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে মিটমাটের চেষ্টা করা হোক। তাকে চেঁচিয়ে বসিয়ে দিল সবাই।

রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁরা ইংরেজের সহযোগিতাকেই দেশের উন্নতির পথ বলে বিশ্বাস করে সংগ্রামী রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত বিরোধিতা করেছেন সর্ব্ববিষয়ে, এই ব্যাপারে কিন্তু চরমতম গরম-পন্থীর উষ্মা নিয়ে তাঁরাই অনমনীয় অসহযোগ এবং সংগ্রামের পথ ধরলেন। ফুটবলের বর্ণ-বৈষম্য জাতীয় চেতনাকে সে যুগে কিভাবে আঘাত করতো, এতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যে আই. এফ. এ-র কাউন্সিলে চোদ্দটি ইউরোপীয়ান দলের প্রতিনিধি আট জন, আর ১৪০টি ভারতীয়দলের প্রতিনিধি চারজন, সেখানে ভারতীয়দের সুবিচার পাওয়ার আশা কোথায়, এই হল সবার প্রশ্ন। তাই দলে দলে ভারতীয় ক্লাবগুলি আই. এফ. এ. থেকে চিঠি দিয়ে নাম কাটাতে লাগলো। এই সংকট স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় মূল সংবাদের পৃষ্ঠায় প্রধান সংবাদের মর্যাদা পেল দুদিন। একদিন প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্টেটস্‌ম্যান লিখলে —মাথা গরম করে কোন দল যদি ফুটবল খেলা থেকে নাম কাটাতে চায়, কারো কিছু এসে যাবেনা তাতে। নদী নিত্যকার মত বয়ে চলবে, প্রতিদিনের সূর্যোদয়ে উত্তাপহানি ঘটবেনা কিছুই। কোথায় কোন কমিটি-ঘরে কে কি সিদ্ধান্ত করছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতি যেন তাতে ব্যাহত হচ্ছে—ইত্যাদি।

চিঠি-পত্রও ছাপা হল অনেক। একদল বললে—সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য মোহনবাগানকেই সাসপেণ্ড করা উচিত। কর্তৃপক্ষের সমস্ত রকম অ-খেলোয়াড়ী পুকুর চুরির সমর্থনে জনসাধারণ এবং ভারতীয়দের মধ্যে খেলোয়াড়ী মনোভাব দাবী করা হল। সন্তোষ দত্তকে জন্মের মত সাসপেণ্ড করার যে সংশোধনী প্রস্তাব আই. এফ. এ. কাউন্সিলের সভায় বাতিল হয়েছিল, তাকে কার্যকরী করার দাবীও শোনা গেল। আর একদল চিঠি দিয়ে জানাতে চাইলে যে রেফারিং-এর ক্রমাবনতিই যখন সব অনর্থের মূল, সে সম্পর্কে আই. এফ. এ. উদাসীন কেন? একথাও উঠলো যে সভার স্থরুতেই পক্ষপাতমূলক উষ্মাবর্ষণের কোন আইন-সঙ্গত অধিকার সভাপতি ল্যাম্ব সাহেবের ছিলনা। লীগ কমিটির সিদ্ধান্ত নাকচ করা যে আই. এফ. এ-র বিধিবহির্ভূত, এমন মন্তব্যও করলেন অনেকে।

ল্যাম্ব সাহেব এবং ডি. এন্ বসুর বন্ধু হিসেবে শেষ পর্যন্ত নৃপেন সরকারই সালিশী করতে লেগে গেলেন। অনেক সভা-বৈঠক ও আলাপ-আলোচনায় সিদ্ধান্ত হল—এবার থেকে আই. এফ. এ. কাউন্সিলে সাহেবদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আর চলবেনা। ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় সাত সাত চৌদ্দজন সদস্য নিয়ে হবে কাউন্সিল। সন্তোষ দত্ত'র সাস্‌পেনশন্‌ও রদ হল। তবে খেলাটি পুনরানুষ্ঠানের প্রশ্ন আর তোলা হল না।

১৯২৯ এর প্রতিক্রিয়া হল সুদূরপ্রসারী। আঘাত খেয়েই আমরা ভবিষ্যৎ আঘাতের আশঙ্কা দুর করবার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করলাম। অর্থাৎ কলকাতা ফুটবলের পরিচালনায় ইয়োরোপীয়ান আধিপত্য এরই ফলে চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেল। এর পরেও ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় বলে ক্লাবগুলিকে মার্কা করে রাখা হয়। ইংরেজের চিরন্তনী ভারসাম্য-নীতি অনুসারে ভারতীয় দলের এবং ইয়োরোপীয়ান দলের নির্দিষ্ট সংখ্যামত পৃথক প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থাও কায়েম থাকে। আর একজন শ্বেতকায় সেক্রেটারীর

সঙ্গে ভারতীয় যুগ্ম সম্পাদকের ব্যবস্থাও বহাল থাকে। সাহেব রেফারি আধিক্যও চলে বহুদিন। আই. এফ. এ-র বর্তমান খাঁটি স্বদেশী এবং বারোয়ারীতলা-মাফিক চেহারা একেবারেই উত্তর-স্বাধীনতা কালের সৃষ্টি।

সাদা রেফারীর পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে খেলার মাঠে অহিংস অসহযোগ করেছে মোহনবাগান একাধিকবার। সে অনেক পরে, ১৯৩৫ ও ১৯৩৮ সালে, মহামেডান স্পোর্টিং এর প্রাধান্যের যুগে, যথাক্রমে ক্যালকাটা এবং কে. ও. এস. বির বিরুদ্ধে খেলায়। দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে অনেকগুলি গোল খেয়েছিল।

খেলার পরিচালনায় ইয়োরোপীয়ানদের দাপট ও একাধিপত্য কমে আসারপর সাহেবীদলগুলির উৎকর্ষ বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। তাবলে একথাও কোন সুস্থবুদ্ধি লোক ধীরমস্তিকে কখনও বলবে না যে, পরিচালনায় একাধিপত্যের জোরেই প্রতিযোগিতার ফলাফলে ইয়োরোপীয় দলগুলির প্রাধান্য কায়েম ছিল।

আই. এফ. এ-তে ভারতীয়েরা ক্ষমতার সমান অংশ পাওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যেই খেলার ফলাফলে ইয়োরোপীয় প্রাধান্যে ভাঙন ধরে। প্রধান বে-সামরিক ইয়োরোপীয়ান দল ক্যালকাটা ও ডালহৌসী এরও পরে বছর দুই মাঝে মাঝে পূর্বগৌরবের চকিতদীপ্তি প্রকাশ করেছে। আর বৃটিশ ফৌজী দলগুলির মধ্যে দুটি একটি দল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হবার আগে পর্যন্ত কোন কোন বছর এসে জানিয়ে দিয়ে গেছে যে গোরা-পল্টনী ফুটবল একেবারে মরেনি।

ওদেরি জয়জয়কার

১৯৩৪ সালে যে সাহেব ও গোরাপল্টনের যুগের পরিসমাপ্তি বলা যায়, তার ইতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমনি গৌরবোজ্জল। সে গৌরব শুধু বিজয়ী ইয়োরোপীয়ান দলগুলির ছিল না। বিজিত ভারতীয় দলগুলির পক্ষেও সে যুগই ছিল গৌরবের। কর্ণের হাতে নিহত হওয়ার মধ্যেও ঘটোৎকচের যে গৌরব ছিল, শুধু শল্য'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হলেও সে গৌরব কখনও লাভ করা যেত না। সিংহ শিকারে গিয়ে ব্যর্থ মনোরথে দু-চারটে জখমী নিয়ে আসাও পরম গৌরবের। খরগোস বা শিয়াল শিকারের সার্থকতায় যে প্রসাদ লাভ করে, সে আর যাই হোক শিকারী নয়।

সে যুগে মোহনবাগান ১৯১১ সালের পরে না পেয়েছে লীগ, না পেয়েছে শীল্ড। কিন্তু মহাশক্তিমান ক্যালকাটা ও ড্যালহৌসীকে তারা বহুবার পরাজিত করেছে, পরাজিত করেছে বহু দুর্ধর্ষ গোরা দলকে। আর শেষ পর্যন্ত যখন পরাজিত হয়েছে, প্রবলতম প্রতিরোধে বিপক্ষকে জর্জর করে। তাও অনেক সময় ধর্মযুদ্ধে নয়। শুধু মোহনবাগান কেন, সে যুগে এরিয়ান্স, কুমারটুলি এবং ইস্টবেঙ্গলও তাদের সেদিনকার কৃতিত্বে আজকের লীগ ও শীল্ড বিজয়ের চেয়ে অনেক বেশী গর্ব বোধ করতে পারে।

ইংল্যাণ্ডের পেশাদারী ফুটবলের কথা না ধরে, যদি তাদের বাছাই অ-পেশাদার ইসলিংটন কোরিন্থিয়ান্স বা যুদ্ধোত্তর যুগের সুইডিশ, জার্মান বা অষ্ট্রিয়ান দলগুলির সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে তুলনায় সে যুগের ক্যালকাটা, ড্যালহৌসী এবং বহু ফৌজী দল বোধ হয় উপরেই থাকবে। অবশ্য খেলার কৌশলে সে যুগ আর এ যুগে অনেক তফাৎ।

১৮৯৩ সালে আই. এফ. এ. শীল্ডের অভ্যুদয়ে ট্রেডস্-কাপ গৌণ প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হয়েছিল। তবু পুরোপুরি ভারতীয় দল ১৯০০ সালের আগে তাতে বিজয়ী হতে পারে নি। ট্রেডস্ কাপে প্রথম বছর ড্যালহৌসী এবং তার পর তিনবার গোরাদল জয়ী হয়। শীল্ড প্রবর্তনের বছর থেকে শুরু করে পর পর চার বছর ট্রেডস্ কাপে ইয়োরোপীয়ান এবং অ্যাংলোইণ্ডিয়ান ছাত্র নিয়ে তৈরী সেণ্ট জেভিয়ার্স, মেডিক্যাল ও শিবপুর কলেজ জয়ী হয়। পরবর্তী দু'বছর জেতে জামালপুর অ্যাপ্রেন্টিস ক্লাব, সেটিও ফিরিঙ্গীপুষ্ট দল ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৯ সালে বিজয়ী হেস্টিংসও ছিল তাই। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সর্বভারতীয় মুখ্য প্রতিযোগিতায় সামরিক বা বে-সামরিক খাস বিলাতী সাহেবদের প্রাধান্য থাকলেও, এদেশের মাটিতে ফুটবলে সাহেব ও ফিরিঙ্গী সমাজ পোক্ত হয়ে উঠ্ছিল, খাঁটি ভারতীয় তথা বাঙালী সমাজ পোক্ত হতে দুচার দিন দেরী হলেও। অবশ্য সে যুগের মার্কামারা কোন কোন ভারতীয় দলে ফিরিঙ্গী বা ইংরেজ খেলোয়াড় দু একজন অনেক সময় দেখা যেত।

সাহেব দলগুলির পরস্পর খেলার শখ মেটাবার জন্য যখন লীগ সুরু হল ১৮৯৮ সালে, প্রথম আটটি দল নিয়ে তা সুরু হয়ে ছিল তার মধ্যে স্থানীয় গোরা দল ছিল তিনটি। বাকী দলগুলি ছিল ক্যালকাটা, ড্যালহৌসী, রেঞ্জার্স, হাওড়া ইউনাইটেড ও ওয়াই এম. সি. এ। গোরাদল বছর দুই বাদে বাদেই বদল হয়েছে। কলকাতার কেল্লায় একাধিক ফৌজ থাকলে তাদের দল আর বারাকপুরের দল এ গুলি পল্টন বদলি হবার সঙ্গে সঙ্গে বদল হয়েছে, পুরাণো দলের বদলে এসেছে নতুন দল। ১৯০৩ সালে বে সামরিক বার্ণস এ. সি-কে লীগে খেলতে দেখা যায়। মাত্র এক বছর। তারপর ক্যালিডোনিয়ান্স বলে এক স্কট সাহেবের দল খেলে ১৯০৫-৮ পর্যন্ত। ১৯০৯ সালেই উঠে যায় সে ক্লাব। বর্তমান পুলিশ মাঠ সেসময়

ক্যালিডোনিয়ান্সের মাঠ ছিল। ক্যালিডোনিয়ান্স যে কি করে প্রথম বিভাগে এসেছিল সে রহস্য সমাধান করা যাবে না। কারণ ১৯০৪ সালে সাহেব দলগুলির জন্য যখন লীগের দ্বিতীয় বিভাগ প্রবর্ত্তন হয়, তাতে সাতটি দলের মধ্যে ওরা ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল, মেজারার্সের ঠিক ওপরে। পরের বছর দ্বিতীয় বিভাগে কাস্টম্‌স ও পুলিশ দলের আবির্ভাব। কিন্তু তারপর সাত বছর পুলিশের কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি। ১৯০৬ সালে মেডিকালস দ্বিতীয় বিভাগ লীগে চ্যাম্পিয়ান হওয়া সত্ত্বেও পরের বছর তাদের প্রথম বিভাগে দেখা যায়নি। কিন্তু কাস্টম্‌স যখন চ্যাম্পিয়ান হল ১৯০৭ সালে, যথা সময়ে তাদের জন্য প্রথম বিভাগে আসন জুটে যায়। ১৯০৯ সালে ফৌজীদল আর. জী. এ. এবং গর্ডন্‌সের পরে তৃতীয় স্থান পেয়ে মেজারার্স ওপরের বিভাগে উঠে আসে, কিন্তু ১৯১২ সালে ফের নেমে যায়। ওদিকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এই এগার বছরের মধ্যে খাঁটি সাহেবীদল ওয়াই. এম. সি. এ. ছবার প্রথম বিভাগ লীগের তলায় পড়ে থাকে। আর বাকী পাঁচবারও কোন মতে দু-এক ধাপ উঠে থাকে। ১৯১৫ সালের আগে কেন যে ওদের দ্বিতীয় বিভাগে নামান হয়নি, সে কারণ অজ্ঞাত। ১৯০৭ সালে একবার মাত্র প্রথম বিভাগে নিম্নতম স্থান পাওয়ার পর একেবারেই উঠে যায় হাওড়া ইউনাইটেড্। এই হাওড়া ইউনাইটেড মার্কামারা ইউরোপীয়ান দল ছিল, কিন্তু কখনও কখনও দু'এক জন বাঙালী খেলোয়াড় এদলে ঠাঁই পেয়েছে।

১৯১৩ সালে সে যুগের ই. বি. এস. আর. (পুরানো ই বি. আর. এর-নাম) নামে ইউরোপীয়ান দলটিকে প্রথম বিভাগে খেলতে দেখা যায়, যদিচ আগের বছর দ্বিতীয় বিভাগে ওরা মাত্র তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। প্রথম স্থানের অধিকারী ব্ল্যাকওয়াচ এর প্রথম দল প্রথম বিভাগে খেলত বলে আইনত তাদের 'বি টিম' আর উঠতে পারতো না। কিন্তু দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী শিবপুর কলেজের দাবী ১৯০৪ সালের মত এবারেও উপেক্ষিত হল।

সে যুগে অনেক কলেজ এবং অফিস তাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে 'খেলার জন্য খেলা' এই মনোভাব রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের দলকে প্রথম বিভাগে ওঠান অনুমোদন করেনি। হয়তো পুলিশের মতই মেডিকেল এবং শিবপুর কলেজের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। তবে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, সাহেবদের যুগে সবই কড়াকড়ি নিয়ম মাফিক কাজ হত। বরং আজকের দিনেই প্রতিটি দল এমন অধিকার সচেতন, যে একটু অপছন্দ কিছু ঘটলেই 'যুদ্ধং দেহি' বলে কোমর বেঁধে লাগে; সম্ভব হলে আই. এফ. এ-র মধ্যে, প্রয়োজন হলে সোজা আদালতে। দ্বিতীয় ও প্রথম বিভাগে ওঠানামায় সে যুগে অনেক সময় যে অনেক খামখেয়ালী হয়েছে তার প্রমাণ লীগ তালিকাগুলি ঘাঁটলেই পাওয়া যায়। তবে কর্তৃপক্ষের মনের খুশীমাফিক ওঠানানার ব্যবস্থা কিংবা ওঠানামা রদ করার জন্য হয়তো সে যুগেও কিছু না কিছু ওজুহাত দেখান হত। অবশ্য না দেখালেও ক্ষতি ছিল না, কারণ কর্তৃপক্ষের দাপট ছিল অপরিসীম, আর অবাধ ক্ষমতার যুগই ছিল সেটা। আজ বেড়াল কুকুরটারও অধিকার এবং দাবীর জ্ঞান টনটনে। তাই ওজুহাত তো দূরের কথা, যথেষ্ট যুক্তিসম্মত কারণ থাকলেও তা কেউ মেনে নিতে রাজী হয় না। ষোল আনার উপর আঠার আনা প্রাপ্য অধিকার চাই-ই। তা যদি কারোর বুকের আধসের মাংস হয়, আমার কোন কাজে লাগবে না এবং লোকটার মৃত্যু তাতে অবধারিত জেনেও এ যুগে কেউ আমরা তা ছাড়তে রাজী নই। আইনত আমার যা প্রাপ্য, আমাকে তা দেবে না কেন? এই হল যুগের প্রশ্ন। পোর্শিয়া যে বাজে যুক্তির গোঁজামিলে শাইলককে কোন-ঠাসা করেছিলেন, একপক্ষ ইহুদী, আর অপরপক্ষ এবং বিচারক রাষ্ট্রপ্রধান খৃষ্টান না হলে সে যুগেই তা অচল হত, এ যুগে তা গঞ্জিকাসেবীর প্রলাপ বলেই গণ্য হবে।

সে যাই হোক, ই. বি. এস. আর-এর বিচিত্র কাহিনীতে ফিরে আসা

যাক। ই. বি. এস. আর, স্টেটবর্জিত শুধু ই বি. আর হয়ে ১৯২৩ পর্যন্ত প্রথম বিভাগে খেলে। দলে এতদিনে কিছু বাঙালী খেলোয়াড় এসে গেলেও আই. এফ. এ-র নথীমত তার ইয়োরোপীয়ান মার্কা থেকেই যায়। এর পর বহুবার ওঠা-নামার ভিতর দিয়ে, আর শিয়ালদা রেলের নাম বদলের হিড়িকে বারে বারে নাম বদলে, এরা বর্তমানে ই. আই আর. নামে খেলছে। মাঝখানে (১৯৪২) বি. য়্যাণ্ড. এ. রেল হিসেবে ইয়োরোপীয়ান মার্কামারা অথচ পুরোপুরি ভারতীয় খেলোয়াড়পুষ্ট হয়ে আই. এফ. এ. শীল্ডও পেয়েছে ওরা।

রেল দল ইয়োরোপীয়ান যুগের অবসানে শীল্ড পেয়েছে। অথচ ওই একবার ফাইনালে ওঠা আর বারকয়েক দ্বিতীয় বিভাগ লীগে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হওয়া ছাড়া, আর কোন কৃতিত্বের ইতিহাস ওদের নেই। তবু সে যুগে যে সব দুর্ধর্ষ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড় ছিল, কলকাতার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের তালিকায় যাদের আসন অবিসম্বাদী, তাদের মধ্যে রেল-দলের জনকয়েক নিশ্চয়ই স্থান পেতে পারে।

ই. বি. এস্. আর-কে দ্বিতীয় বিভাগে মাত্র তিন বছর খেলার পরেই যারা প্রথম বিভাগে তুলে আনে, তাদের মধ্যে প্রধান বীর ছিল সেণ্টার-হাফ চার্চিল। তার স্বনামধারী ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতার মতই সেও ছিল কূটবুদ্ধি, অক্লান্ত কর্মী ও ব্যূহ রচনায় পরম দক্ষ। আর দৈহিক দৈর্ঘপ্রস্থে দানবাকৃতি বললেই হয়। ১৯১০ সালে মোহনবাগান যখন দ্বিতীয় বছর শীল্ড খেলতে এসে ই. বি. এস. আর-এর কাছে হেরে যায় প্রথম খেলাতেই, তখন মোহনবাগান এবং দলের সমর্থকরা এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছিল যে, চার্চিল যে দলের কেন্দ্রশক্তি, সে দলের কাছে পরাজয়ে কোন গ্লানি নেই। অনেকের মতে চার্চিলই কলকাতার শ্রেষ্ঠ সেণ্টার-হাফ।

চার্চিল-এর পরে এই দলে প্রধান খেলোয়াড় ছিল ডি'সিলভা, গোল-

কীপার নয়তো বেড়া। পূর্ণ দাসের আবির্ভাবের আগে ডি'সিলভা-ই কলকাতার সেরা গোলকীপার বলে গণ্য হত। সে যুগের দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় জো গ্যালব্রেথ প্রথমে কাস্টম্‌সে খেলেছে। ১৯০৯ সালের শীল্ড ফাইনালে সে-ই ছিল কাস্টম্‌সের সেণ্টার-ফরোয়ার্ড। কিন্তু এই দশকের শেষ দিকে এবং তারও পরে তাকে ই. বি. আর-এ খেলতে দেখা গেছে সেণ্টার-হাফে। যেমন তার ড্যাশ, তেমনি বুলেট-মার্কা শট ও হেড; আর তার খেলার দৈহিক কসরতের ঠেলায় তাকে ভয় করতো সবাই। 'মারকুটো' বলে যে তার পরিচয় ছিল, তা ছিল একাধারে খ্যাতি ও কুখ্যাতি। এরও পরের যুগে জি. কার্ভে বলে ই. বি. আর-এর যে ব্যাক ছিল, তার খেলাও ছিল প্রথম শ্রেণীর। শেরউড ফরেস্টার্স যে যুগে তৃতীয়বার শীল্ড জেতে, সেবারকার লোকাল বনাম ভিজিটার্স দলের খেলায় যে স্থানীয় দল জয়ী হয়েছিল, তাতে কুমার ও মোনা দত্তর মত কার্ভের কৃতিত্বও কম ছিল না। সন্মথ দত্তর সাথী হিসেবে তার সে দিনের খেলা কলকাতার মাঠে ফুটবলে ব্যাক খেলার অনবদ্য নিদর্শন বলে গণ্য হবার যোগ্য।

সব সত্বেও রেল দলের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক সামাদ। ইয়োরোপীয়ান মার্কামারা দলের বাঙালী খেলোয়াড়। সে তো খেলোয়াড় নয়, যাদুকর! তার পায়ে বল যাওয়া মাত্র এমন ভাবে অদৃশ্য রবারের সুতো দিয়ে তা বাঁধা হয়ে যেত, যে বল যতই সামনে এগিয়ে দিক, ঠিক ওর পায়েই ফিরে আসবে। অর্থাৎ এগিয়ে গিয়ে বল ঠিক ধরে ফেলবে সামাদ। চার পাশে ঘিরে ধরে কেউ ওর কাছ থেকে বল কাড়তে বা ওর শট মারায় বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি।

অনেক ফুটবল-পণ্ডিতমন্য অবজ্ঞার হাসি হেসে মন্তব্য করেন, ও খেলা খেলাই নয়; লোক-মাতানো গ্যালারি-প্লে, কি কাজে আসে দলের? কাজে হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই আসেনি, কারণ গোলে শট করায় ওর কেমন যেন এক

বৈরাগ্য ছিল। বল নিয়ে সোজা ঢুকে পড়বে গোলকীপারকেও কাটিয়ে, এই ছিল লক্ষ্য। তাতে অনেক সময় গোলকীপার কেড়ে নিয়েছে বল, তারতো হাত দিয়ে ধরার অধিকার। খেলায় জেতা-হারার প্রশ্ন আদর্শগতভাবে অবান্তর হলেও, তা-ই আজকাল বড় হয়ে উঠেছে। এবং সেই প্রশ্ন বিচার করেই পণ্ডিতেরা সামাদকে 'ছো ছো' করেন। কিন্তু দর্শকদের আনন্দ দেওয়া যদি ফুটবল খেলার কোন উদ্দেশ্য হয়, সে উদ্দেশ্যে সামাদের মত সার্থক কেউ কোনদিন হতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ। তবে চাকরীর প্রয়োজনে প্রথমে তাজহাট দলে, তারপর ফিরিঙ্গীসমভিব্যাহারে রেলদলে খেলতে বাধ্য হয়ে সাধারণ খেলায় মনপ্রাণ ঢেলে দেবার প্রেরণা ছিলনা তার, ফলাফলে ছিলনা উৎসাহ। জনতার মনোরঞ্জন করে হাততালি পাওয়াতেই ছিল সার্থকতা। ই. বি. আর. বা তাজহাট—দুদলের হয়েই বছরের পর বছর খোলা মাঠে খেলতে হয়েছে তাকে। ফালতু বিনা-পয়সার দর্শকদের সামনে যাদুগিরি আর একদল সাহেবের তারি তালে তালে বাঁদর-নাচ, ঘেরা-মাঠে বনেদী দর্শকদের সামনে মোহনবাগানের জয়-পরাজয়ের থ্রিলও বোধ হয় তার কাছে নগন্য।

দীর্ঘ আকার, লম্বা অথচ পুরুষ্টু দুটো ঠ্যাং। ধারে ধারে লাইনের কাছে পায়চারি করছে সামাদ। হাতের তুড়ি দিয়ে কিংবা চোখের ইসারায় বলটা তাকে দেবার ইঙ্গিত করলে স্বদলের কাউকে। বল আসছে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে দুহাত দিয়ে মোচের দুদিকে দুমড়ে দিলে, একবার চোখ পাকিয়ে দেখে নিলে চারদিক। হয়তো বা সেই মুহূর্তেই দু আঙুলে নাকটা ঝেড়ে নিলে একবার। এই প্রস্তুতি মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। তারপর যা সুরু হল, তা হয়ত চলবে কয়েক মিনিট ধরে। সে সময়টুকুতে ভুলে যেত লোকে, খেলায় জেতা-হারা বলে প্রশ্ন আছে, গোলে বল ঢোকানো খেলার মূল লক্ষ্য। নিজের দল হেরে ভূত হয়ে যাচ্ছে, খেয়েই হয়তো বসে আছে দু-চার গোল, কে ধার ধারে তার? সামাদের

ভেল্কি, সাহেব-নাচানো অদৃশ্য ডুগডুগি ও অশ্রুত তুড়ির তালে তালে সেই মুহূর্তে দর্শকদের কাছে এই খেল্ ছাড়া আর সব কিছু লোপ পেয়ে যেত।

কলকাতায় ইয়োরোপীয়ান-মার্কা স্থানীয় ফিরিঙ্গীদের যত ফুটবল ক্লাব হয়েছে, তার মধ্যে কাস্টম্‌সের ঐতিহ্যই সবচেয়ে গৌরবময়।

তৃতীয় দশকের সুরু থেকে প্রথম বিভাগ লীগে কোন মতে টিকে থাকার সংগ্রাম করতেই দেখা গেছে ওদের। তারপর অবশ্য ইয়োরোপীয়ান যুগের অবসানে শীল্ড ফাইনালও খেলেছে ১৯৩৯ সালে। কিন্তু এই সময়কার নিরস্তপাদপ দেশে এরণ্ডের সম্মান নয়, কলকাতার ফুটবলে যখন খাঁটি ইয়োরোপীয় সামরিক ও বে-সামরিক দলগুলির উৎকর্ষ চরমে চলেছে, সে যুগেও কাস্টম্‌স তিন তিনবার শীল্ডে রাণার্স-আপ হয়েছে।

১৯০৮ সালে ওরা যখন গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্সের কাছে দুগোলে হেরে যায় শীল্ড ফাইনালের খেলায়, তখনও সে দলে গ্যালব্রেথের আবির্ভাব হয়নি। ম্যাকরেডি ছিল সেণ্টার-ফরোয়ার্ড। পরের বছরও ফাইনালে উঠ্‌লো যখন কাস্টম্‌স্, তখন ম্যাকরেডি পিছিয়ে এসে ব্যাক খেলছে, আক্রমণ চালনার ভার নিয়েছে নতুন খেলোয়াড় গ্যালব্রেথ। আগের বারের লেফ্‌ট-আউট ফিট্‌জপ্যাট্রিক গোলে। এবার কাস্টম্‌স্‌কে এক গোলে হারাতেও বেশ বেগ পেতে হয়েছিল গর্ডনকে।

১৯১৫ সালে কাস্টম্‌স ফাইনাল খেলে ক্যালকাটার সঙ্গে। এবারেও ম্যাকরেডি গ্যালব্রেথ যথাস্থানে আছে। তবু তিন গোলে হারিয়ে দিলে ক্যালকাটা।

পর পর দুবছর শীল্ডে রাণার্স-আপ হবার পর ১৯১০ সালে কাস্টম্‌স প্রথম বিভাগ লীগ ধরো-ধরো হয়েছিল। সমান পয়েণ্ট করেছিল ওরা ড্যালহৌসীর সঙ্গে। গোলের হিসেবে ড্যালহৌসী লীগ পেলে, কিন্তু কাস্টম্‌স্-ই একটা খেলা বেশী জিতেছিল।

কাস্টম্‌সের প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় গ্যালব্রেথের কথা ই. বি. আর. প্রসঙ্গে বলেছি। তাবলে ম্যাকরেডি কিছু কমতি ছিল না। যারা অনেক ফুটবল খেলা দেখেছে, তাদের মতে ম্যাকরেডির মত ব্যাক কলকাতায় বেশী খেলেনি। সঙ্গে স্মিথ মাণিকজোড়। চৌকষ স্পোর্টস্‌ম্যান হিসেবে হোসীর পরেই ম্যাকরেডি। হোসী ইংরেজ, ক্যালকাটার খেলোয়াড়, ম্যাকরেডি কলকাতা-জনম ফিরিঙ্গী, কলকাতার গৌরব। হকীতে কাস্টম্‌সের মহা-গৌরবময় ইতিহাসে ম্যাকরেডির বিশেষ স্থান আছে। কলকাতা ক্রিকেটে দুশ'র বেশী ব্যক্তিগত রাণ সর্বপ্রথম করে ম্যাকরেডি, তাও একদিনের খেলায়। বোলিং-এও সে ছিল দুর্ধর্ষ।

সে যুগে কাস্টম্‌সের সেণ্টার-হাফ ছিল হাইল্যাণ্ড, অক্লান্ত পরিশ্রমী। পরে ড্যালহৌসীর ব্যাক খেলে আরও নাম করেছিল সাহেব।

কাস্টম্‌সের সবাই ফিরিঙ্গী ছিল না, হাইল্যাণ্ড ছিল স্কচ। তবে উইলি-য়াম্‌সন বলে যে ফরোয়ার্ড ছিল, খেলতো খাসা, কিন্তু রঙ্‌ ছিল একেবারে ব্লাক-সীতে চোবানো। লোকে তার নাম দিয়েছিল পেঁচো। আর 'পেঁচো' হাঁক শুনলেই ক্ষেপে যেত সাহেব। তার পরে খেলার মধ্যে; বিশেষ করে বাঙালী দলের বিরুদ্ধে, গায়ের জোর ফলাতে সুরু করতো।

গায়ের জোর ফলানোয় অবশ্য গ্যালব্রেথ ছিল সর্দার, যদিও এমনিতে ওর খেলা ছিল পরিস্কার। বুলেট শট নয়, মাপা পাস, ঠিক যেখানে যতটুকু জোরে মারতে হয়। গোলে মারবে, তাও গোলকীপারকে ধোঁকা দিয়ে টুক করে ঠেলে দেবে। অথচ সেই গ্যালব্রেথের মারেই ১৯১৫ সালের এক শীল্ড ম্যাচে বাঙালীর ফুটবল-গুরু দুখীরাম স্যারের নিজস্ব খেলায় পূর্ণচ্ছেদ পড়েছিল।

শেষ যুগে কাস্টম্‌সের সবচেয়ে নাম করা খেলোয়াড় ছিল গোলকীপার জার্ডিন ও রাইট-ইন সীম্যান। তাছাড়া ব্যাক ম্যাকগুইর এবং হাফব্যাক

রেবেলো চতুর্থ দশকে খ্যাতি অর্জন করেছিল। অপর ফিরিঙ্গীদল রেঞ্জার্সের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ছিল গোলকীপার রাইপার, তৃতীয় দশকের খেলোয়াড়। যে ই. আর. লম্‌স্‌ডন পরে ড্যালহৌসীতে খেলেছে, মহামেডান স্পোর্টিং-এর যুগে রসিদের পরেই সে শ্রেষ্ঠ সেণ্টার-ফরোয়ার্ড বলে বিবেচিত হত। খেলত তখন রেঞ্জার্সের পক্ষে। তবে শেষ যুগের কোন ফিরিঙ্গী খেলোয়াড়কেই গ্যালব্রেথ, ম্যাকরেডি, স্মিথ, বা ডি-সিলভার সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

এতক্ষণ সে সব সাহেবী দলগুলির কথা বললাম, তারা ছিল কলকাতা ফুটবলে ঝোপ-ঝাড়ের সামিল। কাস্টম্‌স্‌কে স্টেট্‌স্‌ম্যান বলতো "সারপ্রাইজ প্যাকেট্‌স্‌"। অর্থাৎ বিস্ময়কর ফলাফল সৃষ্টি করতে ওস্তাদ। এ থেকেই বোঝা যায়, শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ওদের যে কৃতিত্ব প্রকাশ পেত, তা স্বাভাবিক নয়। এমনিতে ওদের কাছে বেশী কিছু আশা করা অনুচিত।

কলকাতা ফুটবলের সুরু থেকে ইয়োরোপীয়ান পর্বের সমাপ্তি পর্যন্ত বড়দা ও মেজদা ছিল ক্যালকাটা ও ড্যালহৌসী, দুই মহীরূহ। তার মধ্যে মহামহীরূহ ছিল ক্যালকাটা, বিলেতী জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানীর বড় সাহেবদের দল। ড্যালহৌসী তো ছিল যত পাতি সাহেবের আখড়া। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এবং সামাজিক জীবনে উচ্চতম বর্ণের সাহেবরাই ক্যাল-কাটা ফুটবল ক্লাবে কল্‌কে পেত। ড্যালহৌসীর সাহেবদের শেষের যুগে লোকে বলতো চটকলের সাহেব। লীগের শেষে ওদের বহু খেলোয়াড় সত্যিই শীল্ডে 'ইণ্ডিয়ান জুট মিল্‌স্‌ এর' হয়ে খেলত।

লীগ ও শীল্ডের ফিরিস্তিতে ড্যালহৌসীর কীর্তি ক্যালকাটার তুলনায় অনেক ম্লান ছিল। কিন্তু দুর্ধর্ষ দল হিসেব ড্যালহৌসীর ইজ্জত ছিল প্রচুর। ক্যালকাটার পরেই ১৮৯৭ সালে ৪১ ফিল্ড ব্রিগেডকে চার গোলে হারিয়ে

প্রথম শীল্ড জেতে ড্যালহৌসী। তার পর ১৯০০ সালে আবার যখন ফাইনালে ওঠে, ছ গোলে কুপোকাৎ করে দেয় ওদের ক্যালকাটা। শীল্ড ফাইনালে এত গোল আজ পর্যন্ত কোন দলই খায়নি। ৯৩ হাইল্যাণ্ডার্স-এর কাছে ১৯০২ সালের ফাইনালে তিন গোল খাবার পর, আবার ফাইনালে ওঠে ওরা ১৯০৫ সালে। আই. এফ. এ. শীল্ডে ১৯০৫ সালের খেলাটিকে নিঃসন্দেহে সব চেয়ে ঐতিহাসিক ফাইনাল বলা যেতে পারে। ইতিহাস রচিত হয়নি বটে, কিন্তু নব ইতিহাস রচনার পরম সম্ভাবনা ব্যাহত হয়েছে। সেই কারণে বোধ হয় এটিকে কলকাতা মাঠের সবচেয়ে ট্র্যাজিক ফুটবল ম্যাচ বলা যেতে পারে।

এর আগে পর পর দুবছর শীল্ড বিজয়ী হয়েছে ক্যালকাটা। ১৯০৮-১০ সালে পর পর তিনবার শীল্ড জিতে যে অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেছিল গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স, তারও আগে সেই অভাবনীয় গৌরব অর্জনের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে তখন ক্যালকাটা। দুর্ধর্ষ দল। ব্যাকে ভি. কুপার, সেণ্টার-হাফে ফাইফ, ফরোয়ার্ডে ইজমে-কুপার-শারম্যান ত্রয়ী—এদের সমান পর্যায়ের খেলোয়াড় বেশী দেখা যায়নি কলকাতার ফুটবলে। জয় প্রায় নিশ্চিত। ক্লাবের সদস্য থেকে খেলোয়াড় সবাই নবকীর্তি স্থাপনের স্বপ্নে মশগুল, নিঃশঙ্ক আশায় মন ভরপুর। খেলার শেষে বিজয়-পর্ব সাঙ্গ করার সঙ্গে সঙ্গে যে আনন্দ অনুষ্ঠান হবে, তার জন্য সব ব্যবস্থা তৈরী।

কিন্তু দুই সাহেবের ব্যক্তিগত কি একটা বৈষম্যের ফলে খেলা সুরুর আগে গোল-কীপার ডড্‌স্ জানালে, শারম্যান দলে থাকলে সে খেলবে না। শারম্যান দলের অধিনায়ক, বোধ হয় ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব চিন্তাও করা যায় না। কিন্তু ডড্‌স-ও বাঘা গোলকীপার। অনেকে অনেক বোঝালে ডড্‌স্‌কে। কিছুতেই সে জেদ ছাড়তে রাজী নয়। কি আর করা যাবে, হাতের কাছে পাওয়া গেল ভ্‌লাস্‌টোকে। গোলরক্ষায়

তার যোগ্যতা তেমনভাবে প্রমাণিত না হলেও, কাজ চালিয়ে দিতে পারবে এমন ভরসা করা গেল।

ক্যালকাটাই প্রথমে গোল দিলে। কিন্তু ড্যালহৌসীর প্রাইক যে শটে শোধ দিলে সে গোল, ডড্‌স্ থাকলে তা কোন মতেই গোলে ঢোকে না। আবার ক্যালকাটা এগিয়ে গেল, ড্যালহৌসী আবার ধরে ফেললে। এমনি ভাবে দূর থেকে উঁচু শটে বেঁটে ভ্‌লাস্‌টোকে কাবু করে একা প্রাইক-ই ৩-৩ করে দিলে। আর মাত্র মিনিট কয়েক বাকী। ক্যালকাটা প্রাণপণ চেষ্টা করছে, শেষ রক্ষা করতেই হবে।

অভিষেকের সমস্ত ব্যবস্থা যখন তৈরী এবং নগর উৎসবমুখর, তার মধ্যে রামচন্দ্রের বনবাসযাত্রার সংবাদ যেমন শেল হেনেছিল, তেমনি শেল এসে বিঁধলো ক্যালকাটার বুকে, যখন ডালহৌসীর সেই প্রাইকের আর একটা উঁচু শট ভ্‌লাস্‌টোর হাত ফস্‌কে ঢুকে গেল গোলে। আর তার আধ মিনিটের মধ্যেই বাজলো শেষের বাঁশি। ঠোঁটের ডগা থেকে পানপাত্র ছিট্‌কে পড়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল আচমকা।

ক্যালকাটা বেশীর ভাগ সময় খেলেছে প্রাণপণে, কিন্তু ফলাফলের উপর দেখা গেছে বৈরাগ্য। পরবর্ত্তী যুগে মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের উপর স্বাভাবিক বিদ্বেষে, তাদের এই ফলাফলে ঔদাসীন্যের ভাবকে শ্লেষ করে বাঙ্গালী দর্শকসাধারণ, মন্তব্য করেছে—শালারা হেরেছে তবু ফ্‌র্তি দেখনা।

সেই ক্যালকাটা ক্লাবে এবার রাম বনবাসে যাবার পর অযোধ্যার মত কালো ছায়া নেমে এল। মেম্বাররা নামছে বেরুচ্ছে নীরবে, ধীরপায়ে মাথা নীচু করে, যেন শবানুগমনে চলেছে। খেলোয়াড়দের চোখ মুখ ফেটে কান্না বেরুচ্ছে। শারন্যানের চোখের জল বাঁধ মানলো না। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল অনেক সাহেবের চোখে জল। শুনেছি অনেক বড়সাহেব তার পরের

সোমবারে পর্যন্ত বড়বাবুদের সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে কথা কইতে বলেছে— প্রভিডেন্স বাবু, য়্যাণ্ড দিস্ ইজ্ লাইফ। ফুটবলের পরাজয়ে দর্শন আউড়েছে কলকাতার বড় সাহেবরা বোধ হয় এই একবার।

কিন্তু ডড্‌স্‌কে কেউ তিরস্কার করলেনা, কোন অভিশাপ দিলেনা. পরদিন হেসে উইশ্‌ও করলে। তার দোষ কি? সবইতো প্রভিডেন্স। বৃটিশ অভিজাতদের ঘাঁটিতে অ-পেশাদার খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত যে টিম-ওয়ার্কে চিড় ধরা ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে—যা আর কখনো ঘটেনি ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের দীর্ঘ ইতিহাসে, তা প্রভিডেন্স নয়তো কি?

তার পরের বছরই আবার শীল্ড পেলে ক্যালকাটা, শারম্যানেরই অধিনায়কতায়। কিন্তু দুঃখ তাতে ঘোচে? মন্দভাগ্য ড্যালহৌসির আকার ধরে এমন আশা-কুসুমকে ঝরিয়ে দিয়ে গেল। এরই তিন বছরের মধ্যে চোখের সামনে দেখতে হল ক্যালকাটাকে নিজের মাঠে বসে, পরপর তিন বছর শীল্ডজয়ের গৌরব-রূপিনী আমার বঁধুয়া আমারি আঙ্গিনা দিয়া অন্য বাড়ি চলে গেল, স্কটি হাইল্যাণ্ডার্স গর্ডন্‌সের ঘরে।

ক্যালকাটার প্রতি সহানুভূতিতেই বুঝিবা শ্বেতপ্রাধান্যের বিধাতাপুরুষ ড্যালহৌসীর প্রতি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। নইলে এর পর আর কোনদিন ড্যালহৌসী শীল্ড জিততে পারলেনা কেন? এরপর দু'বার ফাইন্যালে উঠেছিল ড্যালহৌসী। ১৯২২ সালে ক্যালকাটার কাছে ওরা হারে এক গোলে। আর ১৯২৪ সালে দুগোলে জিতে শেরউড ফরেস্টার্স গর্ডনসের কীর্তির পুনরাবৃত্তি করে।

১৯২২ সালের ক্যালকাটা-ড্যালহৌসী ফাইনাল ক্যালকাটার স্পোর্টসম্যানশীপের এক মহান নিদর্শন হয়ে আছে।

খেলা চলেছে যেন বাঘ-সিংহের যুদ্ধ। কোনপক্ষ এতটুকু সুযোগ দেয়না যে অপর পক্ষ তাদের কোনঠাসা করবে। এমনি করেই খেলা প্রায় শেষ হয়ে

এল, দশমিনিটও বাকী নেই। এমন সময় ক্যালকাটার লেফ্‌ট্‌-ইন্‌ ফেন-কে ড্যালহৌসীর ব্যাক ডানকান গোল করার মুখে এক বেয়াড়া ধাক্কা মারলে, আর সঙ্গে সঙ্গে রেফারি দিলে পেনাল্টি। ড্যালহৌসী বুঝলে চরম দণ্ড হয়ে গেল, কারণ গোল শোধের চেষ্টা করবে এমন সময়টুকুও বাকী নেই। ক্যালকাটার পক্ষে এই সুযোগ হারালে সেদিনের মত খেলা জেতার সম্ভাবনা নেই।

গোলের সামনে বল বসানো হয়েছে। অব্যর্থ শটের সেরা ওস্তাদ নাইট তৈরী হচ্ছে শট্‌ মারতে। ক্যালকাটার ক্যাপ্টেন-পিটার কলভিন নাইটকে ডাকলে হাতছানি দিয়ে, কি যেন বললে ফিসফিস করে। ছুটে এসে শট মারলে নাইট। বল চলে গেল অনেক দূরে, প্রায় কোণের ফ্ল্যাগের কাছে। চোখ বুজে বা ঘুমের ঘোরে শট মারলেও নাইটের পা থেকে অমন বেয়াড়া শট বেরোয় না, তা সবাই জানে। শুধু জানার কথাই নয়। নাইটের মারার ভঙ্গিতে স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেল যে, বে-দিকে ঠেলে দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই সে কীক করেছে। নাইবা নিল ক্যালকাটা পেনাল্টির সুযোগ ; খেলা শেষের আগেই যেন গোল করে জেতালে ক্যালকাটাকে।

কিন্তু যে যুগে ড্যালহৌসী শীল্ডে বারে বারে ক্যালকাটাকে যুদ্ধং দেহি বলছে, লীগে কিন্তু তারা তখন মাঝামাঝির বেশী উঠতে পারে নি। ১৯০৯ সালে ড্যালহৌসী প্রথম রাণার্স-আপ হয় তবে ১২টা খেলায় মোট ১৫ পয়েণ্ট করে, চ্যাম্পিয়ান গর্ডন্‌স্‌ থেকে পাঁচ পয়েণ্ট পিছনে। পরের বছর কাস্টম্‌সের সঙ্গে সমান পয়েণ্ট পেয়ে গোলের হিসেবের জোরে প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ান হয় ড্যালহৌসী।

ব্যস ওই পর্যন্ত। ১৯১৫ সালে রেঞ্জার্স যখন সাত পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যায়, ড্যালহৌসী সেবার পেয়েছিল আট পয়েণ্ট। অবশ্য ছ' পয়েণ্ট পেলেও নামতে হত না। সত্যিকার নামকরা বড় টিমের উপর

নেমে যাওয়ার নিয়ম কোন দিনই কড়াকড়ি ভাবে খাটান হয় নি। সে দিন তো ড্যালহৌসীর বেলায় কোন প্রশ্নই উঠতো না।

লীগে ড্যালহৌসীর গৌরবের যুগ ছিল তৃতীয় দশকে। ১৯২১, ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সালে ওরা চ্যাম্পিয়ান হয়। আর ১৯২৪ সালে গোলের হিসেবে তৃতীয় স্থান পেলেও, চ্যাম্পিয়ান ক্যামেরান হাইল্যাণ্ডার্স ও দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী সাউথ ওয়েল্স বর্ডারার্সের সঙ্গে সমান পয়েণ্ট ছিল ওদের। তাছাড়া সেবার দুটো খেলাতেই ক্যামেরন্স্কে হারিয়েছিল ওরা।

এ যুগে ড্যালহৌসীর সব চেয়ে বড় গৌরব শুকনো মাঠে মোহনবাগানকে পাঁচ গোলে হারানো। মোহনবাগান সেবার লীগে কড়া টিম। রাণার্স-আপ ডি. সি. এল আই'র সঙ্গে সমান পয়েণ্ট। হলে কি হয়, সে দিন কলকাতার সবচেয়ে ভালো লেফট-হাফ সুধাংশু বসু এমন খারাপ খেললে, যা কল্পনায়ও ভাবা যায়নি। জীবনে বোধ হয় এই একদিনই তার অমন ব্যর্থতা দেখা গেছে। ড্যালহৌসীর সেবারের নতুন রাইট-আউট ব্রাউটন, হাফ-ব্যাক ব্রাউটনের ভাই, সুধাংশুকে নাচিয়ে ছেড়ে দিলে। ব্রাউটন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বল নিয়ে ছোটে, সুধাংশু পিছতে থাকে। তার পর হয় ব্রাউটন উঁচু সেণ্টার ফেলে ঠিক গোলের মুখে, নয় নিজেই কেটে ঢুকে যায় ভিতরে। ব্রাউটন নিজে মাত্র দুটো গোল দিয়েছিল, কিন্তু বাকী কটা ওরই সেণ্টার থেকে। পনের-আনা কৃতিত্ব ওর। দুপক্ষে মাত্র দুটো লোকের খেলার উপর এতবড় ফলাফলটা ঘটেছিল সেদিন। শুকনো মাঠে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এইটেই মোহনবাগানের ইতিহাসে সবচেয়ে শোচনীয় পরাজয়।

ড্যালহৌসীর নামকরা খেলোয়াড়দের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বি. আর. লিণ্ডসে-র কথা ওঠে। অমন কামানের গোলার মত শট আর কোন সেণ্টার-ফরোয়ার্ড কলকাতার মাঠে কখনো মেরেছে কিনা সন্দেহ। এই শতাব্দীর প্রথম দশকে ড্যালহৌসীর দাপটের মূলেই ছিল লিণ্ডসে।

তারও আগে গত শতাব্দীতে ড্যালহৌসীর সেরা খেলোয়াড় ছিল গোল-কীপার ব্রাউন। ১৮৯৭ সালে ড্যালহৌসী যেবার প্রথম শীল্ড পায়, সেবার ব্রাউনের গোলে বলই ঢোকেনি। পরবর্ত্তী যুগে তৃতীয় দশকে নর্থ স্টাফোর্ডের ডেভিস ড্যালহৌসীর গোলে খেলে খুব নাম করেছিল। তবে তার খেলায় ব্রাউনের দৃঢ়তা ছিলনা, চটকদারী কায়দা ছিল খুব। মাথা খাটিয়ে খেলতে ও ছুটে বেরিয়ে পা থেকে বল কেড়ে নিতে ডেভিস ছিল ওস্তাদ।

সাদারল্যাণ্ড ও কোয়েল দ্বিতীয় দশকে ব্যাক হিসেবে সবার প্রভূত প্রশংসা পেয়েছে। কোয়েল পরে চলে গেছে ক্যালকাটায়। তার জায়গা নিয়েছে হাইল্যাণ্ড। এই হাইল্যাণ্ড-ডানকান জুড়িকেই ওদের দলের শ্রেষ্ঠ ব্যাক বলা চলে। ডানকানের গোঁ ছিল অসাধারণ। জোঁকের মত লেগে থেকে গোঁত্তা ও ধাক্কা মেরে বল বের করে দেবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল তার। পরে ডানকানের সঙ্গে খেলেছে মিড্‌লসেক্সের ম্যাগননি। যেমন দৈত্যের মত চেহারা, তেমনি গাজোয়ারি খেলা।

কিন্তু ড্যালহৌসী দলের যার খেলা আজও ছবির মত লোকের চোখে ভেসে ওঠে, সে হল ডেভিড্‌সন। দ্বিতীয় শতকে রব ও মাণ্ডের সঙ্গে লেফট-হাফ খেলতে সুরু করে। তারপর মাণ্ডে চলে যেতেই সেণ্টার-হাফের দায়িত্ব তুলে নেয়। সে যুগে সেণ্টার-হাফের খেলাই ছিল সবচেয়ে কঠিন ও পরিশ্রমের। একাধারে ব্যাকের সহযোগী ও আক্রমণ-বিভাগে ফরোয়ার্ডদের সমযোদ্ধা। এইভাবে সারামাঠ চষে বেড়ানো যে সেণ্টার-হাফের কাজ, তাকে আজকের পরিভাষায় বলা হয় রোভিং বা ভ্রাম্যমাণ সেণ্টার-হাফ। এই রোভিং সেণ্টার-হাফ হিসেবে কলকাতা ফুটবলের ইতিহাসে ডেভিড্‌সনকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। ড্যালহৌসী দলে যে ধাক্কা-মারা মারকুটো খেলার রেওয়াজ ছিল, ডেভিড্‌সনের মধ্যে কোন দিন তা দেখা যায়নি। ধীর মস্তিষ্কে রেসের ঘোড়ার মত অফুরন্ত দম নিয়ে, দুপা ও মাথা সমান চালিয়ে খেলেছে। মাথার পিছনে

টিকির মত একগোছা চুল দুলছে তালে তালে। ইণ্ডিয়ান-ইয়োরোপীয়ান্স খেলায় ও-পক্ষের বাঁধা সেণ্টার-হাফ ডেভিড্সনের অনবদ্য খেলায় ভারতীয়-দলের অসুবিধা কম হয়নি। তবু সব দর্শক শত্রু পক্ষের এই বিচক্ষণ সেনানীর খেলা প্রসন্ন মনে তারিফ করতো। ১৯২৭—৩৪ পর্যন্তই ছিল ড্যালহৌসীর সবচেয়ে সুদিন, আর সেই সুদিনের প্রধান ত্রাতা ছিল ডেভিডসন।

যদিও লিণ্ডসের পর ১৯০৫-এর সেণ্টার-ফরোয়ার্ড প্রাইক-ই ছিল ড্যালাহৌসীর সবচেয়ে কৃতী খেলোয়াড়। কিন্তু ডেভিডসনের যুগে ওদের যে ফরোয়ার্ড-পঞ্চক ছিল, তার জুড়ি আর কখনো দেখা যায়নি ওদের দলে। ব্রাউটন ও বেল দুদিকের দুই আউট, আর হাউই এবং হেগি দুই ইনসাইড ফরোয়ার্ড। এরা প্রত্যেকেই কুশলী, যেমন ফাস্ট তেমনি শুটিং ও হেডিং, এবং পরস্পরের সমঝোতা।

ড্যালহৌসী চিরদিন মারকুটো টিম। আর সেই মারকুট দলেও রাম-মারকুট ছিল তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি স্যাভেজ ও ওয়েরার, দুই সেণ্টার-ফরোয়ার্ড। সাভেজ একদিন নিরর্থক স্যাভেজগিরি করে ক্যামেরন্‌সের দু'জন খাসা খেলোয়াড়ের খেলা চিরতরে ঘুচিয়ে দিয়েছিল।

কলকাতা ফুটবলে যে-কোন বাঙালী দলই আমাদের স্বজাতি প্রীতির প্রেরণা হয়ে উঠেছিল। একেবারে ফুটবলের প্রথম যুগে কিন্তু তা ততটা দেখা যায়নি। ড্যালহৌসীর মারকুটো স্বভাবের ফলেই সেই রক্তবীজ প্রথম আবির্ভূত হয়।

সে বোধ হয় ১৯০৪ সালের কথা। মোহনবাগানের সঙ্গে ড্যালহৌসীর খেলা, ওদেরি মাঠে। বিজয় ভাদুড়ী শুয়ে পড়ে একটা বল শুট করবার সময় ছোট একটা কাঁচি চালিয়ে দিলে ড্যালহৌসীর সেণ্টার-হাফ স্টিউয়ার্টকে। একে ত ফুটবল এমনিতে মাথা গরম-করানো খেলা, তার উপর সাহেবদের

সঙ্গে বাবুদের খেলবার অধিকার দেওয়া হয়েছে বলেই কি তারা কাঁচি মারবে সাহেবকে! উঠেই সাহেব বিজয় ভাদুড়ীর গলা টিপে ধরলো। আর যায় কোথায়! দলে দলে দর্শক ছাতা লাঠি নিয়ে ঢুকে পড়লো মাঠে, জুতো ও ইঁট-পাথর পড়তে লাগলো। এলো পুলিশ, পায়ে হেঁটে ও ঘোড়ায় চড়ে। জনতা ছত্রখান হল, খেলা আর শুরু হল না, কিছু দর্শক গ্রেপ্তারও হল। বাঙলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী স্ট্রেটফিল্ড এই খেলায় দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে পুলিশ এবং আই. এফ. এ-কে জানালেন যে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তিনি ড্যালহৌসীকে পুরোপুরি দোষী মনে করেন। খেলা যে অবস্থায় ভেঙেছিল, সে সময় মোহনবাগান এগিয়ে ছিল। আই. এফ. এ-র হুকুমে ওই ফলাফলই বহাল রইল। মোহনবাগানের সে যুগের খেলোয়াড় হাবুল সরকার আমায় কবুল করেছেন যে এই ভাবে বিজয় বাবুকে মাঠে সাহেবের হাতে অকারণে লাঞ্ছিত হতে দেখেই খেলোয়াড়দের মনে জেগেছিল এক নতুন ভাব—তারা জাতীয় মর্যাদার প্রতীক। এবং স্বজাতির আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার ব্যাপক সংগ্রামে তারাও সৈনিক।

লীগ-চ্যাম্পিয়ানশিপ তালিকায় বছরের পর বছর ড্যালহৌসীর স্থান যেখানেই থাক না কেন, খেলার সাধারণ উৎকর্ষের জোরে ওরা কলকাতা ফুটবলে বরাবরই বিশেষ সম্মান পেয়ে এসেছে।

১৯৩৪ সালে মহামেডান স্পোর্টিং যেবার সর্ব্বপ্রথম চ্যাম্পিয়ান হয় সেবার রাণার্স-আপ হয়ে ড্যালহৌসী লীগ ফুটবলে কলকাতার সাহেবী ফুটবলের শেষ রশ্মি বিকীরণ করে। কিন্তু মাত্র তিন বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে নেমে যায় লীগ তালিকার শেষ ধাপে, ১৯৩৭ সালে। এক কালের দিনশৌর যে কতখানি ফসিলে পরিণত হয়েছে, তার প্রমাণ ওদের সেবারের দুরবস্থা। ২২টা খেলার একটাও জিততে পারেনি, পাঁচটা খেলায় ড্র করে কোন মতে পাঁচটা পয়েন্ট করেছিল। ৪১টা গোল খেয়ে দিয়েছিল মাত্র ১২টা।

অবনতি যে কতখানি, তার আরও প্রমাণ যে লীগ তালিকায় ঠিক ওদের উপরে থেকেও এরিয়ান্স ১৪ পয়েণ্ট পেয়েছিল।

আজ আর ড্যালহৌসী ইয়োরোপীয়ান ক্লাব নেই, আংলো-ইণ্ডিয়ানদের সামাজিক মজলিশে পরিণত হয়েছে। সবদেশেই সংখ্যালঘুদের জীবন ক্লাব-সর্ব্বস্ব, কারণ প্রতিবেশীকে তারা আপনার বলতে পারেনা। সর্বত্রই অনাত্মীয়ের পরিবেশ। তাই স্বসমাজের লোকদের মিলিত হবার একটা ঘাঁটী তৈরী করে সেখানে এসে সামাজিকতার স্বাভাবিক কামনাটুকু মেটায়, স্বস্তি বোধ করে। পশ্চিমে কালীবাড়ীই বাঙালীর ক্লাব। আর আই. সি. এস. ব্যারিস্টার বা অতি বড়লোক যারা, স্বদেশে থেকেও সামাজিক শ্রেণী-বিভাগের কড়াকড়িতে বিশ্বাস করে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে, তাদের জীবনও ক্লাব-সর্বস্ব হয়ে ওঠে। ড্যালহৌসী ক্লাব অবশ্য ঐতিহ্যের মর্যাদা রক্ষা করে ফুটবল ক্রিকেট হকি সবই অল্পসল্প খেলে থাকে। তবে তার চেয়ে বেশী খেলে টেনিস এবং বাউল্‌স্। আর তারও চেয়ে বেশী খেলে হুইস্ট বা মজলিশী তাসের খেলা। সব চেয়ে বেশী করে পান ও গুলতান।

ময়দানের দু্নম্বর মাঠ হিসেবে ড্যালহৌসী মাঠের যে ইজ্জত ছিল, তাও মহামেডান স্পোর্টিং-এর নিজস্ব ঘেরা মাঠ হতেই ইতি হয়েছে। অনেকদিন পর্যন্ত একপাশে খানকতক বেঞ্চ পূর্বগৌরবের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে পড়েছিল, শূন্য প্রান্তরে দেওয়াল মাত্র অবশেষ প্রাচীন প্রাসাদের মত। ধীরে ধীরে কমতে কমতে তাও লোপ পেয়ে গেল একদিন।

মাঠের গৌরব ক্লাবের গৌরবের চেয়ে কম ছিল না। আগে মাঠটা অবশ্য ড্যালহৌসীরই নিজস্ব ছিল। রেঞ্জার্সের মাঠ ছিল এ-মাঠের একেবারে সংলগ্ন দক্ষিণ অংশে, বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় মাঠ ও ড্যালহৌসী-রেঞ্জার্স মাঠের মাঝখানে। পরে রেঞ্জার্স ও ড্যালহৌসী মাঠের ভাগীদার হল দ্বিতীয় দশকে। প্রথম ট্রেড্‌স্ কাপ এবং প্রথম আই.এফ. এ. শীল্ড ফাইনাল ড্যালহৌসী মাঠেই

হয়েছিল। তার পরের যুগেরও অনেক বড় বড় খেলার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার নীরব সাক্ষী হয়ে পড়ে আছে আজ ধূধূ ময়দানের টুকরোটুকু।

মোহনবাগান, উয়াড়ী, এরিয়ান্স. ইস্টবেঙ্গল, এমন কি পল্টনী দল গুলিকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ খেলা ওখানেই খেলতে হয়েছে। ক্যালকাটা মাঠের বনেদীআনা জেতা যখন তখন নষ্ট করা যেতনা।

ব্রজে যেমন পুরুষ ছিলেন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ, সেযুগে কলকাতার ইয়োরো-পীয়ান ফুটবলে একমাত্র দল ছিল ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব। আর আর যারা ছিল, তারা সবাই শ্রীদাম সুদামের দলে।

ক্যালকাটা আদিতে ছিল রাগবি খেলার ক্লাব। ১৮৯৪ সাল থেকে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব অ্যাশোসিয়েশন ফুটবলে অর্থাৎ আমরা যাকে ফুটবল বলি তাতে, পুরোপুরিভাবে মন দেয়।

লীগ শীল্ডের হিসাবে ক্যালকাটার কীর্তি অতুলনীয়। কিন্তু তার চেয়ে গৌরবময় তাদের ক্লাবের সাংগঠনিক সংহতি, তাদের খেলোয়াড়ী মনোভাবে প্রকৃত উদারতা। কখনো সখনো দুচারজন দুর্জন কর্মকর্তা বা খেলোয়াড় ক্লাবে দেখা যায়নি তা নয়, দুচারজন দুর্জন সদস্যেরও পরিচয় পাওয়া গেছে। কিন্তু মোটের উপর ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব, ফুটবল খেলার নীতিও আদর্শকে বরাবর বহাল রেখেছে। একে বড় সাহেবদের দল, তাতে মোহনবাগানের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী। বাঙালী তথা ভারতীয় দর্শকের পক্ষে তাদের ভালো-বাসা সম্ভব হয়নি। তাদের ক্রিয়া-কলাপকে আমরা জাতিগত ও রাজনৈতিক বৈরিতার রঙে রাঙিয়ে দেখতে পারিনি। কিন্তু ফুটবলকে যাঁরা ভালো-বেসেছেন, তাঁরা ক্যালকাটাকে ভালো না বেসে পারেন নি। অতীত ইতিহাস আলোচনা করতে বসলে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী এবং অতি মোহনবাগান-ভক্তকেও বলতে হবে—হ্যাঁ ক্যালকাটা ওয়াজ এ গ্রেট ক্লাব, তুলনাবিহীন।



উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার লীগ-শীল্ডের যুগ্মমুকুট বিজয়ী ক্যালকাটা (১৯২৩)
উপরের সারি— কলভিন, হিল্টন, হসাক, হোযারিয়ার, হ্যামিল্টন, ক্যাঃ মায়ার, প্লুমার ও ক্লেটন (রেফারী)।
নীচের সারি—প্যাটার্সন, বেনেট (অধিনায়ক , চিজহোম, স্যর ক্লড ইজমে (সভাপতি), প্যাজেট ও উইলিয়ামসন
গোলকীপার ব্রুকস্ অনুপস্থিত।



শ্রেষ্ঠ বাঙালী খেলোয়াড় সমন্বয়

আন্তর্জাতিক খেলায় বিজয়ী ভারতীয় দল (১৯২৬)।

উপরের সারি পি. কে মুখার্জী, জি. এম. ওয়েব, ননী গোসাই, পূর্ণ দাস, সামাদ ও বেনেট।

নিচের সারি সোনা মল্লিক, মোনা দত্ত, গোষ্ঠ পাল, কুমার ও দীনেশ গুহ।

সর্বনিম্নে—বাগা সোম, রবি গাঙ্গুলী, সুধাংশু বসু ও পঙ্কজ গুপ্ত। (গোষ্ঠ পালের সৌজন্যে)

১৮৯৬ সালে বে-সামরিক দল হিসেবে ক্যালকাটা-ই প্রথম শীল্ড জেতে এবং লীগের দ্বিতীয় বছরে ১৮৯৯ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়। সেই থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ক্যালকাটা আগাগোড়াই গৌরবের উত্তুঙ্গ শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল। এর মধ্যে তারা শীল্ড ফাইনালে উঠেছে পনের বার, আর বিজয়ী হয়েছে ন'বার। তারও পরে ১৯২৭ সালে আবার ওরা রাণার্স-আপ হয়। ১৯০৩-৭ পর্যন্ত পর পর পাঁচবার শীল্ড ফাইনালে উঠে তারা যে রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তা আজও অটুট। ১৯২২-২৪ সালে পর পর তিনবার শীল্ড নিয়েছে এবং ১৯২২ ও ১৯২৩ সালে লীগ-শীল্ডের জোড়া-মুকুটও তুলেছে মাথায়।

ইয়োরোপীয়ান যুগের অবসানে ১৯৩৬ সালে একেবারে ভাঙা দল নিয়ে শেষবারের মত শীল্ড ফাইনালে উঠেছিল ক্যালকাটা, শুধু তাদের লাল-সাদা জামার ঐতিহ্যের প্রেরণায়। একমাত্র গোলকীপার আর্মস্ট্রং দুদিন ড্র করিয়েছিল সে খেলা। তারপর তৃতীয় দিনে ২-১ গোলে মহামেডান স্পোর্টিং-এর কাছে হেরে যায়। গোলকীপারের একক বীরত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে সেই স্মরণীয় ম্যাচ।

ক্যালকাটা লীগ পেয়েছে মোট আট বার। আর দশ বার রাণার্স-আপ হয়েছে। শেষ লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৯২৫ সালে। ১৯৩১ সালে ডারহাম্সের সঙ্গে শেষবার দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে।

লীগে ও শীল্ডে চূড়ান্ত বিজয়ের কথা ছেড়ে দিলেও, ক্যালকাটা বাঘা বাঘা মিলিটারী দলকে হারিয়েছে। যখন হেরেছে, তখনও বিরাট মহীরূহের মত দিগন্ত আলোড়িত করে পড়েছে। ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে এইচ. এল. আই-র সঙ্গে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তীব্রতার সীমা ছিল না। প্রথম বছর এইচ. এল. আই. লীগ চ্যাম্পিয়ান; মাত্র এক পয়েণ্ট পিছনে থেকে ক্যালকাটা হল রাণার্স-আপ। শীল্ড ফাইনালেও এরাই হল মুখোমুখী, ক্যালকাটা জিতলে

এক গোলে। পরের বছর ঠিক বিপরীত। লীগে সেই এক পয়েন্ট পিছিয়ে রইল এইচ. এল. আই ; শীল্ড-ফাইনালে ক্যালকাটাকে হারালে এক গোলে।

এই দুবছর ছাড়াও বহুবার ক্যালকাটা লীগ-শীল্ডের জোড়া মুকুট পেতে পেতে, তা হাতছাড়া হয়ে গেছে। প্রথম দশকেই পাঁচবার। আবার ১৯১৬ সালে, যখন শীল্ড-ফাইনালে ২-১ গোলে হেরে গেল ওরা নর্থস্টাফোর্ডসের কাছে। সেই সম্মান মরীচিকার মত মিলিয়ে যাবার পরম আশঙ্কা সত্ত্বেও ১৯২২-এর শীল্ড-ফাইনালের শেষ সময়ে ড্যালহৌসীর বিরুদ্ধে পেনাল্টির সুযোগ দূর করে ছুড়ে ফেলেছিল ক্যালকাটা।

ক্যালকাটার উদার স্পোর্টস্‌ম্যানশিপ শুধু স্বজাতি ড্যালহৌসীর বিরুদ্ধেই প্রকাশ পায়নি। মোহনবাগানের প্রতিও অনুরূপ আদর্শ দেখিয়েছে তারা।

১৯০৬ সালে ভারতে নার্স ব্যবস্থা প্রসারের জন্য তখনকার বড়লাট-পত্নী লেডী মিণ্টোর নামে যে ভাণ্ডার খোলা হয়েছিল, তার সাহায্যে শীতকালে এক ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয় কলকাতায়। সেবারকার ট্রেডস্‌ কাপ বিজয়ী হিসেবে ভারতীয় দল একমাত্র মোহনবাগান তাতে যোগদানে আমন্ত্রিত হয়। শীল্ড-বিজয়ী ক্যালকাটার সঙ্গে খেলায় মোহনবাগান এক গোলে জয়লাভ করে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে। কিন্তু মিণ্টো ফিটের সম্পাদক মোহনবাগানের সেই খেলায় হাফব্যাক প্রফুল্ল বিশ্বাসকে তলব করে জানতে চান যে তিনি মোহনবাগানের সদস্য কিনা এবং প্রতিযোগিতার নিয়ম মত এর আগে অন্তত দুটি ম্যাচে মোহনবাগানের পক্ষে খেলেছেন কিনা। মিশনারী অভিভাবকত্বে মানুষ প্রফুল্ল বাবু সহজ সত্য কথা বলেন। তিনি গত মরশুমে ন্যাশনালে খেলেছেন। এবং সেই দলেরই নিয়মিত খেলোয়াড় ও সদস্য। মোহনবাগানের তিনি সদস্য নন এবং আগে কখনও খেলেননি তাদের হয়ে। বে-মরশুমে আই. এফ. এ-র প্রতিযোগিতার বাইরে মোহনবাগানের হয়ে খেলা

বে-আইনি হবেনা এই সরল বিশ্বাসে প্রতিযোগিতার নিয়ম না জেনে বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে মোহনবাগানের পক্ষে খেলেছিলেন। সাহেব কড়া লোক, সঙ্গে সঙ্গে মোহনবাগানকে স্ক্র্যাচ করে ক্যালকাটাকে তুলে দেওয়া হল পরের রাউণ্ডে। খবর পেয়ে ক্যালকাটা পরিচালক সমিতিকে জানালে, নিয়ম মত এগার জন খেলোয়াড় নিয়ে খেলেই মোহনবাগান তাদের যোগ্যতার জোরে জয়ী হয়েছে, বার জন নিয়ে খেলেনি তারা। আইনের ফাঁক দিয়ে যদি মোহনবাগানের প্রাপ্য বিজয়ীর মর্যাদা কেড়ে নেওয়া হয়, ক্যালকাটা তা কখনই স্বীকার করবে না। করলেও না। পরবর্ত্তী রাউণ্ডে খেলবার অধিকার প্রত্যাখ্যান করলে।

মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ওদের চূড়ান্ত রোখ ছিল একথা সত্য। খেলা জিতেই অনেকে কেবল্ পাঠাত হোমে। কিন্তু সে রোখ ছিল প্রবলের প্রতি প্রবলের ক্ষাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মোহনবাগানকে হারানোকেই ওরা নিজেদের শক্তির চরম পরীক্ষা মনে করতো।

১৯২৫ সালে ভারত জোড়া অপরাজেয় খ্যাতি নিয়ে ডারহাম্স্ যখন প্রথম শীল্ড খেলতে এল, তখন এক জোড়াতালি দল নিয়ে যে ভাবে ২-২ গোলে ড্র করে দিলে ক্যালকাটা, তা ভোলার নয়। ক্যালকাটা-ই আধিপত্য করলে সে খেলায়। পরের দিন অবশ্য দুগোলে হেরে গেল।

বড় সাহেবদের ক্লাব ক্যালকাটায় একই খেলোয়াড় দল বেশীদিন অংশ গ্রহণ করেনি। মধ্য-প্রাচ্যে ও দূর-প্রাচ্যে কোম্পানীর শাখায় হামেশা বদলি হওয়া ও ছুটিতে বাড়ী যাওয়া লেগেই আছে সাহেবদের। প্রায় বছরেই অর্দ্ধেকের উপর খেলোয়াড় পাল্টে যাচ্ছে। কিন্তু দলগত শক্তি তাতে ব্যাহত হয়েছে কদাচিত।

ক্যালকাটার পক্ষে যারা কলকাতার ফুটবল-আকাশ আলো করেছে,

তাদের সংখ্যা অগুণতি। চিজহোম্. ফাইফ, ইজমে, শারম্যান দুইভাই, ফেন, হোসী, নাইট, কলভিন, বেনেট, এরা এক এক মার্তণ্ড।

বিগত শতকের খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রধান ছিল গোলকীপার বক্স্ওয়েল। ১৮৯৬ সালের শীল্ড-ফাইনালে শ্রফশায়ার দুর্দান্তভাবে অধিকাংশক্ষণ আক্রমণ চালিয়েও যে এক গোলে হেরে গেল, তা বক্স্ওয়েলেরই জন্য। প্রথম বারের লীগ-বিজয়ে বক্স্ওয়েলের দান ছিল অসামান্য। এর পরেই গোলে এলো বাকলে। ১৯০৩ সালের শীল্ড-ফাইনালে তিন দিন কে. ও. এস. বি. বাকলেকে ভেদ করার প্রাণপণ চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করেছিল। বাকলের পরে আসে ডড্স্, শালপ্রাংশু মহাভুজ। কি মাটি-কাটা শট কি উপরের শট—কোন কিছুতেই বিচলিত হতনা সে। ১৯১৪ সালে এল অ্যান্স্টিস্, আগের বছর তাকে দুখীরাম স্যর এরিয়ানে খেলিয়েছিলেন। খেলতে সুরু করেই একটু কেমন নার্ভাস বোধ করতো কিছুক্ষণ, তারপর আত্ম- বিশ্বাসে ভরপুর হয়ে পড়তো অ্যান্স্টিস্। ১৯২২ সালে অ্যান্স্টিস্ শেষবার খেলে। পরের বছর আসে ব্রুক। তার সাহস ও তেজ এতো যে গোল-লাইন থেকে এগিয়েই থাকতো সব সময়, ব্যাকের মত শট করে বল বার করে দিত প্রয়োজন বোধে। শেষ যুগের গোলকীপারদের মধ্যে আর্মস্ট্রং অতুলনীয়। ও যখন এসেছে তখন ক্যালকাটার ভাঙ্গা আসর, সে আসরেও সে ভৈরবী বাজিয়ে ছেড়েছিল। বলটা নিয়ে শেষ পর্যন্ত কি করবে, সে সম্পর্কে ফরোয়ার্ড মনস্থির করার আগেই সে আক্রমণ ব্যাহত করতো আর্মস্ট্রং, নিজে আক্রমণ করে।

ক্যালকাটার ব্যাক-জুড়ি বরাবরই চমৎকার। হাণ্টার-হ্যারিসের পরে ওয়াটসন-উইক্কওয়ার্থ ছিল গত শতাব্দীতে। তারপর তেমন জুড়ি অনেকদিন না থাকলেও টড এবং ভিভিয়ান কুপার ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে চমৎকৃত করেছে সকলকে। দ্বিতীয় দশকে আসে লী, ক্রিকেটে ব্যাটে-বলে সমান দক্ষতার জন্য

যে ১৯২৬ সালে এম. সি. সি-র বিরুদ্ধে সর্ব্বভারতীয় দলে স্থান পেয়েছিল। কিছুদিন লী-ডেভি জুড়ি আবার ক্যালকাটার ব্যাক-জুড়ির ঐতিহ্য জাগিয়ে তোলে। এরপর লেফট-হাফ কলভিন ও ড্যালহৌসীর কোয়েলকে দিয়ে যে নতুন মিছিল সুরু হয়, তা আলোকমালার মত প্রদীপ্ত। কলভিনের সঙ্গে পরে খেলে বেনেট। ১৯২৬ সালে এম. সি. সি র বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ক্যাম্বেলও খেলেছিল কিছুদিন। এই ক্যাম্বেলের মত ক্রিকেট ফিল্ডিং কলকাতায় আর দেখা গেছে কিনা সন্দেহ।

অনেকের মতে কলভিন-ই কলকাতা ফুটবলের শ্রেষ্ঠ ব্যাক। দু পায়ের ফাঁক থেকে টুক করে বলটি কেড়ে নিতে তার মত ওস্তাদ আর নাকি হয়নি। অনেক কূটবুদ্ধি দিয়ে রক্ষণ ব্যূহ রচনা করতো কলভিন। আর বল যখন বার করে দিত, তা ঠিক নিজের দলের ফরোয়ার্ডকেই দিত। আশা ও বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি, স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতায় ভরপুর, অথচ অপরিমিত তেজ বীর্যের অধিকারী ছিল এই কলভিন। ফিরিঙ্গী বিয়ে করে সমাজে ভগ্ন হয়ে পরম দারিদ্র্যে দার্জিলিং-এ শেষ জীবন কাটাতে হয়েছে তাকে।

কলভিনের সেরা জুড়ি বেনেট। এই বেনেট-ই পরে আই. এফ. এ-র সেক্রেটারী হয়েছিল, রেফারিংও করেছিল। ১৯৩১ সালে যখন ইংল্যাণ্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন দুজন রেফারি নিয়ে ফুটবল খেলানর পরীক্ষা চালাচ্ছিল, সে পরীক্ষা কলকাতায়ও চালানো হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন সংগঠিত হবার আগে পর্যন্ত আই. এফ. এ. ইংল্যাণ্ডের এফ. এ-র সঙ্গে সংযুক্ত ছিল কি না। একবার বেনেট ও প্রফুল্ল মুখার্জীর জোড়া রেফারিং-এ সময় নিয়ে মতভেদ হওয়ার ফলেই কলকাতায় জোড়া রেফারিং পরিত্যক্ত হয়, মাত্র কয়েক মাস পরীক্ষার শেষে।

যাই হোক কলভিন ও গোষ্ঠ পালের-ই মত বলিষ্ঠকায় বেনেট। কিন্তু চিতার মত ক্ষিপ্র ছিল তার গতি ও দেহচালনা। আর শট ত কামানের

গোলা। বেনেটের ভঙ্গিগুলি ছিল দেখবার মত। বেনেটের আর একটা চালাকী ছিল, পিছন ফিরে রেফারিকে আড়াল করে বিপক্ষ ফরোয়ার্ডের জামা টেনে বলের সঙ্গে তার সংযোগ ছিন্ন করে দেওয়া। ১৯২৬ সালে মোহন-বাগানের যেবার সবচেয়ে জবর টিম, সেবারের প্রথম লীগ খেলায় এইভাবে ক্ষেত্র বোসকে সারাক্ষণ ঠেকিয়ে রাখলে বেনেট। বহুবার সময় মত জামা টেনে দিয়ে মনা দত্তর শট মারা সে ব্যর্থ করেছে। চকিতে টেনে ধরে চকিতে ছেড়ে দিয়ে ব্যালেন্স নষ্ট করে দেওয়ায় বেনেট ছিল অতুলনীয় ওস্তাদ। আর ফ্রী-কীক! কুমারটুলীর তুলসী দত্ত ছাড়া এ শিল্পে বেনেটের মত ওস্তাদ কেউ হয়নি। কত বাঘা বাঘা পল্টনী গোল-কীপার যে ব্যর্থ হয়েছে বেনেটের ফ্রী-কীকে, তার গোণাগুণতি নেই।

১৯২২ সালে বেনেট যখন দেশে, তখন কলভিনের সঙ্গে খেলে ক্যাম্বেল। এক গোরা দলের হয়ে প্রথম কলকাতায় খেলতে এসে থেকে যায় সাহেব। ধীর স্থির কূটকৌশলী ও বিচক্ষণ, যথাস্থান বেছে নিতে কখনও ভুল হত না ওর। ফুটবল হকী ও ক্রিকেটে অক্সফোর্ডের ব্লু পেয়েছিল এই চৌকষ স্পোর্টস্ম্যান ক্যাম্বেল।

হ্যাফব্যাকের কথা উঠতেই সেণ্টারহাফ চিজহোমের কথা বলতে হয় সবার আগে। একবার সেণ্টার-হাফে খেলেই সে সবচেয়ে বেশী গোল দিয়েছিল। ব্যাকে এবং সেণ্টার-ফরোয়ার্ডে সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছে চিজহোম। প্রথম দশকে ফাইফ ও পূলার, দ্বিতীয় দশকে চিজহোম ও ম্যাকেঞ্জি, আর তারপর টেলার (১৯২২) ও হোয়ারিয়র (১৯২৩) এই হল ক্যালকাটার কয়টি প্রধান সেণ্টার-হাফ। এর পরেই নাম করার মত গোল্ড ও নিকোলস। ১৯২২ সালে নিকোলস খেলে রাইট-ইন, ১৯২৪-এ লেফট-ইন, আর ১৯২৭-এ সেণ্টার-হাফ। সাইড-হাফে ক্যালকাটার সুদক্ষ খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রধান ছিল কলভিন ও ক্যাপ্টেন ড্যালজিল

(১৯২২)। ড্যালজিল প্রথম এসেছিল রয়েল স্কট ফুশিলিয়ার্সের সঙ্গে। গোরা খেলোয়াড় হয়েও ড্যালজিল ঠাণ্ডা মাথায় কৌশলী খেলা খেলতো।

ভি. শারম্যান আর পার্সী নাইট-ই ক্যালকাটা দলে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ফরোয়ার্ড। শারম্যানরা দুভাই, এইচ. শারম্যান ব্যাকে ও হাফ-ব্যাকে খেলেছে, ভি. শারমান ছিল লেফ্ট-ইন। যেমন ভিক্টরের কেটে বার হওয়ার পদ্ধতি, তেমনি অনবদ্য দেওয়া নেওয়া। আর তার পায়ে বল থাকলে ভয়ে কাঁপতো যে কোন গোলকীপার। লেফট-ইনে ফেন-ও ছিল অতুলনীয়। যত ভিড় থাক ঠিক ফাঁক করে বল পাস করবে। থ্রু-পাসের প্রবর্তক কলকাতায় ফেনকেই বলা চলে। অবশ্য কুমার তাকে নবরূপ দিয়েছিলেন। এমন ভাবে কোণা-কুণি ঠেলে সবার ভিড়ের মধ্যে বল দিয়ে দিত ফেন, যে ও দিকের ফরোয়ার্ড তৈরি থাকলে বল তৈরী পাবেই সে গোলের মুখে। তার পর গোল করা—সে ছোট ছেলেরও না পারার কথা নয়।

হোসীকে এ দেশে কে না চেনে? ভারতের ক্রিকেটে সে এক মহারথী। বোম্বাই-এর কোয়াড্রাঙ্গুলারে তার উচ্চতম রাণের রেকর্ড অনেক দিন কেউ ভাঙতে পারেনি। হকীতে বেটন কাপ যারা জিতিয়েছিল ক্যালকাটাকে, হোসী ছিল তাদের মধ্যে অগ্রণী। আর ফুটবলে রাইট-ইন হিসেবে হোসী ছিল যে কোন রক্ষণ-ব্যূহের বিভীষিকা। তার শট ছিল একেবারে মোক্ষম। হোসী বেঙ্গল লন টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গেল্‌সে রাণার্স-আপ হয়েছিল। এক কথায় হোসীর মত চৌকষ স্পোর্টসম্যান কলকাতায় দেখা যায়নি।

পার্সী নাইট, স্বল্পভাষী গম্ভীর। মাথাভর্তি টাক, ধুতি চাদর পরিয়ে দিলে গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলে ভুল হবার কথা। অনাথ বালক পার্সী যখন বিদেশী জাহাজ থেকে কলকাতা বন্দরে নামে, তখন দয়াপরবশ হয়ে এক সম্ভ্রান্ত ফিরিঙ্গী ভদ্রলোক তাকে পালন করেন। পরে নাইট গ্রামোফোন কোম্পানীতে উচ্চপদ পায়।

নাইট প্রথম বছর ড্যালহৌসীতে খেলেছিল, তারপর ক্যালকাটায় আসে। ক্লাবের হৈ-হল্লা সাতে পাঁচে তাকে দেখা যায়নি কখনো। পালক পিতার সঙ্গে কোচ অর্থাৎ বাড়ির ফিটনে করে ঠিক সময় মাঠে এসেছে, খেলার শেষেই চলে গেছে। নাইটের পায়ে বল পড়া মানেই বিপক্ষের হৃৎকম্প, গোল হবেই। সব সময়ই যে হয়েছে তা নয়, তবে যে কোন সময় হয়ে যেতে পারে। এতখানি মাথা খাটিয়ে পায়ের কায়দার সঙ্গে তার সামাঞ্জস্য করে, আর কেউ খেলেনি কোন দিন। আর কি রোখ! গোল দেবে তো দেবেই। ১৯২২ সালে শীল্ডের প্রথম রাউণ্ডে মোহনবাগানের সঙ্গে খেলায় কোন গোল হয়নি। মাত্র মিনিট পাঁচেক বাকী। এমন সময় হাফব্যাক জামাই-এর চেষ্টা সত্বেও নাইট বল পেয়ে গেল। মাথা নিচু করে এগোচ্ছে নাইট, অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র ছুটছে যেন। গোলকীপার সন্তোষ দত্ত বক্সিং-এ ওস্তাদ, এগিয়ে এসে মারলে এক ঘুষি নাইটের পেটে। নীল হয়ে পড়ে গেল নাইট। কিন্তু ঘটোৎকচ যেমন মরে পড়বার সময়ও শত্রুপক্ষ ধ্বংস করেছে, আহত হয়ে পড়ে যাবার সময়ও নাইট আসল কাজটি ভুললে না, শুয়ে পড়ে ঠেলে দিলে বলটা অরক্ষিত গোলে।

মোহনবাগানের সে যুগের রাইট-হাফ পি. রায়, যাকে লোকে বলতো জামাই, তার খ্যাতিই ছিল নাইটকে ঠেকানয়! তাকে আর কিছু করতে হত না, শুধু নাইট যাতে বল না পায়। জামাই যেমন নাইটকে ঠেকাতে ওস্তাদ ছিল, সামাদকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার ওস্তাদ ছিলেন স্পোর্টিং ইউনিয়নের বেচু দত্ত রায়। এমনি এক এক সাপের এক এক বিশেষ শিকড় থাকে। গ্যালব্রেথ কেঁচো হয়ে থাকতো কলভিনের কাছে।

কিন্তু নাইট-ও আমাদের আপনার লোক বনে যেত, যখন সিভিল বনাম মিলিটারী, কি লোকাল বনাম ভিজিটার্স-এর খেলায় কুমার-এর সঙ্গে দাঁড়াত সে। সে জুড়ি দর্শকদের পরমানন্দ, আর বিপক্ষের মৃত্যুভয় সৃষ্টি

করতো। দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত নাইট খেলেছে। তবে সন্তোষ দত্তের ঘুষি খাওয়ার পর তার তীক্ষ্ণতা অনেকটা কমে এসেছিল।

অন্যান্য চোখা চোখা আউট-সাইড ফরোয়ার্ডের যদি নাম করতে হয় তো প্রথম যুগের শ্লেটার, মধ্য যুগের স্টিউয়ার্ট ও টমাস। শেষের যুগে উইলসন এবং তারও পরে বেঁটে ব্যাঙ্কস্ কম জ্বালায়নি মোহনবাগানকে।

সেণ্টার-ফরোয়ার্ডে একেবারে প্রথমে ছিল কোলান। তারপর এই শতকের সুরুতে আসে ফাইফ, সেই থেকে এইচ. কুপার, সিনকাম, ক্যাপ্টেন হোয়াইট, রিউপার্ট ব্রুক, উইলিয়ামসন-এর অবিচ্ছিন্ন মিছিল। এক সঙ্গে হোসী, উইলিয়মসন ফেন ও নাইট দ্বিতীয় দশকের শেষে ক্যালকাটার আক্রমণ শক্তিকে দুর্দম করে তুলেছিল। রাইট-আউট উইলসন কবছর আগে এলে, এই ফরোয়ার্ড-পঞ্চককেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যেত।

ক্যালকাটার আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল ভদ্রজনোচিত খেলা। যে যুগে পায়ে শিনগার্ডের বর্ম এঁটে ভারী বুটের হাতিয়ার নিয়ে গায়ের জোরে অনেকখানি নির্ভর করাই ছিল বৃটিশ ফুটবলের প্রচলিত ও ঐতিহ্যগত পদ্ধতি, এবং কলকাতার আর সব ইয়োরোপীয়ান মার্কা দলই সম্পূর্ণভাবে সেই ঐতিহ্যই অনুসরণ করতো, সে যুগে ইংরেজ ভদ্রলোকের দল ক্যালকাটার খেলার পদ্ধতিতে একটা সংস্কৃতিসম্পন্ন বৃটিশ ভব্যতার ছাপ সুস্পষ্ট ছিল।

ফুটবলের নিজস্ব মাধুর্য এবং সৌন্দর্য যা কিছু, তার চরম বিকাশ দেখা গিয়েছিল ক্যালকাটার খেলায়। আজ শুধু সেদিনের স্মৃতি বহন করে আছে ক্যালকাটার মাঠ, নানা রঙের রামধনু আঁকা ফুলবাগিচা, আর মসৃণ চিকণ মখমলের মত সবুজ বিছানা। সে কালে ক্যালকাটার খেলাও ছিল অমনি, যেমন বর্ণাঢ্য, তেমনি মসৃণ চিকণ, নয়নমনোমোহন দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল।

ভারত স্বাধীন হবার পরবর্তী কালে ধীরে ধীরে ক্যালকাটা, ড্যালহৌসী,

কাস্টম্‌স্‌ ও রেঞ্জার্স দ্বিতীয় বিভাগে নেমে গেছে, অবশ্য কাস্টম্‌স্‌ বর্তমানে সাধারণ স্বদেশী টিম।

ক্যালকাটা যেমন ছিল কলকাতায় বৃটিশ ফুটবলের একদিক, আর একদিক ছিল গোরা-পল্টনের দল।

পল্টনিয়ারা প্রথম খেলাতেই সিভিলিয়ান দলকে চার গোল দিয়েছিল। যদিও প্রথম বছরের ট্রেডস্‌ কাপে ড্যালহৌসী হয়েছিল জয়ী, তারপর থেকে লীগের প্রথম তিন বছর পর্যন্ত বে-সামরিক কোন দলকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি ফৌজীরা। ১৯০১ সালের প্রথম বিভাগ লীগে একটাও ম্যাচে না হেরে এবং একটাও গোল না খেয়ে যে রেকর্ড করে রেখে গেছে রয়েল আইরিশ, সে রেকর্ড আজও অটুট। ক্যালকাটা ১৯২২ সালে প্রায় তার পুনরাবৃত্তি করছিল, কিন্তু কাস্টম্‌সের সঙ্গে ১—১ গোলে ড্র করার ফলে সে আশা আর পূর্ণ হয়নি।

ফোর্ট উইলিয়াম এবং ব্যারাকপুরে একটা করে পল্টন থাকতো, আর দু'বছর অন্তর বদল হত। তারা সেই সময় প্রথম বিভাগ লীগে খেলত, আর ফোর্ট দলের 'বি' টিম খেলতো দ্বিতীয় বিভাগে। এই ছিল সাধারণ নিয়ম, ব্যতিক্রমও মাঝে মাঝে হত। দু'এক বছর আবার একটিমাত্র গোরা দলকে খেলতে দেখা গেছে প্রথম বিভাগ লীগে। ক্যামেরন হাইলাণ্ডার্স ফোর্টে ছিল তিন বছর। ডারহাম্‌স্‌ও ব্যারাকপুরে ছিল চার বছর। কে. আর. আর. লিঙ্কন্‌স্‌, ডি. সি. এল. আই. এবং এইচ. এল. আই-ও তিন বছর করে ছিল। এর মধ্যে কে. ও. এস. বি, ব্ল্যাক ওয়াচ এবং ডি. সি. এল. আই. ঘুরে ফিরে একাধিকবার কলকাতায় অবস্থান করেছে।

এ ছাড়াও অতিরিক্ত পল্টন থেকেছে কথনো সখনো। তাদের জন্য

সব সময় প্রথম বিভাগে আসন সংরক্ষিত ছিল না, দ্বিতীয় বিভাগে জায়গা নিতে হয়েছে। এদের মধ্যে আর. জী এ. ১৯২২ সালে দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়ে পরের বছর প্রথম বিভাগে খেলে। ১৯২২-এ প্রথম বিভাগে যেমন ক্যালকাটা, দ্বিতীয় বিভাগে আর. জী. এ-ও তেমনি। মাত্র একটা ড্র খেলে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে। রিটার্ণ ম্যাচ ছিল তখন দ্বিতীয় বিভাগে। একবার ড্র খেললেও আর একবার ওরা অনেক গোল ইস্টবেঙ্গলকে দিয়েছিল। সাত আট গোল হামেশা দিয়েছিল সেবার ওরা। ২২টা খেলায় ওরা গোল দিয়েছিল মোট ৮২টা, খেয়েছিল দুটো। সেণ্টার-ফরোয়ার্ড সিম্পসন একাই দিয়েছিল পঞ্চাশের উপর। মাত্র একটা গোল খেয়ে, একটাও না হেরে এবং একটা মাত্র ড্র করে দ্বিতীয় বিভাগ লীগ পেয়েছিল ১৯১৬ সালে রেঞ্জার্স।

১৮৯৮ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত লীগে পল্টনীদলের একছত্র প্রতাপ ছিল। কারণ এর মধ্যে ক্যালকাটা তিনবার আর এক বার ড্যালহৌসী ছাড়া, ওরাই প্রথম বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে প্রতিবার। এর পর থেকেই লীগে ফৌজী প্রাধান্য কমে আসে। দ্বিতীয় বিভাগে ১৯০৪ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে মেডিকেল কলেজ, কাস্টম্স্, রেঞ্জার্স, কুমারটুলি এবং পুলিশ-ই, যা এক এক বছর করে বে-সামরিক দলের মর্যাদা রক্ষা করেছে। কিন্তু তার পরে ১৯৩৩ সালে কে. আর. আর. 'বি' ছাড়া কোন ফৌজী দলই দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হতে পারেনি।

লীগে যে সব ফৌজীদল দুর্ধর্ষ শক্তির পরিচয় দিয়েছে, তাদের মধ্যে রয়েল আইরিশ-এর পরেই এইচ. এল. আই. (১৯০৬—৮)। তারপর ১৯১৫ সালে মিড্ল্সেক্স। মাত্র এক বছর, কিন্তু সেই এক বছরের খেলার জোরেই আজও তাদের উজ্জ্বল স্মৃতি গাঁথা আছে অনেকের মনে। ১৯২৩—২৫ সালে ফোর্টে ছিল ক্যামেরন হাইল্যাণ্ডার্স। সে সময়

ক্যালকাটা ও ড্যালহৌসীর খেলা সব চেয়ে উন্নত, আর ব্যারাকপুরের দল সাউথ ওয়েলস্ বর্ডারার্স'ও কড়া টিম। ফলে একমাত্র ১৯২৪ সালে গোলের হিসেবে ড্যালহৌসী ও বর্ডারার্সকে মেরে লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি ক্যামেরন্স্। তবে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে ওদের মধ্যে অনেক খেলোয়াড় এখনও স্মরণীয় হয়ে আছে।

ক্যামেরনসের পরে নর্থ স্টাফোর্ডস পর পর দুবার লীগ নিয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে সব ফৌজীদল কলকাতায় লীগ খেলেছে, তাতে দলগত নৈপুণ্যে বোধহয় নর্থ স্টাফোর্ডসই সবার উপরে। ১৯২৬ সালে কলকাতায় প্রথম এসে ওদের এখানকার অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে কিছু সময় লেগেছিল। ক্যালকাটার সঙ্গে প্রথম খেলায় ১—৩ গোলে পরাজিত হয়ে ফিরতি খেলাটি ওরা ১—১ গোলে ড্র করে। শেষ পর্যন্ত ক্যালকাটা ও নর্থ স্টাফোর্ডস সমান পয়েণ্ট পায়। গোলের হিসেবে চ্যাম্পিয়ান নির্ধারণের নিয়ম বদলে গেছে আগের বছর। কাজেই দু'দলে আবার খেলা। এবার নর্থ স্টাফোর্ডস জিতলে, সেই ৩—১ গোলে। পরের বছর ওদের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় গোলকীপার ডেভিসকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেল ড্যালহৌসী, কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হল না। লীগ নর্থ স্টাফোর্ড'স-ই পেলে।

এরপর ডারহামস যখন ব্যারাকপুরে ঘাঁটি করে লীগ খেলা সুরু করে, তখন ওরা রূপকথার রাজপুত্র। কবছর আগে বোম্বে ও সিমলায় মোহন-বাগানকে ওরা চরম নাকাল করেছে শুকনো মাঠে। তিনবারের শীল্ড বিজয়ী শেরউড ফরেস্টার্সকে হারিয়েছে ডুরাণ্ডের খেলায়। ওদের খেলা যে যেখানে দেখে এসেছে, বলেছে, এমনটি আর হয় না, ভাষায় না কুলায়। ১৯২৫ সালে শীল্ডে ওদের খেলায় বিশেষ কিছু আহা মরি না দেখেও কলকাতার জনসাধারণের কল্পনা তেমন ঘা খায়নি ডারহামস সম্পর্কে। বলেছে, আহা ডারহামস কখনো লীগে খেলে না! কিন্তু পর

পর তিনবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েও তারা কলকাতার দর্শকদের মন ভরাতে পারেনি। একথা ঠিক যে ওদের খেলায় বৈশিষ্ট্য ছিল, কাট-ছাঁট কার্যকরী গোল-দেওয়া-সর্বস্ব খেলা নয়, হালকা চালের আলপনা-কাটা খেলা, বাঙালী দর্শক যা চাইত। তবে এদিকেও তারা বাঙালী ফুটবলের শিল্প-কৌশলের সমপর্য্যায় নৈপুণ্য দেখাতে পারেনি। চতুর্থ বছরে ওরা লীগে একেবারে চার ধাপ নীচে এসে ঠেকলো। ভালো ভালো খেলোয়াড় হঠাৎ দল বেঁধে চলে গেল দার্জিলিঙ্‌। ফলে মহামেডান স্পোর্টিংএর পথ হল সুগম। তবে একথা ঠিক যে কলকাতায় থাকার সময় প্রতি বছরে ডারহামসের খেলা খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়েছে। পর পর তিন বছর লীগ জেতার রেকর্ড যে আর কোন ফৌজীদলের ভাগ্যে হয়নি, তার কারণ, আর কোন দলই একটানা চার বছর লীগ খেলার সুযোগ পায়নি। তাছাড়া ক্যালকাটা ১৯২৭ সালের পর থেকেই পড়তি।

তখন সারা ভারত-ব্রহ্ম-সিংহলে ঘাঁটি করে সাম্রাজ্য পাহারা দিচ্ছে অজস্র বৃটিশ পল্টন। দূর প্রাচ্যে, মধ্য প্রাচ্যেও ঘাঁটির অভাব নেই। কাজেই পূব রাজ্যের প্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতা আই. এফ. এ. শীল্ড খেলতে ঝাঁকে ঝাঁকে আসতো ওরা।

ফাইনালগুলির হিসেব কষলেই শীল্ডে মিলিটারী দলগুলির দাপট ঠিক-মত বোঝা যাবে।

১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধে। তারপর বৃটিশ মিলিটারীরা আর এখানে ফুটবল খেলেনি। তার আগেকার ৪৬টি ফাইনালে ৩২ বার মিলিটারী দল জয়ী হয়েছে। আর একবার খেলা অমিমাংসিতভাবে পরিত্যক্ত হয়, সেবারেও দুই মিলিটারী দল ফাইনালে ছিল। ১৯৩৪ সালে ডারহাম্‌স এবং কে. আর. আর-এর খেলা ২-২ গোলে অমিমাংসিতভাবে শেষ হয়। কে. আর. আর. অভিযোগ করে, ডারহামস যে শেষ গোল দিয়ে তাদের ধরে ফেলেছিল,

সে গোল হবার কথা নয়. বাঙালী রেফারি বেশী সময় খেলিয়েছে বলেই তা সম্ভব হয়েছে। রেফারি পঙ্কজ গুপ্ত কৈফিয়ৎ দিলেন, সময় অপচয় হলে যেটুকু বেশী সময় খেলাবার অধিকার আইন আমায় দিয়েছে, তাই আমি খেলিয়েছি। কিন্তু এখানে আইনের প্রশ্নের চেয়ে বড় কথা ছিল। এক ধুতি ও হাফশার্ট পরা পানে গাল-ফুলানো নেটিভ বাঙালীর মাতব্বরীতে তারই কর্তৃত্ব এবং হুকুম মেনে খেলতে হবে দুদল বৃটিশ মিলিটারীকে, তা কখনও সহ্য করা যেতে পারেনা। দুই পল্টনের কর্তাব্যক্তিরা জানালে, সাহেব রেফারি ছাড়া খেলবেনা আর। আই. এফ. এ-তে তখন ভারতীয়দের সমান অধিকার, আর ক্যালকাটা ড্যালহৌসীর প্রতিনিধিরাও তাদের আই. এফ এ-র উপর হুকুমদারি পছন্দ করলে না। নালিশ কার নামে ? স্বয়ং পঙ্কজ গুপ্ত ! ততদিনেই সে মস্ত মাতব্বর, দু দুবার সে ম্যানেজার হয়ে বিদেশ ঘুরে এসেছে, আই. এফ. এ-র জয়েন্ট সেক্রেটারীগিরি করেছে। আই. এফ. এ-ও অনড়। কাজেই ওই অমিমাংসিত অবস্থাতেই বাতিল হল ফাইনাল।

বাকী ১৩ বার যে বে-সামরিক কলকাতার দল শীল্ড জিতেছে, তার মধ্যে সাত বার গোরা দল হয়েছে রানার্স-আপ। ফাইনালের দু দলেই মিলিটারী এমন ঘটনা ঘটেছে উনিশবার। বে-সামরিক বিজয়ীদের মধ্যে নবার ক্যালকাটা, দুবার ড্যালহৌসী আর মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং এক এক বার। শীল্ড না পেয়েও বে-সামরিক দল যারা ফাইনাল খেলেছে, তারা হল কাস্টম্‌স্‌, কুমারটুলি ও রেঙ্গুন কাস্টম্‌স্‌। ১৯৩৭ সালে পুলিশ রানার্স-আপ হয়, তারপর মিলিটারী যুগের অবসানে ১৯৩৯ সালে দুঃখ মিটিয়ে নেয়।

বিলকুল বে-সামরিক শীল্ড ফাইনাল এ যুগে হয়েছে মাত্র ছবার। তার মধ্যে তিনবার ক্যালকাটা-ড্যালহৌসী, একবার ক্যালকাটা-কাস্টম্‌স্‌, একবার ক্যালকাটা-মোহনবাগান, আর শেষ যুগে মহামেডান স্পোর্টিং-ক্যালকাটা একবার।

লীগ ও শীল্ডের যুগ্ম মুকুট পাওয়ার ভাগ্য ফৌজী দলের বেশী হয়নি। ১৯০১ সালে রয়েল আইরিশ আর ১৯০৯ সালে গর্ডনস্-ই যা পেয়েছে। তবে শীল্ডের খেলায় সবচেয়ে কৃতিত্ব রয়েল আইরিশ দলের। মোট পাঁচবার শীল্ড আর কোন দল পায়নি, প্রথম দুবছর, ১৯০১ সালে, আবার ১৯১২-১৩-তে। পক্ষান্তরে ওয়াকিবহাল পণ্ডিতদের মতে যারা সব চেয়ে ভালো টিম, সেই ডারহাম্স্. একবারও শীল্ড পায়নি। ১৯২৫ সালে প্রথম এসে চেশয়ার্সের কাছে এক গোলে হেরে চলে যেতে হল ডারহাম্স্‌কে। ১৯৩১ সালের ফাইনালে এইচ. এল. আই-র কাছে হারলো ১-২ গোলে। তার পর দুবছর ফাইনালের আগেই হেরে গেল। সবশেষে ১৯৩৪ সালে। যদিও গুপ্ত সাহেব কিছু সময় বেশী খেলাবার ফলে পরাজয় এড়াতে পেরে-ছিল প্রথম দিন, মিলিটারী মেজাজের ফলে আঙুল চোষাই হল সার।

অনেক বাঘা বাঘা গোরা দল শীল্ডে খেলেছে। যারা জিতেছে বা ফাইনালে খেলেছে তারাই শুধু নয়, অনেক সময় যোগ্যতর দলকেও আগে থাকতেই হেরে চলে যেতে হয়েছে মুখ চুণ করে। ইদানীং কালে নাবিকদল এইচ. এম. এস. এফিংহাম, সাউথ স্টাফোর্ড, উইল্টশায়ার, আর্গাইল য়্যাণ্ড সাদারল্যাণ্ড হাইল্যান্ডর্স, লিসেস্টারশায়ার-ল্যাঙ্কাশায়ার ফুশিলিয়ার্স। এরা জবর টিম হয়েও এক দু রাউণ্ডেই হেরে গেছে।

এশিয়ার বিরাট সাম্রাজ্য পাহারা দিতে হত যাদের, তাদের পল্টন সংখ্যার সীমা-পরিসীমা ছিল না। আর ফুটবলই ছিল গোরা দলের স্বাস্থ্যচর্চ্চা এবং অবসর বিনোদনের প্রধান উপায়। ফলে পল্টনী ফুটবল দলও যেমন ছিল অগুণতি, তাদের অধিকাংশেরই খেলা ছিল খুব উঁচু দরের। সে খেলায় সৌন্দর্যের প্রকাশ মাঝে মাঝে দেখা যেত না তা নয়, তবে সেখানে দৈহিক শক্তিরই প্রধান্য ছিল, কৌশলের চেয়ে গায়ের জোরই বেশী প্রকাশ পেত। এ হেন দলের বিরুদ্ধে, কখনও বা ভারি কাদামাঠে খেলতে শুধু-পা

বাঙালী ফুটবলারদের যে শক্তির পরীক্ষা দিতে হয়েছে সেদিন, সে শক্তিতে মাউণ্ট এভারেস্টও জয় করা সম্ভব।

কোন কোন দল ভালো খেলেছে তার হিসেব কষতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলতে হবে। তবু বলা যায় বিগত শতাব্দীর রয়েল আইরিশ, রয়েল ওয়েলস, শ্রফশায়ার ও গ্লস্টার্স উল্লেখযোগ্য। এই শতকের প্রথম দিকে মোহনবাগান শীল্ড নেবার আগে যারা খেলে গেছে, তাদের মধ্যে গর্ডন হাই-ল্যাণ্ডার্সের সঙ্গেই যাদের নাম করতে হয়, তারা হল-এইচ. এল. আই. আর কে. ও. এস. বি.। মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে এবং ফাইনালে যে দুটি দলকে পরাজিত করে, সেই মিডলসেক্স ও ইস্ট ইয়র্কস দুটি দলই দুর্ধর্ষ। সাহেবী যুগের অবসানে ১৯৩৫ এবং ১৯৩৮ সালে ইস্ট ইয়র্কস ১৯১১ সালের দুঃখ ঘুচিয়ে গেছে। ১৯১১-র পরেই আবার আইরিশ রাইফলস্। ১৯০১ সালে রাইফলস্ তিন বারের ডুরাণ্ড-বিজয়ী ব্লাকওয়াচের দর্প চূর্ণ করেছিল, সেই ব্ল্যাকওয়াচ এবার আবার হেরে গেল আইরিশদের হাতে। দ্বিতীয় দশকে আর যে সব মিলিটারী দল উচ্চ শ্রেণীর খেলা দেখিয়ে গেছে, তার মধ্যে নর্থ স্টাফোর্ডস্ এবং মিডলসেক্স সবচেয়ে মনো-হরণ করে। মোহনবাগানকে হারিয়ে শেষ পর্যন্ত শীল্ড জিতে মিড্লসেক্স পুরাতন ক্ষোভ মিটিয়ে যায় ১৯১৭ সালে। এ যুগের আর একটা দল, যার কথা এখনও অনেকে স্মরণ করে আনন্দ পায়, তারা হল ব্রেকনকসশায়ার। সতের সালে রাণার্স-আপ হবার পর উনিশ সালে ওরা শীল্ড জেতে ক্যালকাটাকে হারিয়ে। ব্ল্যাকওয়াচ-ও বার বার ব্যর্থতার ক্ষোভ মেটায় ১৯২০ সালে। ফাইনালে ওরা কুমারটুলিকে হারিয়েছিল ২-১ গোলে, কিন্তু ওদের প্রকৃত কৃতিত্ব ছিল সেমি-ফাইনালে ক্যালকাটাকে হারানো।

দলগত বা ব্যক্তিগত বিশেষ কোন খ্যাতি নেই, এমন দুটিদল শীল্ড ফাই-নাল খেলেছিল ১৯১৮ সালে। যাঁরা অতি প্রাচীন, ফুটবল দেখতে দেখতে

যাঁদের চোখের ভুরু পর্যন্ত সাদা হয়ে গেছে, তাঁদের অনেকে বলেন এমন মনোজ্ঞ ফাইনাল আর কখনো হয়নি। কলকাতা কেল্লার কাম্পোজিট ব্যাটালিয়ান, যারা লীগে যোগদানের অধিকার সত্ত্বেও লীগ খেলেনি সেবার, তারাই সেভেন্থ ট্রেনিং রিজার্ভ নামে শীল্ড খেললে, ফাইনালে মুখোমুখী হল সিগ্‌ন্যাল সার্ভিস ডিপোর।

এদিক থেকে ওদিক, এই মুহূর্তে এদিকে গোল বুঝি হয়ে গেল, পরমুহূর্তে ওদিকের গোল থেকে অবিশ্বাস্যভাবে বল ফিরে আসছে। ফরোয়ার্ডদের ছবির মত ইঞ্চি-মাপা পাস, চুম্বকের আকর্ষণে বল পড়ছে সেণ্টারে। আবার ব্যাক-হাফব্যাক ছোঁ মেরে কেড়ে নিলে বল। উত্তেজনা উৎকণ্ঠায় সবার দম বন্ধ, রেফারির মুখের বাঁশি পর্যন্ত বাজেনা। বাজবেই বা কোন সুবাদে? ফাউল নেই, নেই হ্যাণ্ডবল কি অফ-সাইড, বলকে মাঠের বাইরে কোনমতে যেতে দেবেনা কেউ। হ্যাঁ, হাফ-টাইম ও ফুল-টাইম ছাড়া একবার বেজেছিল বাঁশি, ফুল-টাইমের কয়েক সেকেণ্ড আগে, যখন ট্রেনিং রিজার্ভ দলের লেফট-আউট হ্যাকেটের একটা উঁচু শট ধনুকের মত বেঁকে গোলে ঢুকে গেল, সিগনাল-এর গোলকীপার জেম্‌স্‌কে বোকা বানিয়ে। কেউ কেউ বলে বাঁশি ত্ববার বাজেনি। একবার মাত্র বেজেছিল বেশ লম্বা করে। কারণ গোল হবার সঙ্গে সঙ্গেই সময় কাবার।

তৃতীয় দশকের প্রথম ক'বছর তেমন তেমন মিলিটারী টিম আসেনি কলকাতায়। ১৯২৫ সালে কিন্তু ঝাঁকে ঝাঁকে এল। ডারহাম হারলে চেশায়ারের কাছে, আর সেই চেশায়ারই কিনা ৫—১ গোল খেলে রয়েল স্কট ফুশিলিয়ার্সের হাতে। ১৯০৫ সালে ক্যালকাটার হাতে ড্যালহৌসী ছাড়া শীল্ড ফাইনালে এমন শোচনীয় পরাজয় হয়নি কোন দলের। ১৯২৩ সালে আর্গাইল ত্বর্দান্ত খেলে হেরে গেল ক্যালকাটার কাছে। তার আগের ম্যাচে আর্গাইল যখন শিলচরকে হারালে ৯—১ গোলে, প্রায় গোল-কীকের জায়গা

থেকে ফ্রী-কীক করে চতুর্থ গোলটি দিলে ওদের ব্যাক উইংফিল্ড। স্টেটসম্যান বললে, গোল-স্কোরিং ব্যাক। পঁচিশ সালেই গর্ডন ফিরে এসেছিল আবার। কত আশা, এ যুগেও গর্ডনের খেলা দেখবে লোকে, কিন্তু হরি হরি এরিয়ান্স ধরে হারিয়ে দিলে।

পরের বছর সদ্য ডুরাণ্ড বিজয়ের ছটায় দিক উদ্ভাসিত করে এল শেরউড ফরেস্টার্স। অবাধ গতিতে এগিয়ে গেল, ফুটবলের পাঠ্য পুস্তকে যেমন যেমন খেলার কৌশল থাকার কথা, দেখিয়ে তাক বানিয়ে দিল লোককে। ফাইনালে অনেক কষ্টে ক্যামেরন হাইল্যাণ্ডার্সকে হারালে। পরের বছর অনেক সহজে হারালে ড্যালহৌসীকে। আর তারও পরের বছর ক্যালকাটার বিরুদ্ধে ফাইনালে শেরউড প্রথম মিনিট পনের'র মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে তিন গোল। বাকী সময় শুধু ভেল্কিনাচন নাচাল সারা ক্যালকাটা দলকে। কি ফূর্তি! আমাদের বিরুদ্ধে যারা বরাবর লায়েকি করে, আইন বে-আইনি যত ফিকিরের জোরে, তাদের নাকাল হতে দেখলে ফূর্তি হবে না?

অঘটন ঘটলো ১৯২৯ সালে, রেঙ্গুন কাস্টমস গেল ফাইনালে। শেষ পর্যন্ত রয়েল আলস্টার রাইফলসের কাছে দুগোলে হারলো বটে রেঙ্গুন, কিন্তু তাদের খেলা দেখে তাক বনে গেলাম আমরা। এত নিকট প্রতিবেশী একটা দেশে (সেদিন ভারতের অংশ) ফিরিঙ্গী সমাজের ফুটবল এত উন্নত! বস্তুত ১৯২২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার এক ভারতীয় দলের সফর ছাড়া অ-বৃটিশ বিদেশী ফুটবল দলের খেলা এই উপলক্ষেই প্রথম দেখলে কলকাতার লোক। আর একটা লোকই বোধ হয় ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছে দিলে ওদের, সে হল সেণ্টার-ফরোয়ার্ড বুকানন, লেফট-আউটও খেলেছে।

১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ভারত জনসমুদ্র উদ্বেল, কোন ভারতীয় মার্কা দল ফুটবলে অংশ গ্রহণ করলে না। মনসুন লীগ খেলা হল ইয়োরোপীয়ান মার্কা দলগুলিকে নিয়ে। চ্যাম্পিয়ান

হল লয়াল রেজিমেণ্ট, ড্যালহৌসী হল রাণার্স-আপ। শীল্ড জিতলে সীফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স। সাধারণ লোকে বেশী উৎসাহ দেখালে না, কিন্তু নেশা-পাগল যে ক'জন দেখলে খেলা, তারা সীফোর্থের খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল।

চতুর্থ দশকে ইয়োরোপীয়ান ফুটবলের যবনিকা পড়লো কলকাতায়। কিন্তু যে কটা মিলিটারী দল এ যুগে শীল্ড ফাইনাল খেলেছে, তাদের উৎকর্ষ বিস্ময়কর। একমুখো এইচ. এল. আই—যাদের সেণ্টার-ফরোয়ার্ড গ্রেভস-এর চেয়ে ভালো সেণ্টার-ফরোয়ার্ড অনেকের মতে কলকাতা ফুটবলে আর দেখা যায় নি। ঐ এক জনের জোরে ডারহামকে হারিয়ে শীল্ড নিলে ওরা ১৯৩১ সালে। পরের বছর সেই এইচ. এল. আই-কে হারিয়ে দিয়ে সীফোর্থ যখন ফাইনালে গেল, তাদের চূড়ান্ত সাফল্য সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না কারো মনে। কিন্তু চটকদারী খেলায় ভারি মাঠে এসেক্সের ভারি খেলার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলে না সীফোর্থ।

পল্টনী দলের নক্ষত্র মার্কা খেলোয়াড় সংখ্যার হিসাব নিকাশ করা আকাশের তারা গোণারই মত অসম্ভব। তবু এমন জন কয়েক খেলোয়াড় খেলে গেছে কলকাতায়, দুটি একটি খেলার জোরেই তাদের ছাপ মনের পর্দায় গাঁথা হয়ে আছে।

সকালে বিকেলে গোলে শুট করা যাদের একমাত্র অবসর বিনোদন, সেই পল্টনী দলের ফুটবলে গোলকীপার যে ভালো হবেই, তা জানা কথা। কিন্তু তার মধ্যেও যারা অবিস্মরণীয় খেলা দেখিয়েছে, তাদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় ৬২ কোং আর. জী. এ-র মাচ। দ্বিতীয় বিভাগে ১৯১৫-১৬ সালে খেলেছিল সে দল, একবার চতুর্থ ও পরেরবার দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিল। তবু এক ম্যাচ-এর জন্যই সে দলের কথা আজও মনে আছে অনেকের। মোহনবাগান যে পিগট-কে গোল দিয়ে শীল্ড-ফাইনালে উঠেছিল,

তারপর শীল্ড জিতেছিল যে ক্রেসী-কে ভেদ করে, তারাও কিছু কম দুর্ভেদ্য ছিল না। পরের যুগে সাউথ ওয়েলস বর্ডারার্স (১৯২৩-২৪)-এর হস্কার ক্যামেরন্স-এর মলয়, শেরউডের প্র্যাট, উইল্টশায়ার্সের স্নুক (১৯২৭) এবং এ যুগের ইস্টইয়কর্স দলে পটার ছিল সেরা পল্টনী গোলকীপার। কোন মন্ত্র না জানা থাকলে বোধ হয় এদের গোলে বল ঢোকান সম্ভব হতনা।

গোরা দলের ব্যাকের কথা বলতে গেলে সবার আগে মনে আসে ১৯০১ সালের রয়েল আইরিশ দলের ব্যাক বেরেসফোর্ড ও মার্ফি। সে বছরকার লীগের খেলায় যে একটাও বল ঢোকেনি ওদলের গোলে, তা এই দুই ব্যাকেরই জন্য। তারপর ওই যুগেই ওয়েলস দলের ওমস্লে, শ্রফশায়ারের গ্যাম্বল ও গ্লস্টার্সের ক্লিভারের কথা বলতে হয়। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কে. ও. এস. বি-র ম্যাকডোনাল্ড এবং এইচ. এল. আই-র হাওয়ার্ড রেণ্টন জুড়ির পর দেখা দেয় গর্ডনসের কার্কউড ও ওয়াকার। রয়েল আইরিশ যখন ১৯১২-১৩ সালে ফের আসে কলকাতায়, তখনকার ব্যাক ফিশার এবং হানা-ও কিছু কমতি ছিল না। দ্বিতীয় দশকের গোরা ব্যাকদের মিছিলে এদের পর যারা আসে তারা হল, ব্ল্যাক ওয়াচের রিচমণ্ড ও রীড, ৯১ হাইল্যাণ্ডার্সের কিং, সমারসেটের ডে এবং মিডলসেক্সের বার্কস এবং ব্যাটারি। তৃতীয় দশকের গোড়ার যুগে সেরা পল্টনী ব্যাক আরগাইলসের উইংগফিল্ড, আর তার পরই ক্যামেরন্সের কিং-রিচি জুড়ি। শেরউডের মূল শক্তি তাদের দলগঠনের ভারসাম্য। যেমন গোলকীপার প্র্যাট, তেমনি ব্যাক ফ্লেচার ও জোনস। নর্থস্টাফোর্ডসের বাটারি-মোফাট জুড়ির কথা সহজে ভোলা যায় না। আর ডারহামসের ব্যাক লিওনার্ড ও রিড্ল ছিল দলের দুই স্তম্ভ। শেষের যুগে যারা খেলে গেছে, তাদের মধ্যে ফিল্ড ব্রিগেডের জোনস্-ডেভিস জুড়িই সবচেয়ে শক্তিমান। পল্টনী ব্যাকদের খেলার ধাঁচ প্রায় এক। গায়ের জোর খাটিয়ে ধাক্কা

মেরে খেলত তারা, আর সবারই কীক কামানের গোলার মত তীব্র। বল নিয়ে লোক কাটানোর ধার ধারত না ; বল কেড়ে নাও ও সঙ্গে সঙ্গে মেরে বার করে দেও, এই ছিল সহজ নীতি।

চার্চিলের সমপর্যায়ের পল্টনী সেণ্টার-হাফ ছিল ব্রেকনকসের জ্যাক-উইলিয়ামস, নাম করতে আজও সেকালের খেলোয়াড় দর্শক শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে ওঠে। গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফৌজী সেণ্টার হাফ বলতে নিঃসন্দেহে রয়েল আইরিশের ওয়েবস্টারের নাম করা যেতে পারে। পরে আসে শ্রফশায়ারের মিলচ্যাপ। এর পরের যুগে এইচ. এল. আই-র ডার্সি এবং গর্ডনসের হার্পার সবচেয়ে প্রশংসা অর্জন করেছিল। আরও পরে সের্ভেন্স ট্রেনিং রিজার্ভস-এর পয়েণ্টন, উস্টার্সের গিল, চেশায়ারের শ, শেরউডের মার্কস এবং ডারহামসের হোয়েদারাল ও ডিক্সন ফৌজী সেণ্টার-হাফের উন্নত মান সমানে রক্ষা করে গিয়েছে। যেমন এদের লাফানো, দুপায়ে সমান শট, মাথায় হেড্, তেমনি অঢেল দম, পরিশ্রমের ক্ষমতা অনন্ত, সারাটা মাঠ চষে বেড়াচ্ছে।

ফৌজী ফুটবলে ফরোয়ার্ডের কথা প্রসঙ্গে প্রথমেই যে নাম মনে আসে, সে হল ১৯২৯-৩১ যুগে এইচ. এল. আই-র সেণ্টার-ফরোয়ার্ড গ্রেভ্স। এতখানি বুদ্ধি খাটিয়ে আর কোন গোরা সেণ্টার-ফরোরার্ড খেলেছে কিনা সন্দেহ। ছকে মাপা পাস দিয়ে ঠিক এমন জায়গায় সে সরে দাঁড়াত, যে বল ঠিক ফিরে আসে তার কাছে, আর তার পর পাস দিতেই আক্রমণ এগিয়ে যায় অনেক খানি। জোরে শট মারত না গ্রেভস্, কিন্তু এমন কৌশলে সে মারতো, যে গোলকীপার তার তাল পেতনা। বিপক্ষের রক্ষণভাগের পদ্ধতি ও কৌশল বুঝে নিয়ে আক্রমণ রচনাই ছিল গ্রেভসের প্রধান-বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তিগতভাবে যেমন গ্রেভস; দলগতভাবে শ্রেষ্ঠ আক্রমণশক্তি দেখিয়েছে মিডলসেক্স (১৯১৭)-এর নিকলসন-পপ্‌ল-উইলসন-এলসন-স্টাব্‌স্ পঞ্চক।

এদের পাঁচজনে যেমন বোঝাপড়া দেখা গেছে, যেন এক জনেরই পাঁচ প্রকাশ। এর মধ্যে আবার শুটিং, পায়ের কায়দা এবং বল কাটানোয় বেশী ওস্তাদ ছিল নিকলসন, উইলসন ও এলসন। কাছাকাছি দিয়ে বল গেলেই এলসন যে ভাবে শুয়ে পড়ে মাথার উপর দিয়ে উল্টে আলগোছে বলটি গোলে ফেলতো, সেই কৌশলের পুনরাবৃত্তি আর কারো মধ্যে দেখা যায়নি। ইদানীং মেওয়ালাল ওই ধরনের ডিগ্ বাজি শট মেরেছে, কিন্তু তুলনায় এলসনের শট ছিল অনেক সুন্দর, অনেক বেশী কার্যকারী। কলকাতা মাঠে এ জাতের শটের নামই হয়ে গেছে এলসোনি মার।

ফরোয়ার্ডদের দলগত নৈপুণ্যে পরবর্তী যুগে চমক লাগিয়েছিল সীফোর্থস (১৯৩২)। তাদের মেক্সি-ডাইব্যাল-ব্যালার্ড-মাণ্ডার্সন-ইয়ং পঞ্চক সেবার শীল্ড-ফাইনালে এসেক্সের দুর্ভেদ্য রক্ষণ ব্যূহকে ছত্রখান করে দিয়েছিল, যদিও তার ফলে জয়লাভ সম্ভব হয়নি।

ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে আরও অনেক সেণ্টার-ফরোয়ার্ড দর্শকদের চমৎকৃত করেছে। রয়েল আইরিশ রাইফল্‌স্ (১৮৯৩)-এর লীন। পরের বছর লীনের বদলে খেলে প্রেস্টন। কে যে কাকে দেখবে বলা কঠিন। রয়াল ওয়েলস (১৮৯৫)-এর জোনর্স, শ্রুফশায়ার্স (১৮৯৬)-এর ব্র্যাডকক, সাউথ ল্যাঙ্কস (১৮৯৯)-এর কুক, ৯৩ হাইল্যাণ্ডার্স (১৯০২)-এর হাউস্টন, কিংস ওন (১৯০৪)-এর এনিস এবং গর্ডনস্ (১৯০৮-৯)-এর ম্যাকে। পরবর্তী যুগের দলগুলির মধ্যে হোয়াটমোর (উরস্টার্স-১৯২১), শেলি (চেশায়ার্স-১৯২৫), ডান্‌কান (রয়েল স্কট-১৯২৫), স্টীল (নর্থ স্টাফোর্ডস-১৯২৬-২৭) এবং হ্যারিসন (শেরউড-১৯২৬)।

উইং-ফরোয়ার্ডে তৃতীয় দশকের হাওয়েল (শেরউড), ব্রাউন ও স্কিট (ক্যামেরন), ব্রুক (ডারহামস) এবং উরস্টার্সের গামারি সবচেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতি রেখে গেছে। হাওয়েল দৌড়ে এদের মধ্যে সবচেয়ে ওস্তাদ ছিল এবং তার

সেণ্টারগুলিও ছিল অনবদ্য। ব্রাউন নিজেই কেটে ঢুকে যেত ভিতরে, এই মোটা চেহারা নিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। তার পর বল ফেলতো হয় গোলে, গোলকীপারের নাগালের বাইরে, নয় অন্য কোন ফরোয়ার্ডের পায়ের সামনে। গোলের মুখে বল লব করায় ছিল স্কিট-এর ওস্তাদি। আর ব্রুক ছিল বল কাটিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওস্তাদ, পায়ের কায়দায় সবচেয়ে কৌশলী। পুরাণো যুগের স্মৃতি যাদের সম্বন্ধে আজও মুছে যায়নি, তারা হল গর্ডনস(১৯০৯-১০)-এর গিলক্রিস্ট এবং উস্টার্স (১৯২০)-এর এল্ডার ও গামারি। প্রথমার্দ্ধে তিন গোলে পিছিয়ে থেকেও উরস্টার্স সেবার যে শীল্ডের প্রথম খেলায় আর এক গোরা দলকে ৫-৩ গোলে হারিয়েছিল, গোষ্ঠবাবুর মতে গামারি হোয়াইট-মোর জুড়ির সেদিনকার তুল্য খেলা সে যুগে হয়নি। দারুণ জলকাদার মধ্যেও গামারির প্যাণ্টে ছিটেটুকুও লাগেনি কোন দিন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে, কোন হাঁকফাঁক নেই। বল পেয়েই সবাইকে কাটিয়ে একেবারে গোল-কীপারের মুখোমুখি। কিন্তু গোলকীপার যখন ওর শট রুখতে তৈরী, ঠিক সেই সময় ও বল ঠেলে দেবে পিছনে হোয়াটমোরকে গোল দেবার জন্য। এমনি অনবদ্য ওদের বোঝাপড়া।

ফৌজী দলগুলিতে প্রথম শ্রেণীর ইনসাইড-ফরোয়ার্ডেরও অভাব দেখা যায়নি। কামেরনসের টেলার ও স্মিথ বিপক্ষের রক্ষণ ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন করে দিত। টেলার-স্কিট বা টেলার-হ্যালিডে দক্ষিণে এবং বামে স্মিথ-ব্রাউন অদ্ভুত সংযোগে বিস্ময় ও ভীতি সৃষ্টি করেছে দর্শকদের। ডারহামসের ইন রবিনসন এবং অ্যাগুারটন, আর শেরউডের ডাডলে এবং বার্ড ওদের আক্রমণ ব্যূহে সাঁড়াশীর কাজ করতো। ডাড্লে প্রথম বছর ইন খেলে দ্বিতীয় বছর সেণ্টার-ফরোয়ার্ডে সমান যোগ্যতা দেখিয়েছিল। চেশায়ার্স যে ১৯২৫ এর শীল্ডে ডারহামসকে হারিয়েছিল, সে দলের প্রধান রথী ছিল রাইট-ইন ওয়েস্টকট। আর চেশায়ার বিজয়ী রয়েল স্কট-এ ছিল ডেভন'

অতি পুরাণো যুগের ইনসাইডদের মধ্যে অনেকের তীব্র আক্রমণ দক্ষতা আজও শ্রুতি পরম্পরায় অমর হয়ে রয়েছে। রয়েল আইরিশ (১৮৯৩)-এর ওয়াইল্ডম্যান ও ফ্রাহার, ওয়েলস ফুশিলিয়ার্স (১৮৯৫)-এর মুর ও মোফাট, গর্ডনস-এর ম্যাককনন ও ম্যাকনটন-এর খেলার গল্প বলতে বলতে অনেক প্রাচীন দর্শকের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখেছি। ১৯১৭ সালের লীগ চাম্পিয়ান ও পরবর্তী সালের রাণার্স-আপ লিঙ্কনস-এর প্রধান শক্তি ছিল তাদের লেফট-ইন বীলিংস। পূরণ বাহাদুরের পূর্বসূরী গুর্খা রাইফল্‌স (১৯২৬)-এর গম্ভীর সিং-এর খেলা আজও অনেকে ভোলেনি। সে যুগে লোকালস বনাম ভিজিটার্স-এর খেলায় শেষোক্ত দলে ভারতীয় খেলোয়াড় গম্ভীর সিং ছাড়া আর কাউকে কোন দিন অংশ গ্রহণ করতে ডাকা হয় নি।

পল্টনী ফুটবল মিলিটারীর তেজ ও বীর্য নিয়েই খেলা হত। আর সে খেলার মেজাজও ছিল তেমনি। বেশী গাজোয়ারী ফলাবার জন্য একই দলের একাধিক খেলোয়াড় সাসপেণ্ড হয়ে যাওয়া সে যুগে দুর্লভ ঘটনা ছিল না। রয়েল স্কট (১৯২২) ও ক্যামেরন্স (১৯২৩) জনকয়েক খেলোয়াড় সাসপেণ্ড হওয়ার ফলে সে বছর লীগ খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেনি।

গোরা পল্টনের দলের সঙ্গে যে যুগে খেলা, সে যুগে দুধভাত মার্কা খেলার কোন স্থান ছিলনা। দশঘা গোঁত্তা সইতে হবে এই ছিল দস্তুর, আর জবাবে দশঘা নাহোক পাঁচঘা দেবার যোগ্যতা ছিল অপরিহার্য। আইনও ছিল সেই রকম। মরদের খেলায় ধাক্কাধাক্কি অনেকখানি পর্যন্ত আইনসঙ্গত ছিল সে যুগে। আর গোলকীপারকে বলশুদ্ধ লাথি মেরে গোলে ঢোকানো ছিল স্বাভাবিক প্রত্যাশা।

মিলিটারী দল মাঠে উচ্ছৃঙ্খলতা মাঝে মাঝে করেনি তা নয়। কিন্তু

সামরিক শৃঙ্খলার বিধিবিধান থেকে তাদের মুক্তি ছিল না। খেলায় অতিরিক্ত অসভ্যতা করলে কোর্ট-মার্শাল-ও হত। তাই খাঁটি খলোয়াড়ি মনোভাবও প্রচুর দেখা গেছে তাদের মধ্যে।

সামরিক প্রয়োজনেই ফৌজগুলিকে ভারতে রাখা হত বিভিন্ন ঘাঁটিতে। খেলাটা অধিকন্তু। গত শতকে ট্রেডস্ কাপ-এর এক খেলায় গোরাদল বাফস্ যখন দুগোলে এগিয়ে আছে ড্যালহৌসীর বিরুদ্ধে, সেই খেলার মধ্যে টগ-বগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এক গোরা সওয়ার ড্যালহৌসী মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়লো। হঠাৎ পুতুল বনে গেল সবাই। সওয়ার একটা কাগজ দিলে ব্যাফসের ক্যাপ্টেনের হাতে। রেফারীকে জানালে ক্যাপটেন, এখনি বারাকপুরের ঘাঁটিতে ফিরে যাওয়ার হুকুম এসেছে, অতএব ড্যালহৌসীকে জয়ী সাব্যস্ত করা হোক। 'লেফট রাইট' করতে করতে এগারজন খেলোয়াড় বেরিয়ে গেল মাঠ থেকে। পরদিন শোনা গেল সে রাতেই পল্টন পশ্চিম সীমান্তে রওনা হয়ে গেছে।

সে যুগে বছর বছর নতুন নতুন সামরিক ও বে-সামরিক অনেক উচ্চশ্রেণীর খেলোয়াড় কলকাতায় খেলার ফলেই বাঙালী ফুটবলের উন্নত মান রক্ষিত হত। একে শক্তিশালী বিপক্ষের সঙ্গে খেলতে হয়েছে নিয়মিত, তার উপর অনুসরণ করবার মত আদর্শ কৌশল হামেশাই পাওয়া যেত। কোন্ গোরা খেলোয়াড়ের কোন্ বৈশিষ্ঠ্য, তা রপ্ত করবার চেষ্টা করতো বাঙালী খেলোয়াড়েরা পরম নিষ্ঠায়।

মহামেডান স্পোর্টিং-এর বিস্ময়কর সাফল্যের গৌরব এতটুকুও হানি না করেই বলতে পারি যে ক্যালকাটা ড্যালহৌসীর অবনতি এবং মিলিটারী দলের ধার ভোঁতা হয়ে যাওয়ার ফলেই ওদের সেই একটানা দিগ্বিজয়ী অভিযান এতটা সহজ হয়েছিল। তিন বছর লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পর ডারহামস-ও ভোঁতা মেরে উদাসীন হয়ে যায়। ভালো খেলোয়াড় অনেকে

দার্জিলিং চলে যায় একটা ইউনিটের সঙ্গে।

বিলেতি পাব্লিক স্কুলে ফুটবলের বদলে রাগবি প্রচলনের ফলেই কলকাতার বে-সামরিক ইয়োরোপীয়ান ফুটবলের অবনতি ঘটে। আর চতুর্থ দশকের সুরু থেকে ইংলণ্ডের ফুটবলে যে ক্রমাবনতি সুরু হয়, তারই প্রভাব পড়ে পরবর্ত্তী কালের বৃটিশ পল্টনীদলের খেলায়। দু একটা ফৌজীদল শীল্ড খেলতে এসে তাদের ঐতিহ্যের ধারা বহন করেছে কোনমতে। কিন্তু আসল কথা বলতে গেলে ১৯৩৪ সাল থেকেই কলকাতা ফুটবলে বৃটিশ যুগের অবসান এবং ভারতীয় যুগের সূচনা। অর্থাৎ ১৮৮৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত প্রথম যুগ চলার পর দ্বিতীয় যুগের সুরু।

পথ দেখাল যারা

সাহেব ও গোরা-পল্টনদের খেলা ফুটবল বাঙালী গ্রহণ করতে দেরি করেনি। সাহেবদের প্রথম ক্লাব পত্তনের ছবছরের মধ্যে যে দেশী ক্লাবগুলো গজিয়ে উঠলো, তার একদিকে ছিল উত্তর কলকাতার শোভাবাজার, আর এক দিকে দক্ষিণ কলকাতায় ছিল ন্যাশনাল।

ইংরেজের আদর্শ মাফিক খেলাধুলায় ভিতর দিয়ে একসঙ্গে শরীর ও চরিত্র গঠন হতে পারে এবং শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্ত্তিতা ও দলগত ভাবে 'হারি জিতি নাহি লাজ' মনোভাব নিয়ে কাজ করার শিক্ষা পেতে পারে আমাদের তরুণ সমাজ, এই বিশ্বাস নিয়ে কালীঘাট হাই স্কুলের শিক্ষক মন্মথ গাঙ্গুলী ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের পত্তন করেন ১৮৮৫ সালেই। নামের মধ্যে থাকুক আর নাই থাকুক, ফুটবল খেলাই হল ক্লাবের প্রধান কর্মসূচী। ল্যান্সডাউন রোডে বর্ত্তমানে যে রামকৃষ্ণ শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, তার পিছন দিকে হাজরা রোড পর্যন্ত বিস্তৃত লখার মাঠে ছিল ন্যাশনালের প্রথম আড্ডা।

শোভাবাজার এবং ন্যাশনালের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য ছিল। শোভাবাজার রাজপরিবার প্রতিষ্ঠিত দল। ইংরেজের খেলা ফুটবলকে তারা গ্রহণ করেছিল নিছক আনন্দ সামগ্রী হিসেবে। তাই প্রয়োজন বোধে তার রূপান্তর করে নিতে তাদের যে-কোন আপত্তি ছিলনা তাই নয়, বরং তাকে বাঙালীর উপযুক্ত করে নেবার আগ্রহ ছিল প্রচুর। কিন্তু ন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষা ও জাতি গঠনের অঙ্গ হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন ফুটবলকে। কাজেই তার মধ্যে কোন পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেননি তিনি, বরং পরিবর্তনের বিরোধিতাই

করেছেন। ইংরেজের ফুটবলকে ইংরেজের মত করে খেলা উচিত, তাহলেই তাদের সঙ্গে একদিন সমানে সমান লড়াই করা সম্ভব হবে, এই ছিল তাঁর আদর্শ।

এর ফলে শোভাবাজার এবং ন্যাশনাল ভিন্ন পথে চলে। শোভাবাজার দল প্রতিষ্ঠায় দুবছরের মধ্যেই ময়দানের বর্তমান ভবানীপুর মাঠে এসে আড্ডা ফাঁদলে। তাদের মধ্যে বড় হল খেলা ও প্রতিযোগিতা এবং সোরগোল তুলে সবাইকে জানানো যে আমরাও খেলতে পারি, ইংরেজেরই মত। তাই সেকেলে খবরের কাগজে এই 'বাবুর' দলের খেলার খবর হামেশা দেখতে পাওয়া যেত। খেলা অবশ্য বেশীর ভাগই ছিল ফ্রেণ্ডলি। ড্যালহৌসী, হাওড়া বা নেভাল ভলান্টিয়ার্সের বিরুদ্ধেও খেলতো প্রায়ই। এমন কি ক্যালকাটা তখন যথেষ্ট ফুটবল না খেললেও, শোভাবাজারের সঙ্গে খেলেছে মাঝে মাঝে তার নজীর আছে। অবশ্য এ খেলায় বেশীর ভাগই হেরেছে শোভাবাজার। কিন্তু তাতে কি যায় আসে! খেলেছিল এইটেই বড় কথা। রাজপরিবারের রেওয়াজ ছিল রাজজাতির সঙ্গে সামাজিকতা করা, এবং সামাজিকতার এক নতুন ক্ষেত্র হিসেবেই সোৎসাহে ফুটবল খেলেছে শোভাবাজার। খেলেছে নিজেদের মতন করে। ভারতীয়েরা তখন পর্যন্ত ইংরেজের সামাজিক অনুষ্ঠানে ড্রেস স্যুট পরে যেতে সুরু করেনি, প্রাচীন দরবারী পোষাকেই গিয়েছে। নিজেদের ঘরে সাহেবদের ডাকলেও সেখানেও দেশী কায়দাতেই জাঁকজমক করেছে। ফুটবলের সামাজিক ক্ষেত্রেও তাই শোভাবাজার দেশীমতে শুধু পায়ে নামাল। শোভাবাজার দলে বুটপায়ে খেলোয়াড় ছিলনা তা নয়, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশী হয়নি।

ওদিকে ন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতাও পরিচালক মন্মথ বাবু ছিলেন আদর্শ-বাদী শিক্ষক। ফুটবলকে তিনি রিক্রিয়েশন বলে স্বীকার করলেও, তাকে হালকা মনে গ্রহণ করেননি তিনি। তাই তাঁর আখড়ায়

ফুটবলের জাতবদলের প্রশ্ন ওঠেনি, অর্থাৎ যথানিয়মে বুটপায়ে খেলা চলেছে সেখানে। তাছাড়া অনুশীলনের প্রয়োজনেই মন্মথ বাবু ম্যাচ খেলা সমর্থন করতেন, সামাজিকতার প্রয়োজনে বা প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে নয়। ইয়োরোপীয়ান সামরিক বা বে-সামরিক দলের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল গোড়ার দিকে বেশী ম্যাচ খেলেনি, যখন খেলেছে তা শিখবার আগ্রহ নিয়েই। একান্তনিষ্ঠ শিক্ষক সাধনায় বিশ্বাস করতেন, বিশ্বাস করতেন যোগ্যতা অর্জন করে তারপর কর্মক্ষেত্রে নামার নীতিতে, বিশ্বাস করতেন যতটা সম্ভব তার বেশী অতিলোভ করা অনুচিত।

শোভাবাজার এবং ন্যাশনাল একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ন্যাশনাল-ও বিশিষ্ঠ রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। তবু ন্যাশনাল গড়ের মাঠে আসে অনেক পরে এবং প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে তাদের দেখা যায় অনেক দেরিতে। শোভাবাজার প্রথম থেকে ট্রেডস কাপে এবং শীল্ডে খেলেছে। ন্যাশনাল একান্ত সাধনায় যে দিন নিজেদের যোগ্য মনে করেছে, তারপরে যোগ দিয়েছে প্রতিযোগিতায়। কিন্তু সাধনার বলে যোগ্য হয়ে যখন প্রতিযোগিতায় নামলে ন্যাশনাল, তখন তাদের পথ অপ্রতিহত। কুচবিহার কাপের দ্বিতীয় বছরে ১৮৯৪ সালেই ন্যাশনাল জয়ী হল। তারপর ১৮৯৭ সাল থেকে পর পর তিন বছর জিতলে। ১৯০৪ সালে মোহনবাগানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত কুচবিহার কাপ ছবার জেতে ন্যাশনাল। ১৯০০ সালে ন্যাশন্যাল-ই ট্রেডস কাপ জিতে সর্ব-প্রথম ভারতীয় দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে এবং আবার জেতে ১৯০২ সালে।

সাহেব ফিরিঙ্গীও গোরা-পল্টনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাঙালী দল জয়ী হবে এ কল্পনা সে দিন বাতুলের প্রলাপ বলেই উড়িয়ে দিত বিজ্ঞজন। কিন্তু সে ধারণা ন্যাশনাল চূর্ণ করে দিলে ১৯০০ সালে ট্রেডস কাপে জয় লাভ করে। ১৯১১ সালে আই. এফ. এ. শীল্ড জিতে মোহনবাগান যে অসাধ্য সাধন

করেছিল, ১৯০০ সালের ট্রেডস কাপে ন্যাশনালের জয় ছিল তারই প্রাথমিক পর্ব। ছোট হোক আর বড় হোক, 'এ'টিম 'বি'টিম যাই হোক, সাহেব দল-দের হারিয়ে বাঙালী যে প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত বিজয়ী হতে পারে, তার প্রথম প্রমাণ দিলে ন্যাশনাল। সে হিসেবে কলকাতার তথা ভারতীয় ফুটবলে ১৯০০ সালকে স্মরণীয় বছর বলতে হবে নিশ্চয়ই।

পক্ষান্তরে শোভাবাজার গোড়া থেকে ট্রেডস কাপ, আই. এফ. এ. শীল্ডে এবং কুচবিহার কাপে অংশ গ্রহণ করেও কোনটাতেই নাম খোদিত করতে পারে নি।

তবু বাঙালীকে ফুটবলে দীক্ষিত করায় শোভাবাজারের দান অসামান্য। রাজবাড়ির শখের ফুটবলে প্রতিযোগিতার মনোভাব ক্রমেই প্রসারিত হয়। উত্তর কলকাতার নিম্নে মধ্যবিত্ত যুবক দলে দলে এসে শোভাবাজার দলে ভেড়ে। শেষ পর্যন্ত রাজবাড়ির প্রভাবের চেয়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী মনের প্রভাবই সেখানেও বড় হয়ে ওঠে।

সে প্রভাব শিক্ষার নয়, চরিত্র গঠনেরও নয়। সেদিন বাঙালী সর্ব-সাধারণের মনের প্রধান আগ্রহ ছিল, ইংরেজের সঙ্গে সমান তালে লড়াই করবার একটা ক্ষেত্রে জুটিয়ে নেওয়া, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মত একটা বিষয় পেয়ে যাওয়া। প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়ার আশঙ্কা পৌণে ষোল আনা, তাহলেও লড়াই তো হবে, তারপর কে জানে হঠাৎ জিতে যদি যাই-ই, তা হলে!

যে সব বাঙালী যুবক তখন শোভাবাজারে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আগেই মনে পড়ে নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারীর নাম, স্যর দেবপ্রসাদের সহোদর। রাজবাড়ির সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল তাঁর। নগেন্দ্র প্রসাদ শুধু নিজেই খেলেছেন তা নয়, তাঁর প্রভাবে অনেক তরুণ শোভা-বাজারে যোগ দেয়। তা ছাড়া, নানা পাড়ার ছোট ছোট মাঠে এবং পার্কে

যুবক দল ফুটবল খেলতে শুরু করে সেই সময়। বস্তুত রাজবাড়ির শোভা-বাজার সাধারণের শোভাবাজার হয়ে গড়ে কয়েক বছরের মধ্যে এবং সাধারণ ক্লাবের মতই পরিচালিত হয়, রাজবাড়ির অধিকারের বাইরে, স্বাধীনভাবে। শুধু পায়ের শোভাবাজার যে পল্টনী দলের কাছে কোণঠাসা হত, ভালো খেলেও হেরে যেত, তার প্রমাণ ১৮৯৩ সালের ট্রেডস কাপে প্রথম রাউণ্ডের খেলায় ২১ম আর. এ র বিরুদ্ধে ওদের পরাজয়। স্টেটসম্যান পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী-বাবুর দলই সর্বসম্মতিক্রমে ভালো খেলে; কিন্তু মিলিটারীর গাজোয়ারী খেলায় বিব্রত হয়ে এক গোলে হেরে যায়।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যায় যে, প্রথম যুগে এখানে ফুটবলের নিয়ম ঠিক এখনকার মত ছিল না। ১৮৮৯ সালের ট্রেডস কাপের খেলার রিপোর্ট যা সে যুগের কাগজে পাওয়া যায়, তাতে দলগঠনের বর্ণনায় গোলকীপারের পরে তিনজন ¾ ব্যাক এবং তার পর দুজন ½ ব্যাকের উল্লেখ আছে। সর্বশেষে অবশ্য ফরোয়ার্ডস। এইভাবে স্থান উল্লেখ করে তার পরে খেলোয়াড়দের নাম উল্লেখ করা হত। ১৮৯২ সালের ট্রেডস কাপ সর্বপ্রথম ইংলণ্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের নিয়ম অনুসারে খেলা হয় এবং এই প্রতিযোগিতার রিপোর্টে দলগঠনের উল্লেখ দেখা যায় এখনকার মত; তবে স্থান উল্লেখ করা হত, তাও বাঁ দিক থেকে লেখা হত। যথা 'গোল', 'ব্যাকস'-দুজন, 'হাফব্যাকস' তিনজন, লেফ্‌ট উইং দুজন, সেণ্টার-একজন ও 'রাইট উইং' দুজন। কিন্তু এ যুগেও ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ আগের মত ¾ ব্যাক, এবং ½ ব্যাক এর উল্লেখ আছে। আবার এক এক রিপোর্টে গোলকীপার-এর জায়গায় উল্লেখ আছে 'ফুল ব্যাক'। অর্থাৎ ফরোয়ার্ডদের আগে তিনরকম ব্যাক-ফুল, ¾ ও ½। অনুমান করা যায় যে বিভিন্ন প্রচলিত মতেই খেলা চলতো। তবে এফ. এ. আইনে ট্রেডস কাপ সুরু হওয়ার পরে ক্রমে অন্য প্রথা লোপ পেয়ে যায়। বর্তমানে তিনজন ব্যাক এবং দুজন হাফ-ব্যাক খেলার যে

নবকৌশল পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে চলছে, সেটা তা হলে একেবারে উদ্ভট পদ্ধতি নয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগের পদ্ধতিরই নতুন, হয়ত বৈজ্ঞানিক সংস্করণ।

শোভাবাজারের পক্ষে প্রথম বছর ট্রেডস কাপ-এ যাঁরা খেলেছিলন, তাঁরা হলেন—গোল—গ্যালিকট (Gollycott), ¾ ব্যাক—কালী মিত্র, মতিলাল শীল ও দাস; ½ ব্যাক-এস দাস ও চৌধুরী; ফরোয়ার্ডস-ডি দাস, এন সর্বাধিকারী, ইউ. ব্যানার্জী, এম. বীদ ও মিত্র।

আই. এফ. এ. শীল্ডের প্রথম খেলার রিপোর্টে শোভাবাজার দলের মাত্র আট জনের নাম পাওয়া যায়ঃ ডি. এন. চৌধুরী; মতিলাল ও বি সর্বাধিকারী; এম. দাস, কালী মিত্র ও এ. পাল; ইউ. ব্যানার্জি, ডি. দাস ও আর তিন জন।

শোভাবাজারের শ্রেষ্ঠ দল যদি ধরতে হয় আগে পরের খেলোয়াড় নিয়ে, তা হলে অতি প্রাচীনদের মতে তা এ ভাবে দাঁড়ায়ঃ স্বরপতি মুখার্জি; কালী মুখার্জি; ও কালী মিত্র; এম. দাস, মতি শীল ও চৌধুরী; ডি. দাস, নগেন সর্বাধিকারী, ইউ. ব্যানার্জি, এম. বীদ ও জে. মিত্র।

এই স্বরপতি মুখার্জি এই শতকের দ্বিতীয় দশকেও খেলেছেন। অনেকের মতে তিনিই সে যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী গোলকীপার ছিলেন। একবার একলা তাঁরই জোরে মোহনবাগানের সঙ্গে তিন দিন ড্র করেছিল শোভাবাজার ১৯১৪ সালের আই. এফ. এ. শীল্ডে।

এই দীর্ঘ ঐতিহ্যের জোরেই ১৯১৫ সালে দ্বিতীয় বিভাগ লীগে মোহনবাগানের শূন্য স্থানে শোভাবাজারকে ঠাঁই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তখন তাদের কি-ই বা বাকী আছে! প্রথমবার তারা ১৬টা খেলায় ১৬ পয়েন্ট পেয়ে নটি দলের মধ্যে পঞ্চম স্থান পায়। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্থান করতে করতে ১৯১৯ সালে ওরা সপ্তমে নেমে যায়, পায় মাত্র আট পয়েন্ট। দুবছর বাদে তালিকার নিম্নতম স্থানে নেমে পড়ার পর তারা লীগ খেলার অধিকার

হারিয়ে ফেলে। এর পর আর বাস্তব পক্ষে শোভাবাজারের কোন অস্তিত্ব থাকে না। তবে আই. এফ. এ-র নথীতে তাদের নাম থাকে আরও তিন বছর। তার পর ১৯২৪ সালে সে জীবনেও যবনিকাপতন ঘটে।

প্রথম যুগে একমাত্র শোভাবাজার-ই সাহেব দলগুলির সঙ্গে নিয়মিত খেলতে নামায় সে যুগে বাঙালী সাধারণে ফুটবলের উৎসাহ ও উদ্দীপনা তাদের কেন্দ্র করেই দানা বাঁধে। তাদের খেলায় সে দিনের দর্শক সংখ্যা আজকের তুলনায় যাই হোক না কেন, সেকালের রিপোর্টারের দৃষ্টিতে তা বিরাট নেটিভ দর্শক সংখ্যা বলেই প্রতিভাত হয়েছে। শোভাবাজারের জনপ্রিয়তায় যে ক্ষীণ ধারার উদ্ভব হয়েছিল, ক্রমে ন্যাশনাল, মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল বেয়ে তা প্রবলতর এবং প্রশস্ততর হতে হতে, আজ তা মহাসাগরে পরিণত হয়েছে।

লথার মাঠে যখন ন্যাশানাল খেলতো, শুধু বল খেলাই তাদের লক্ষ্য ছিল না। এই সাধনার সঙ্গে শক্তি সাধনাও করতে হত। তাদের খেলোয়াড় নন্দকিশোর খানায় পড়ে যাওয়া মোটর গাড়ী টেনে তুলেছিল এমন কথাও চলিত আছে।

দক্ষিণ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল অচিরে ভূকৈলাসের রাজ-পরিবারকে আকৃষ্ট করে এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রমে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। তবে বাইরের লোক এসে শোভাবাজারকে যেমন পালটে দিয়েছিল, ন্যাশনালের বেলায় তা ঘটেনি। ন্যাশনালের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই বুট পরে খেলেছে শেষের যুগ পর্যন্ত। এমন কি, মোহনবাগানের সুধীর চ্যাটার্জী যখন আগে শুধু পায়ে খেলতে অভ্যস্ত ছিলেন ন্যাশনালে, তখন সে দলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্র নাথ তাঁকে বুট পরতে প্ররোচিত করেন। ১৯০০ সালের ট্রেডস কাপ বিজয়ী ন্যাশনাল দলের যে

ফটো আছে, তার মধ্যে প্রথম সারিতে বসা সবাই বুট পায়ে, আর পিছনের সারির পা অদৃশ্য।

ন্যাশনাল ক্লাব যখন ময়দানে বর্তমান মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মাঠে এসে গেছে র‍্যালি ব্রাদার্স ক্লাবের অংশীদার হিসেবে, সেই সময় ১৮৯৫-৯৬ সালে ফোর্ট উইলিয়ামে ছিল শ্রফশায়ার লাইট ইনফ্যান্ট্রি। ফুটবলে তারা খুব পোক্ত ছিল, দুবারই আই. এফ. এ, শীল্ডে রানার্স-আপ হয়। সেই শ্রফশায়ারের খেলোয়াড়েরা ন্যাশনালের সঙ্গে হামেশা খেলতো, কখনো কেল্লায় ডেকে নিয়ে, কখনো বা ওদের মাঠে এসে। শ্রফশায়ারের সঙ্গে খেলার সুযোগ সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল ন্যাশনাল, তাদের কৌশল শিখবার চেষ্টা করে। এর পর থেকেই ন্যাশনালের জয়যাত্রা সুরু।

মন্মথবাবুর প্রচেষ্টায় এবং অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদের আনুকূল্যে তখনকার অনেক অধ্যাপক শিক্ষাবিদ এবং অবাঙালী এমন কি অভারতীয় সর্ব্বজনের সহযোগিতা লাভ করে ন্যাশনাল। বঙ্গবাসী কলেজের তখনকার অধ্যাপক হুইলার, যিনি পরে বিশপ্‌স কলেজে অধ্যাপনা করে শেষ জীবনে বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং যাঁর নামে বহরমপুরের হুইলার শীল্ড খেলা হয়ে থাকে, তিনি নিজে খেলেছেন ন্যাশনালে। আর খেলেছেন সি. এম. এস. (বর্তমানে সেণ্ট পলস) কলেজের লজিকের অধ্যাপক জোসেফ অরুলান্থম। এই দক্ষিণ ভারতীয় অধ্যাপকের যোগসূত্রেই সি. এম. এস. কলেজের ছাত্র প্রফুল্ল বিশ্বাস ন্যাশনালে যোগ দেন।

বাঙলার খেলাধূলার ইতিহাসে এই প্রফুল্লবাবুর স্থান অবিনশ্বর। ফুটবলে তাঁর মত ডিফেন্স খেলোয়াড় সে যুগে কেউ ছিলনা এবং আজকের বিচারেও তাঁকে কলকাতা ফুটবলের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাক এবং হাফব্যাক বলা যেতে পারে। তিনিই ছিলেন প্রথম বাঙালী এথলেট, শুধু এথলেট বলেই নয়, ফিরিঙ্গীদের মেরে বহু বিষয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন।

এথলেটিকসের দৌড়বীর পি. কে. বিশ্বাস ব্যাক হিসেবে যে-কোন ফরোয়ার্ডের মত ছুটতে পারতেন। ফলে মাঝ-মাঠ পেরিয়ে গিয়েও আবার ঠিক সময়ে প্রয়োজন বোধে বিপক্ষের আক্রমণ ঠেকাতে পিছিয়ে আসতে পারতেন অত্যন্ত সহজে। বাস্কেটবল, ভলিবল, সাঁতার এবং মুষ্টিযুদ্ধেও তিনি বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম। শুধু নিজে করেই ক্ষান্ত হননি। ওয়াই. এম. সি. এ. এবং বিভিন্ন কলেজের মাধ্যমে অনেক তরুণকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। বস্তুত প্রফুল্ল বাবুর জীবন কথাই বাঙালীর খেলাধূলার ইতিহাসের এক প্রধান অধ্যায়। প্রফুল্লবাবু এখনও জীবিত বটে, কিন্তু একেবারেই বিস্মৃত।

প্রফুল্লবাবু প্রথমে হাফব্যাক খেলতেন, পরে ব্যাকে পিছিয়ে আসেন। প্রফুল্লবাবুর সঙ্গে ব্যাকে খেলতেন প্রথমে ভূকৈলাস রাজপরিবারের সত্যধেনু ঘোষাল। ধেনুবাবুর পরে কিছুদিন খেলেন সুধীর চ্যাটার্জী এবং তারও পরে অরুণ সিং, বর্তমানে যিনি লর্ড সিংহ। আরও ছিল দুই ইহুদী, আরাকি এবং তার ভাই। ভূকৈলাসের অনেকেই খেলেছেন ন্যাশনালে।

ধেনুবাবু ছাড়া সত্যমোহন বাবুও যথেষ্ঠ নাম করেছিলেন। এ ছাড়াও ন্যাশনালের গৌরবে বাঙালী ফুটবলের গৌরব গড়ে তুলতে আর যাঁরা সাহায্য করেছিলেন, তাঁরা হলেন—গোলে রাধু কর্মকার ও বঙ্কিম মুখার্জী; ব্যাকে বজ্র মুখার্জী ও নন্দকিশোর, হাফব্যাকে প্রফুল্ল রায় ও ডোঙ্গাবাবু। প্রফুল্ল রায় এবং ডোঙ্গা দত্ত দুজনেই পরে মোহনবাগানে খেলেছেন। তবে ন্যাশনালের প্রধান শক্তি ছিল ফরোয়ার্ডে। সে দলে ছিলেন গোবর মুখার্জী, ক্ষেত্র মিত্র, হরি চ্যাটার্জী, অধ্যাপক হুইলার ও হারাণ পলসাই। এই দুর্ধর্ষ পঞ্চক তখনকার গোরা দলগুলিকেও হিমসিম খাইয়ে দিয়েছে। ১৮৮৯ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে খাঁটি স্বদেশী ট্রেডস-বিজয়ী দল বলতে শুধু মোহনবাগান আর ন্যাশনাল। প্রথম দশ বছরে কুচবিহার কাপ ওরাই জেতে ছবার। ১৯১২ সালে শেষবার ট্রেডস কাপ পায়। এর পরই ন্যাশনাল দুর্বল হয়ে

পড়ে। ১৯১৫ সালে মোহনবাগান এসে তাদের মাঠ দখল করে। ন্যাশনালের অবশ্য মাঠই ছিল, নিজস্ব তাঁবু তারা তৈরী করেনি। র‍্যালি ব্রাদার্স ক্লাবের তাঁবু ব্যবহার করেছে। ১৯২৪ সালে শোভাবাজারের সঙ্গে একসঙ্গে আই. এফ. এ-র সদস্য তালিকা থেকে ন্যাশনালের নাম কাটা যায়।

শোভাবাজার এবং ন্যাশনালের প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তা যথেষ্ট থাকলেও যে স্বদেশী দল সবার আগে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে সার্থকতা প্রতিষ্ঠা করে, তারা কোন বাঙালী মধ্যবিত্ত দল নয়। তারা ফোর্ট উইলিয়ামের স্থায়ী বে-সামরিক কর্মচারীদের দল—ফোর্ট উইলিয়ম আর্সেনাল। সেদলে বেশীর ভাগই ছিল অ-বাঙ্গালী। প্রচলিত সমাজ বিভাগ মতে ভদ্রলোক বলে যে শ্রেণীকে মার্কা মেরে দেওয়া হয়, তারা সে দলে পড়তো না। ফোর্ট উইলি-য়াম-এ বরাবর চাকরী করার ফলে পল্টনগুলির খেলা দেখবার সুযোগ পেত ওরা। খেলার আগ্রহে পল্টনীরা ওদের ডেকে নিয়েও খেলেছে মাঝে মাঝে।

প্রথম বছর কুচবিহার কাপ জেতে ঐ ফোর্ট উইলিয়াম আর্সেনাল। অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে সর্বপ্রথম বিজয়ীর মর্যাদাপ্রাপ্ত ভারতীয় দল ওরাই। একবারই নয়। দ্বিতীয় বছর ন্যাশনালের জয়লাভের পরে তৃতীয় এবং চতুর্থ বছরে আবার জেতে ওই আর্সেনাল। আর্সেনাল দল বেশীদিন স্থায়ী হয়নি, তাদের সার্থকতাও এই তিন বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবু তাদের নাম কলকাতার ফুটবল থেকে কোন দিন মুছে যাবার নয়।

এই সময় আরও অনেক দল গজিয়ে ওঠে। ন্যাশনাল এবং শোভাবাজারের সোরগোল ও শক্তিমত্তার পাশে পাশে চুপেচাপেই চলছিল কুমারটুলি এবং টাউন ক্লাব। শোভাবাজার কোন প্রতিযোগিতা জিততে না পারলেও,

তাদেরই জন কয়েক সরে গিয়ে যে হেয়ার স্পোর্টিং গড়েছিল, তারা কিন্তু কুচবিহার কাপ জিতে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলে ১৯০০ সালে। এই সময় চুঁচুড়া স্পোর্টিংও কলকাতা ফুটবলে বেশ কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেছিল।

শোভাবাজার, ন্যাশনাল, ফোর্ট উইলিয়ম আর্সেনাল যখন ভারতীয়দের ফুটবলের কারসাজিতে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, সেই সময় স্বদেশী ফুটবলের ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে কলেজী ফুটবলের মাধ্যমে। যদিও শিবপুর বি. ই. কলেজ এবং মেডিকেল কলেজ ইয়োরোপীয়ান দল, তবু দু একজন করে বাঙালী খেলোয়াড়ও সে সব দলে ঠাঁই পেয়ে গেছে এতদিনে। যেদিন থেকে ট্রেডস গৌণ প্রতিযোগিতা বলে চিহ্নিত হল, সেদিনই কলেজী দলগুলির আধিপত্য সুরু হল তাতে। প্রথম বছর অর্থাৎ ১৮৯৩ সালে সেণ্ট জেভিয়ার্স এবং তারপর মেডিকেল ও শিবপুর কলেজেরই চলে জয়-জয়কার। শিবপুর জয়ী হয় তিনবার, মেডিকেল চারবার। জামালপুরের রেলওয়ে- এ্যাপ্রেন্টিসদের ফিরিঙ্গী ক্লাব জয়ী হয় দুবার এবং আসানসোলের রেলদল জেতে একবার।

এদেশী ছাত্রেরা ট্রেডস্ কাপে পাত্তা না পেলেও, ভারতীয় কলেজীদের জন্য আই. এফ. এ. যে এলিয়ট শীল্ড প্রবর্ত্তন করে ১৮৯৪ সালে, তার ভিতর দিয়েও ফুটবল খেলা তখন ছড়িয়ে পড়ছে। অধিকাংশ বাঙালী ছাত্র নিয়ে গড়া বিশপস্ কলেজই প্রথম যুগে এলিয়ট শীল্ডে আধিপত্য করেছে পর পর পাঁচ বছর জিতে। সি. এম. এস. জয়ী হয় তিন বছর। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজ পর পর পাঁচবার, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ পর পর তিনবার এবং সর্ব্বশেষ মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন যখন পর পর দু'বার জেতে (১৯১৬-১৭), ততদিনে বাঙালী ছাত্রসমাজ ফুটবলের রসে পুরোপুরি অভিষিক্ত হয়ে গেছে।

কলেজে কলেজে খেলা সুরু হয়ে গেছে অনেক আগেই। কিন্তু কলেজের খেলা তো কিছুদিনের ব্যাপার। তারপর যায় কোথায় ছেলেরা? মন যখন মজেছে, তখন রসের সন্ধানে তারা ফিরবেই। রসসন্ধানী উত্তর কলকাতার ছাত্র সমাজ এই সময় পেয়ে গেল বাঙালী ফুটবল গুরু দুখীরাম মজুমদারকে বড়দা হিসেবে। দুখীরাম বাবুর সর্দারীতে তখন ক্লাব তৈরী হল স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন। সে ক্লাব কবে পত্তন হয়েছে তার কোন হিসেব নেই, তবে ১৮৮৭-৮৮ সালে তারা মোহনবাগানের মাঠে ফুটবল খেলত, এমন কথা আমি দুখীরাম বাবুর মুখেই শুনেছি।

উত্তর কলকাতার যে পল্লীকে এখন মোহনবাগান রো বলা হয় (বর্ত্তমান দর্পণা সিনেমার পূবদিকে) সেখানকার 'মোহনবাগান ভিলা' নামে বাড়ীর মাঠেই ছিল স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের ফুটবল খেলার আখড়া। পল্লীর কাছা-কাছি 'বিপ্রকুটির'-এর দ্বিজদাস ও রামদাস ভাতুড়ীও সোৎসাহে যোগ দেন সে দলে। আরও এসে যোগ দিল ট্রামরাস্তার পশ্চিম দিক থেকে ভূপেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীর ছেলেরা।

নিজেদেরই মধ্যে সোৎসাহে খেলা চলছে দল ভাগ করে। এ পাড়া ও পাড়া, এ কলেজ, ও স্কুল—সবাইকে ডেকে এনে ম্যাচ-ও খেলছে ওরা। কে জানে কি মতভেদের ফলে দুখীরাম বাবু চলে এলেন সে মাঠ ছেড়ে, শ্যামপুকুর লাহাদের মাঠে এসে এরিয়ান ক্লাব পত্তন করলেন। আর একদল চলে গেল বাগবাজারের সেন পরিবারের নেতৃত্বে বর্ত্তমান শ্যামস্কোয়ার যেখানে সেই মাঠে, বাগবাজার ক্লাব বলে খেলা সুরু করলে। যারা থেকে গেল, তারা বসু পরিবারের নেতৃত্বে 'মোহনবাগান ভিলা'-য় নিজেদের ক্লাব তৈরী করলে পাকাপাকিভাবে, নাম দিলে মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাব। তখনকার জননায়ক ও পল্লী-প্রতিবেশী ভূপেন্দ্রনাথ বসু হলেন সভাপতি এবং তাঁর ভাইপো তরুণ এটর্ণী যতীন্দ্রনাথ বসু হলেন সম্পাদক।

অতবড় লোক যে ক্লাবের মাথা, তার পক্ষে অন্যান্য ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তির পোষকতা লাভে বিলম্ব হল না। প্রথম বছরে তাদের প্রধান ম্যাচ হল ইডেন হিন্দু হস্টেলের সঙ্গে। সে খেলায় যারা মোহনবাগানের পক্ষে খেলেছিল, তাদের মধ্যে এম. এন. বসু (ক্লাবের সভাপতি এবং কিছুদিন আগে পর্যন্ত আর. জি. কর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ) ও মনোমোহন পাঁড়ে (পরবর্ত্তীকালে থিয়েটারের মালিক হিসাবে প্রখ্যাত) উল্লেখযোগ্য।

ক্লাবের প্রথম বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করতে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক বৈয়াকরণ এফ. জে. রো সাহেব জানতে চাইলেন যে মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাবের কর্মসূচীর মধ্যে মাছ-ধরা, পশু-শীকার ইত্যাদি আছে কি না। যখন জানলেন যে এ সব স্পোর্ট কিছুই করে না মোহনবাগান-এর ছেলেরা, তখন ভাষাবিদ পণ্ডিত জানালেন যে ক্লাবকে স্পোর্টিং ক্লাব না বলে এথলেটিক ক্লাব বলাই উচিত। অবিলম্বে ক্লাবের নাম বদলে মোহনবাগান এ. সি. হয়ে গেল।

দুবছর 'মোহনবাগান ভিলা'য় কাটতে না কাটতে মনে হল, আর একটা বড়-সড় খোলা মাঠ নইলে আর চলছে না। ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক রাজা দুর্গাদাস লাহা এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হ্যারি লী-র প্রভাবে শ্যামপুকুর-এর মাঠের দখল পেয়ে গেল মোহনবাগান। দুখীরাম বাবু তাঁর এরিয়ান ক্লাব নিয়ে চলে গেলেন শ্যাম পার্কে, বাগবাজারের সঙ্গে মিলে মিশে খেলতে লাগলেন। এরপর শ্যাম পার্ক যখন পাকাপাকি শ্যাম স্কোয়ার হল, তখন মোহনবাগানও চলে এল সেখানে, বাগবাজার এবং এরিয়ান্সের ভাগীদার হল।

শ্যাম স্কোয়ারে এসে মোহনবাগান একটু উঁচুতে হাত বাড়িয়েছে। অর্থাৎ এরিয়ান্স, বাগবাজার, ইডেন হিন্দু হস্টেল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়াও, শোভাবাজার, ন্যাশনাল, মেডিকেল কলেজ, শিবপুর কলেজ, সেণ্ট

জোসেফ্‌স্‌ কলেজ, টাউন ক্লাব এবং ফোর্ট উইলিয়াম আর্সেনালের সঙ্গে খেলতে সুরু করেছে ; অবশ্য সবই ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ। শুধু তাই নয়, গোরা-পল্টনী দল 'সি' কোম্পানি সাসেক্স রেজিমেণ্টের সঙ্গে পর্যন্ত খেলে ফেললে একবার। আর আই. এফ. এ. শীল্ডের সঙ্গে সঙ্গে যখন কুচবিহার কাপের পত্তন হল, তাতে যোগ দিতেও দেরী করলে না। ট্রেড্‌স্‌ কাপে তো যোগ দিলেই।

গোড়া থেকেই মোহনবাগান শোভাবাজারের আদর্শে শুধু পায়ে খেলতে লাগলো। বুটের প্রশ্ন মনেও জাগেনি কারো কোন দিন। বাঙালীর স্বাভাবিক উদ্ভাবনী শিল্পমনীষায় ফুটবল জগতে নব কৌশলের প্রবর্তন আগেই হয়েছিল, কিন্তু প্রসার হল মোহনবাগানের মাধ্যমে।

দল যেমন পুষ্ট হচ্ছে, ওজনও বাড়ছে। উত্তর কলকাতায় বনেদী পরিবারের সংখ্যা অঢেল। ক্রমে অনেকেই মোহনবাগানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়লো। এমন কি দক্ষিণ কলিকাতাবাসী কুচবিহারাধিপ পর্যন্ত মোহনবাগান সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করলেন।

এই অবস্থায় কতদিন আর পড়ে থাকা যায় পাড়ার ছোট পার্কে! শোভাবাজার, ন্যাশনাল ও টাউন ক্লাবের মত মোহনবাগানকেও ময়দানে ঘাঁটি করতে হয়। তাই ১৯০০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের ভাগীদার হয়ে বর্তমান বঙ্গবাসী-আশুতোষ কলেজ মাঠে (এরিয়ান্স-মহামেডান স্পোর্টিং মাঠের পশ্চিমে) আড্ডা ফাঁদলে মোহনবাগান। প্রেসিডেন্সি কলেজের তাঁবু ব্যবহার করতে লাগল।

নতুন নতুন খেলোয়াড়ের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। এই যুগে যারা মোহনবাগানের খেলোয়াড় ছিল, তাদের মধ্যে নাম করার মত: গোলকীপার-প্রবোধ দাস (বাঘা), ব্যাক-ডাঃ গিরীশ ঘোষ ও অন্নদা দাস ; হাফব্যাক-প্রফুল্ল রায়, ডোঙ্গা দত্ত, ক্ষিতীশ সিংহ, ভোলা ঘোষ ও অনাথ দাস ; আর

ফরোয়ার্ডে রয়েছে ভাতুড়ীরা চারভাই—রামদাস, দ্বিজদাস, বিজয়দাস, ও শিবদাস, এবং অর্ধেন্দু ও দ্বিজেন বসু।

এখন আর শোভাবাজার, হেয়ার স্পোর্টিং, টাউন ক্লাবে মন ভরছে না। কর্ণকে প্রতিদ্বন্দ্বী না পেলে কি আর রথী অর্জ্জুনের যুদ্ধসাধ মিটতো ? তাই মোহনবাগানের মনের মত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলো ন্যাশনাল।

কলকাতা ফুটবলে একটা কেশরী-মাতঙ্গ সংঘর্ষের নিয়মিত ব্যবস্থা সুরু হল এই থেকে। প্রথম যুগে চললো মোহনবাগান-ন্যাশনাল সংগ্রাম। পরের যুগে সে স্থান নিলে মোহনবাগান-ক্যালকাটার খেলা। ক্যালকাটা'র গৌরব লোপ পেতে মোহনবাগান-মহামেডান স্পোর্টিং-এর খেলাই বছরের সেরা খেলা বলে গণ্য হতে লাগলো। আর এই রাম-রাবণ সংগ্রামের বিবর্তিত বর্তমান রূপ হল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল সংঘর্ষ। বিভিন্ন যুগের এই মহাসংগ্রামে কে কটা জিতেছে সে প্রশ্ন অবান্তর। কোন দল লীগে কোথায় আছে (ন্যাশনালের যুগে অবশ্য লীগ ছিল না), কিছু যায় আসে না তাতে। কোন দলের শক্তি ঠিক সে সময় কতটা, তা নিয়েও মাথা ঘামায়নি কেউ কোনদিন। এরা দুদল যখনই পরস্পর সম্মুখীন হয়েছে, তখনই লোকে ক্ষেপে গিয়েছে সে সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করবার জন্য। যারা দূরে সরে থেকেছে তারাও পরম উৎকণ্ঠা নিয়ে ফলাফলের প্রতীক্ষা করেছে। আগ্রহ অকারণ নয়। যে কোন অবস্থায় মরীয়া হয়ে জীবন-মরণ সংগ্রাম করেছে দুপক্ষই।

প্রথম যুগে ন্যাশনালের বিরুদ্ধে মোহনবাগানেরই পরাজয় ঘটেছে বার বার, কি ফ্রেণ্ডলি ম্যাচে, কি কুচবিহার কাপে, কি ট্রেডসের খেলায়। কিন্তু চিরদিন কখনও সমান যায় না, আর সাধনা এবং একান্ত সাধনাও ব্যর্থ হবার নয়। তাই সিদ্ধিলাভ করলে মোহনবাগান। শুধু সিদ্ধি নয়, একেবারে পরমা সিদ্ধি। কারণ ১৯০৪ ও ১৯০৫ সালে পর পর দুবছর জিতলে কুচবিহার কাপ।

এই সিদ্ধির আনন্দ অপরাসীম হ'লেও শুধু দেশী দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বা ট্রেডস কাপে যতসব 'বি' টিমকে ঘায়েল করে মন তৃপ্ত হয় না। চাই সিংহ শিকার। তাই সিংহের পিছু ধাওয়া করলে মোহনবাগান। সিংহের পিছু ধাওয়া করে যেতে আই. এফ. এ. শীল্ড-এর সদর রাস্তা ধরা এত সহজ ছিলনা। আঘাটার পথেই চলতে হ'ল, আর সে পথেই আচমকা দেখা দিলেন সিংহ মশাই।

১৯০৫ সালে চুঁচুড়ায় গ্লাডস্টোন কাপের ফাইনাল খেলবে মোহনবাগান। অপর দিকে আছে ড্যালহৌসী, সেবারই যারা আই. এফ. এ. শীল্ড জিতেছে ক্যালকাটাকে ৪—৩ গোলে ঘায়েল করে। কিন্তু মফস্বলের প্রতিযোগিতায় বাবুর দলের সঙ্গে যে সর্বশক্তি নিয়ে আসবে শীল্ডবিজয়ী ড্যালহৌসী, এমন কল্পনাও করেনি মোহনবাগান। চমক ভাঙ্গলো যখন শিয়ালদা থেকে নৈহাটি হয়ে চুঁচুড়া যাবার ট্রেনে দেখা গেল ড্যালহৌসীর সাতজন সেরা খেলোয়াড়। ফুটবল-সেক্রেটারী শৈলেন বাবু জিজ্ঞাসা করলেন সাহেবদের, তোমাদের আর সবাই কোথায়? উদ্দেশ্য পুরো দলটির হদিশ পাওয়া গেলে ভয়-ভরসা দরকার মত জলাঞ্জলি দেওয়া যাবে। কিন্তু বাবুদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করবার সুযোগ ছাড়বে কেন সাহেবরা? সাফ জবাব করলে, মোহনবাগানের সঙ্গে খেলতে সাতজনের বেশী দরকার হয়না আমাদের।

চুপ মেরে গেল সবাই, অধিনায়ক রামদাস ভাদুড়ী পর্যন্ত। বড়দাকে বলা না গেলেও কনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন শিবদাস বিজয়দাসকে বললে—দের দেমাক দেখেছিস? নো ফিয়ার। দেখাই যাকনা বাছাধনদের তেলানি কতদূর।

মাঠে নেমে যখন দেখা গেল ড্যালহৌসীদলে শীল্ড-বিজয়ী এগার জনই হাজির, মায় প্রাইক পর্যন্ত, তখন মন খারাপ হয়ে গেল সবার। তবে তাই থেকে এলো প্রতিজ্ঞা। শিবদাস আর আর ফরোয়ার্ডদের জানিয়ে দিলে,

দাঁড়াবার আগেই ওদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে হবে। ঘুঘু দেখেছে, এবার ফাঁদ দেখিয়ে ছেড়ে দিতে হবে বাছাধনদের।

যেই কথা সেই কাজ। রেফারীর বাঁশিতে চলার হুকুম বাজতে না বাজতেই শিবদাস বল টেনে নিয়ে ছুট দিলে। তারপর কি হল, না বুঝলে ড্যালহৌসী, না বুঝলো আর কেউ। বল গিয়ে জমলো একেবারে ড্যালহৌসীর গোলের কোণে। মিনিট তিনেকের মধ্যে ডোম্বা দত্ত বল ঠেলে দিলে শিবদাসকে। এবারও ড্যালহৌসীর ব্যাক হাফব্যাক গোলকীপার বোকার মত চেয়ে দেখলে, বল গোলের মধ্যে ঢুকে গেছে। এরপর মোহনবাগানের প্রত্যেকের দেহে মনে তিন গুণ বল। ড্যালহৌসী নয় ছয়। শেষের বাঁশি যখন বাজলো, ৬—১ গোলে এগিয়ে আছে মোহনবাগান। ড্যাং ড্যাং করে বগল বাজিয়ে আর উদ্ধত ড্যালহৌসীর লাল মুখ আরও লাল করে দিয়ে কলা দেখাতে দেখাতে ফিরে এলো মোহনবাগান কলকাতায়, গ্ল্যাডস্টোন কাপ নাচাতে নাচাতে।

পরের বছর যখন ট্রেডস কাপ জিতলে মোহনবাগান, গ্ল্যাডস্টোন কাপও ফের জিতে আনলে, সাহেবসুবোরাও বুঝলে, শোভাবাজার এবং ন্যাশনাল পুরানো এবং বড় ক্লাব হলেও, তরুণ মোহনবাগানই এখন বীরশ্রেষ্ঠ।

পরের জানুয়ারীতে মিণ্টোফিট প্রতিযোগিতায় খেলবার জন্য একমাত্র ভারতীয় দল হিসেবে যখন মোহনবাগানের ডাক পড়লো, সে খেলা পড়বি তো পড় একেবারে ক্যালকাটার সঙ্গে। পর পর কবছর আই. এফ. এ. শীল্ড জিতেছে ক্যালকাটা। শুধু একবারই যা ফাইনালে বে-টপ্‌কা হেরে গেছে. ড্যালহৌসীর কাছে। শুধু তাই নয়, অকালে খেলা। ভেটিরিনারি ইন্‌স্‌পেক্টার শিবদাস ভাদুড়ী চাক্‌রীর কাজে আসামে আছে। ব্যাক সুকুল আছে কাশীতে, সেও আসতে পারছেনা। কি করা যায়? অগত্যা বিজয় ভাদুড়ী গেলেন প্রফুল্ল বাবুর কাছে। বললেন, হলেই বা ভাই তুমি

ন্যাশনালের খেলোয়াড়, এতো বাঙালীর মান রক্ষার প্রশ্ন। আর আই. এফ. এ-র নিয়মিত প্রতিযোগিতা এ নয়। বিশ্বাস মশাই রাজী হয়ে গেলেন।

ক্যালকাটা মাঠে কলকাতা ও আশপাশের সমগ্র ইয়োরোপীয়ান ও ফিরিঙ্গী সমাজ এবং রাজভক্ত ভারতীয় মহাপুরুষরা লেডি মিণ্টোর ফাণ্ডের পোষকতা করতে জমা হয়েছে। সাধারণ ফুটবল ভক্তরাও আসেনি তা নয়। প্রাণ দিয়ে খেলছে মোহনবাগান। শিবদাস নেই, মনের জোর তাই কম। ওদিকে ক্যালকাটার পক্ষে সেবারের শীল্ড বিজয়ী এগার জন।

তবু লড়াই চলছে সেয়ানে সেয়ানে। কোন পক্ষে গোল হলনা সারা-ক্ষণের খেলায়। অতিরিক্ত সময়ের শেষ মুহূর্তে বিজয়দাস পায়ের কায়দায় বল কাটাতে কাটাতে ঢুকে পড়লো গোলে। ডড্স্ ছুটে বেরিয়েছিল, পা থেকে ছোঁ মেরে কেড়ে নেবে বলটা। কিন্তু এপাশ ওপাশ ক্যাংরানি মেরে বিজয়দাস বোকা বানিয়ে দিলে তাকে। সাহেব দর্শকদের মধ্যে অনেকেই স্পোর্টসম্যানশিপ দেখিয়ে পরিমিত হাততালি দিলে। বাঙালী দর্শকদের ইংরেজভক্তি ভেসে গেল স্বজাতিপ্রীতির বন্যায়।

এই জয়লাভ কার্যকরী হয়নি। কেন, তা ক্যালকাটা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। কিন্তু ক্যালকাটার মূলদলকে পরাজিত করে যে আত্মবিশ্বাস অর্জন করলে মোহনবাগান, তারই জোরে উত্তুঙ্গ শৈলচূড়ায় হাত বাড়াবার উচ্চাকাঙ্খা জাগলো ওদের মনে। আর প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং খেলার তীব্র বৈরিতা সত্বেও মোহনবাগান এবং ক্যালকাটার মধ্যে যে পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব চিরদিন বজায় থেকেছে, তারও প্রথম প্রকাশ হল এই মিণ্টোফিটের পরিস্থিতিতে।

এর পরের দুবছরও ট্রেডস কাপ জিতলে মোহনবাগান। উপর্যুপরি তৃতীয়বার এই প্রতিযোগিতা আর কেউ জিততে পারেনি এর আগে।

১৯০৬ সালের ব্যর্থতায় পর পর চতুর্থবার কুচবিহার কাপ জিতে ন্যাশনালের তিনবারের রেকর্ড ভাঙ্গা সম্ভব হয়নি। সে দুঃখ দূর হল ট্রেডস কাপের জয়গৌরবে।

এবার তাহলে ভরসা করে আই. এফ. এ. শীল্ডে নাম দেওয়া যেতে পারে। শোভাবাজার, টাউন ক্লাব, চুঁচুড়া স্পোর্টিং, হেয়ার স্পোর্টিং-এরা না হয় কিছুই করতে পারেনি শীল্ডে, কিন্তু তারাতো কেউ ক্যালকাটা ড্যালহৌসীর পয়লা দলকে হারাতে পারেনি।

১৯০৮ সালেই শীল্ডের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো মোহনবাগান। প্রথম খেলা পড়লো শক্তিশালী ইয়োরোপীয়ান দল ওয়াই. এম. সি. এ র সঙ্গে। তাদের হারাতে বেশী বেগ পেতে হ'ল না। কিন্তু পরের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স। ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে রেঞ্জার্স মাঠে গোরাদল তিন গোলে হারিয়ে দিলে মোহনবাগানকে।

প্রবলের প্রতি ঈর্ষা বা মোহনবাগানের সঙ্গে অপরাপর প্রধান দলের বৈরভাব আজকের দিনের বৈশিষ্ঠ্য কিছু নয়। অন্যান্য বাঙালী ক্লাবরা বলতে লাগলো, কেমন? যা রয় তাই সয়। ছাপা কাগজও বার হল 'বামন হয়ে চাঁদে হাত' বলে শ্লেষাত্মক রসের ছড়া।

মোহনবাগান বুঝেছে যে জলামাঠে বুটওয়ালা ভারিদলের বিরুদ্ধে পড়েই নাকাল হতে হয়েছে। ভিজে মাঠে শুধু পায়ে দৌড়ে গেলেই তো চিৎপটাং, পা টিপে হয়তো কোনমতে চলা যায়, কিন্তু ফুটবল খেলা নৈব নৈব চ। জলে ভেজা বলটাও যেমন ভারি তেমন পিছল। শুধু পায়ে শট মেরে তাকে গোলে বা দূরে পাঠান, সে কি সহজ কথা! দারুণ বৃষ্টির মধ্যে খেলতে যাবার সময় বলির পাঁঠার মত বাধ্যতামূলক অনিচ্ছাযাত্রা পরম নৈরাশ্যে এবং ধীর পদক্ষেপে, মোহনবাগানের বেলায় এই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডী চলেছে চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

তা বলে মনে এটুকু ভরসা আছে যে আকাশ যদি নেহাৎ মাথায় ভেঙ্গে না পড়ে, অর্থাৎ মাঠ যদি প্যাচপেচে না হয়, তাহলে কোন মহারথীকেই ভয় করবার কোন কারণ নেই। তাই লক্ষীবিলাস কাপের ফাইনালে গর্ডনকে শুকনো মাঠে যখন পেয়ে গেল, তখন প্রতিশোধ নেবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা জাগলো মনে। কিন্তু গর্ডনও সোজা পাত্র নয় যে হারাব বললেই হারানো যাবে তাদের। ছ'দিন চললো লড়াই। পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি হয়ে আগুন বেরোয়, কিন্তু পাথর ভাঙ্গেনা সবসময়। ছ'দিন চললো খেলা, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। শেষ পর্যন্ত ছ'দিনের দিন হাবুল সরকার ঢুকিয়ে দিলে একটা গর্ডনসের গোলে। গোঁয়ার হাইল্যাণ্ডারের দল চটে আগুন। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে যেই হাতে করে কাপটা নিতে যাবে মোহনবাগান, ধৈর্যের বাঁধ ছুটে গেল গোরাদের, চড়াও হয়ে কাপটা ছিনিয়ে নিলে।

রাগের মাথায় যাই করুক না কেন, গর্ডন ফুটবল বোঝে। তাই পরে ওরাই ঘোষণা করলে, এই মোহনবাগানের আই. এফ. এ. শীল্ড জেতা কেউ ঠেকাতে পারেনা। জিতবেই ওরা, দুদিন আগে না হয় দুদিন পরে।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

এই সব ঘটনার পরে এবং শোভাবাজার ও ন্যাশনালের জনপ্রিয়তায় একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে সাধারণ বাঙালী সমাজ ফুটবল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে এতদিনে। ছাত্র সমাজ এবং ক্লাবগুলির সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট, তাদের মধ্যে কিছুটা আগ্রহ জেগেছে ঠিকই। মোহনবাগান এরই মধ্যে সারা বাংলার নানা কেন্দ্রে খেলবার জন্য আহুত হচ্ছে, একথাও সত্য। কিন্তু যে কলকাতায় মোহনবাগান একটার পর একটা অসাধ্য-সাধন করে চলেছে, সেখানকার হাজারকরা ৯৯৯ জন ফুটবল খেলা নামক কোন কিছুর অস্তিত্বের খবর পর্যন্ত রাখেনা। যারা খবর রাখতো, তারাও পরের বছর শীল্ডের প্রথম খেলায় ই. বি. এস. আর-এর হাতে মোহনবাগানের পরাজয়কে অতি প্রত্যাশিত স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মেনে নিলে।

তারও পরের বছর, ১৯১১ সাল। আই. এফ. এ. শীল্ডের প্রথম রাউণ্ডে সাহেবী দল সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজকে তিন গোলে হারালে মোহনবাগান। পরের খেলা রেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে। প্রথমার্ধেই দুগোল দিয়ে মোহনবাগান এগিয়ে রইল হাফ-টাইমে। তার পরই এল মুষলধারায় বৃষ্টি, মাঠ জলে জলময় হয়ে গেল। এরই মধ্যে রেফারি তিন তিনটে পেনাল্টি দিলে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। দুর্গানাম জপতে জপতে ডাইনে বাঁয়ে সামনে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়ে তিনটেই ঠেকালে গোলকীপার হীরালাল মুখুজ্যে। কোন ফাঁকে একটা গোল শোধও করলে রেঞ্জার্স। তার পর আর কিছু হল না, মোহনবাগান কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠলো।

এবার শহরের কর্মবিব্রত জীবনে অন্য ব্যাপার সম্পর্কে উদাসীনতায় কোথায় যেন একটু ধাক্কা লাগলো। তবু বিজ্ঞজনেরা বললে, যাও ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে জিতেছে বলেই কি বাঙালীর দশটা ঠ্যাং গজিয়েছে নাকি! এবার গোরাপল্টন, বেশী ক্যারদানি করতে গেলে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে। কিন্তু এবারেও যখন খবর এল খাঁটি ইংরেজ গোরাদল রাইফেল ব্রিগেডও ভেতো বাঙালী মোহনবাগানের কাছে কাত হয়েছে, তখন চমক ভাঙলো অনেকের, বলে কি? খেলাটা হয়েছিল একতরফা। মিলিটারী দলই আক্রমণ চালিয়েছে। গোলে হীরালাল অসম্ভব ভালো না খেললে কী যে হত সেদিন! এরই মাঝে কোন ফাঁকে শিবদাস ওদিকে এক গোল করে বসলো।

বিস্ময়বোধ আরও প্রবলতর হল, যখন একদিন ড্র করার পর মিডল্‌সেক্সকে হারিয়ে একেবারে ফাইনালে গিয়ে পৌছলো মোহনবাগান। প্রথম দিনেই তছনছ করে দিয়েছিল গোরাদলকে, কিন্তু ওদের গোলকীপার পিগট পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুতেই ভেদ করা সম্ভব হল না। পরের দিনই আবার খেলা। এবারে মোহনবাগানের সেণ্টার-ফরোয়ার্ড "ব্ল্যাক ডেভিল" অভিলাষ ঘোষ কায়দা বুঝে এমনভাবে হাঁটু তুললে, যে পিগট বল ধরবার চেষ্টায় লাফিয়ে পড়তেই সেই হাঁটুর গুঁতো লেগে একটা চোখের ঢেলা ঠেলে বেরিয়ে গেল। গোল হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তবে সে মিলিটারীর বাচ্চাও ছাড়বার পাত্র নয়। চোখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে খেলতে লাগলো পিগট। কিন্তু কত আর সামলাবে এক চোখে? আরও দুটো গোল হয়ে গেল।

ময়মনসিংহের ছেলে অভিলাষ ঘোষ। সবে কলকাতায় এসে স্কটিশ চার্চ কলেজে বি. এ. পড়তে ভর্তি হয়েছে। ময়মনসিংহে খেলতে গিয়ে মোহনবাগানের সেণ্টার-হাফ রাজেন সেনগুপ্ত অভিলাষের খেলা দেখেই

বুঝে নিয়েছিলেন যে তুম্‌ভি মিলিটারির বিরুদ্ধে হাম্‌ভি মিলিটারি বলবার মত যোগ্যতা যদি কারো থাকে তো ওরই আছে। বিপক্ষে যেখানে দুর্ধর্ষ বাহুবল, তার বিরুদ্ধে বুদ্ধিবলের জয় সম্পর্কে শাস্ত্রবাণী যতই ভরসা দিক না কেন, কিছুটা দৈহিক শক্তি বুদ্ধিবল ও সূক্ষ্মকৌশলের সঙ্গে জুড়ে দিলে তবেই সে শক্তি হবে অপরাজেয়। তাই মোহনবাগানের তখনকার নিয়মিত সেণ্টার-ফরোয়ার্ড কুচবিহারের শরৎ সিংহ অতি যোগ্য খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও, তার বদলে অভিলাষকেই খেলানো হল শীল্ডে।

সারা কলকাতায় সাড়া পড়ে গেছে, ফুটবল নামে সাহেব ও গোরা-পল্টনদের যে নকল লড়াই আছে, তারই শেষ মহড়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে এক পক্ষে লড়াই করবে বাঙালী মোহনবাগান। সত্য হলেও বিশ্বাস করা যায় না। অপর দিকে ক্যালকাটাকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে ইস্ট ইয়র্কস, গোরা দলেরও সেরা। সারা শহরের তরুণ, আধা-বয়সী এমন কি প্রবীণ সমাজেও অপরিসীম চাঞ্চল্য জেগেছে।

২৯শে জুলাই। ১৯৪৬ সালে অন্য কারণে দিনটি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করার অনেক আগের কথা। সকাল থেকেই সাজ সাজ রব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখতে আসতো দেবতারা, বাণ ছোড়া ও বাণ ঠেকানোর নানা কৌশল দেখে বিস্ময়ে 'অহো অহো' করতো। সেই রকম দেবদুর্লভ যুদ্ধ দেখবার সুযোগ এই ঘোর কলিতেও যখন মিলেছে, তখন আর মানুষ স্থির থাকে কি করে।

আবালবৃদ্ধ চলেছে ক্যালকাটা মাঠের দিকে। গাড়ি ঘোড়ার ধার কে ধারে সে যুগে। পদব্রজেই লাইন ধরে ছুটেছে জনস্রোত, চিৎপুর, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, সার্কুলার রোড ও স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে। দক্ষিণ থেকেও আসছে অবিরাম। শুধু কলকাতা এবং শহরতলী নয়, নদীর ওপার থেকে হাওড়া পোলে হেঁটে আসছে লোক, আসছে নৌকোয় গঙ্গা পার হয়ে;

উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামাঞ্চলে, মফস্বল শহরে। মওকা বুঝে রেল কোম্পানি বর্ধমান ও রাণাঘাট থেকে স্পেশাল ট্রেন পর্যন্ত ছাড়লে। তাতেও বোঝাই হয়ে আসছে লোক। পাটনা, ঢাকা, জলপাইগুড়ি থেকেও এল কেউ কেউ।

ক্যালকাটা মাঠে পশ্চিমে মেম্বারদের স্থায়ী আসন, পূবে বি. এইচ. স্মিথ কোম্পানির সাময়িক আসনের ব্যবস্থা। আর উত্তর দক্ষিণ দুদিকই খোলা। এই দুপাশে বাক্স, পিঁপে, সাইকেল, ঠেলাগাড়ীর ঠেসাঠেসি। তার উপর কোন মতে একপায়ে ভর করতে পারলেই খুশী। তারও পিছনে অগুণতি ঠিকাগাড়ী। চালের উপর গাদাগাদি মানুষ বসে ও দাঁড়িয়ে। ইডেন গার্ডেনের গাছে গাছে পাতায় পাতায় লোক ঝুলছে, বাদুড়-বাগান থানায় বাদুড়ের জাঙ্গালের মত। ওদিকে কেল্লা পর্যন্ত অবিরাম নরসমুদ্র।

নেটিভদের দম্ভ চূর্ণ করে দিতে হবে, তার জন্য তৈরী হয়ে এসেছে কেল্লার যত গোরা। সঙ্গে এনেছে একটা কাগজের তৈরী শীল্ড আর মোহনবাগানের কুশপুত্তল। মোহনবাগানের খেলোয়াড় এবং কর্তাব্যক্তিদের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, মায় খৃষ্টান সুধীর চ্যাটার্জীর কপালে পর্যন্ত। কালীঘাটে মাকালীর কাছে পূজো পড়েছে সকালে, তারই প্রসাদী সিন্দুর।

খটখটে মাঠ। খেলা চলছে তীরের মত তীব্র গতিতে। বিদ্যুতের মত দীপ্তি দিগন্ত উদ্ভাসিত করছে। গোরারা বল পেয়ে গ্যাঁক করে লম্বা পাশ করে দেয়, তারপর মারে গোলের দিকে। ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী দর্শকরা চটাপট হাততালি দেয়। মোহনবাগানের কানু বাবু দেয় রাম দৌড়, হাবুলবাবুর সঙ্গে স্বচ্ছন্দ গতিতে আদান প্রদান করতে করতে আক্রমণ এগিয়ে নিয়ে যায়। বিজয়দাস বল নিয়ে গোরাদের নাচায়। শিবদাস তর তর করে কেটে ঢুকে যায় ভিতরে, পায়ের চেটোর এপাশে ওপাশে আর আঙ্গুলের কারসাজিতে

গোরাদের একেবারে বোকা বানিয়ে দেয়। বাঙালী দর্শকদের আনন্দ-ধ্বনিতে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে।

শিবে বিজে প্রায় একই রকম দেখতে। গোরাদলের চোখে পার্থক্য ধরা পড়েনা। শিবদাসের খবর ওরা জেনেছে, তাই লেফট-আউটকে কড়া পাহারা দেয়। কিন্তু লেফট-ইনের সঙ্গে লেফট-আউট জায়গা বদল করে ফেলে এমন চকিতে, শিবদাসের পাহারাদারেরা লেগে থেকেও আর তাকে খুঁজে পায় না। এই মানুষটাই জ্বালাচ্ছে, যতই শক্তমুঠিতে ধরতে যায়, পিছলে চলে যায় নাগালের বাইরে। খবরের কাগজে এমনিতে ওকে বলেছে—'পিছল বাবু' (Slippery)।

এমন সময় বাঁশি বাজলো, মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ফাউল। হেড দেবার চেষ্টায় বেঁটে রাজেন সেন ওদের ছ-ফুট লম্বা সেণ্টার-হাফ জ্যাকসনের কাঁধে ভর করে লাফ দিয়ে উঠেছে। যাক গোল থেকে অনেক দূরে, এমন আর ভয়ের কি আছে! হীরালাল বললে—সব বাপু সরে দাঁড়াও, আমি পেনাল্টি ঠেকাই, আমাকেই ছেড়ে দাও এই শট ঠেকাবার ভার। সবাই সরে গেলেও ব্যাক সুকুল ভরসা পেলে না, রইলো গোলের সামনে। জ্যাকসনের ফ্রী-কীক লাগবি তো লাগ সুকুলের গায়ে, তারপর বলটা ঠিকরে পড়লো একেবারে গোলের ভিতর, হীরালাল কোন হদিশ পেলে না। গোরা-দের কি উল্লাস। সাহেবী আসন থেকে বিপুল হর্ষধ্বনি উঠলো, খবরের কাগজের মতে যা অনেক মাইল দূর থেকে শোনা গিয়েছিল। গোরার দল কাগজের শীল্ডটা বাঙালী দর্শকদের দিকে উঁচু করে ধরে নাচতে লাগলো। আগুন জ্বালিয়ে দিল কুশপুত্তলে। বাঙালী জনসমুদ্র শান্ত স্থির নিস্তরঙ্গ, মোহনবাগান খেলোয়াড় দলেও নেমে এসেছে পরম হতাশা।

যত লোক জমা হয়েছে তার বারো আনা মাঠের ভিতরকার কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আকাশের দিকে চেয়ে দেখছে মস্ত এক ঘুড়ি উড়ছে, আর তার

বুকে লেখা 'এক গোলে ইস্ট ইয়র্ক অগ্রগামী'।

হাফ-টাইমের সময় রেফারি পুলার কি বললে শিবদাসকে। পরে শিবদাস বলেছে, পুলার বললে—এখনো অর্ধেক খেলা বাকি, এত হতাশা কিসের? এই কটি কথাতেই সদলবল শিবদাসের মনে ফিরে এল আশা।

খেলা আবার শুরু হতেই মোহনবাগান আক্রমণ করলো। কিন্তু ইস্ট ইয়র্ক-ও শিশুর দল নয় যে ঠেলে গেলেই গোল হবে। তাই বলে বাঙালীর বুদ্ধির বড়াইও মিথ্যা নয়। শিবদাস সরে গেছে ডান দিকে, ওলট পালট করে দিয়েছে ফরোয়ার্ডের ব্যবস্থা। যখন তখন ভিতরে ঢুকে পড়ছে শিবদাস, মাখনের ডেলার ভিতর দিয়ে ছুরি চলছে যেন, এমন সহজ সাবলীল তার গতি। বিজয়দাস বল ঠেলে দিতেই কানু রায় সেণ্টার করছে। হাবুল সামনে ঠেলে দিচ্চে বল অভিলাষের পায়ের ডগায়। প্রতি মুহূর্তে আশা হল বুঝি গোল। আবার আশঙ্কাও কম নয়। ওরাও ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে এগিয়ে আসছে বার বার। ক্ষ্যাপা মোষের মত অমিত বিক্রমে বিভীষিকা সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রাণ কবুল করেছে ব্যাক হাফ-ব্যাক গোল-কীপার—সবাই।

মিনিট দশেক মাত্র বাকি। সর সর করে ঢুকে পড়লো শিবদাস। তার পর এ-পা ও পা করে যখন বাঁদিক চেপে শট মারলে গোলে, ক্রেসী তালই পেলে না কোন দিক দিয়ে তা গোলের ভিতর গেল। বেগ সামলাতে না পেরে শিবদাস নিজেও গোলের ভিতর ঢুকে পড়েছিল, মাতব্বরের মত ক্রেসীকে ধরে পিঠ চাপড়ে ছেড়ে দিল। যে উল্লাসধ্বনি উঠলো, আকাশ বলে স্থূল কিছু থাকলে সত্যি তা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত। হঠাৎ দেখা গেল লাইনের ধারে যে সব গোরার দল বসেছিল তারা, সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করেছে, জুতো ছাতা বর্ষণের ঠেলায়।

এই গোলের বর্ণনা-প্রসঙ্গে গোষ্ঠবাবু বলেছেন—নিজের জীবনের অনেক খেলার স্মৃতিই ঝাপসা হয়ে এসেছে। কিন্তু মাত্র পনের বছর বয়সে

ছ-আনা ভাড়া দিয়ে অপরের সহযোগিতায় কাঠের বাক্সে দাঁড়িয়ে সেদিন যে শিবদাস বাবুর গোল দেওয়া দেখেছিলেন, সে ছবি আজও জ্বল জ্বল করছে মনের পর্দায়।

আকাশে এবার নতুন ঘুড়ি, তাতে লেখা, 'গোল শোধ দিয়েছে মোহনবাগান।'

এবার উৎসাহ দশগুণ, আর জনতার দিগন্ত-ফাটানো চীৎকার চলেছে অবিরাম। খেলা শেষ হয়-হয়। কিন্তু অসীম আশা ও বিপুল বল, তাতে কি ভাঁটা পড়ে? ঘুড়ি বলছে, 'গোল দেবে এবার।'

মাত্র ছমিনিট বাকি। শিবদাসের কাছ থেকে বল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীমবিক্রমে ধাক্কা মেরে তা নিয়ে গোলে ঢুকে গেল অভিলাষ। সেই মুহূর্তে যে ক্র্যাকাটোয়ার বিস্ফোরণ ঘটলো, যেমন তার আকাশ ছাওয়া শব্দ, তেমনি উল্লাসের উত্তাল তরঙ্গ। ছাতা জামা জুতোর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল ভিতরে বাইরে। বন্যা ধেয়ে আসবার আগেই কেটে পড়লো গোরা দর্শকের দল।

মোহনবাগান শীল্ড বিজয় করেছে। তারপরে অনেক ভারতীয় এবং বাঙালী দল শীল্ড পেয়েছে, মোহনবাগানও পেয়েছে আরও কতবার। কিন্তু সে ত শুধু পাওয়া, জয় একবারই হয়। মাউণ্ট এভারেস্ট জয় করেছে তেনজিং ও হিলারী-ই। এরপর হয়তো অনেকেই তাতে আরোহণ করবে। কি যায় আসে তাতে!

শীল্ড বিতরণে ভিড়ের চোটে রাজেন সেন অজ্ঞান হয়ে গেল, খেলোয়াড় অনেকেই কাছে ঘেঁষতে পারলে না। এমনই উল্লাসের উদ্বেল তরঙ্গ। শুধু সে রাতেই নয়। পরপর কদিন শহরে অন্য কথা নেই। দলে দলে যখন তখন 'থ্রি চীয়ার্স ফর মোহনবাগান' ও 'হিপ্ হিপ্ হুররে'-র সঙ্গে 'বন্দে মাতরম' আর 'মোহনবাগান কী জয়' করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিলেতী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান রয়টার খবর পাঠালে পৃথিবীর সর্বত্রঃ—"ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম মুখ্যত বাঙালী নিয়ে গড়া এক ভারতীয় দল মোহনবাগান তুখোড় ব্রিটিশ ফৌজী দলগুলিকে হারিয়ে আই. এফ. এ. শীল্ডে বিজয়ী হয়েছে। আজকের ফাইনাল খেলায় অভাবনীয় উদ্দীপনা দেখা গেছে এবং অনুমান আশি হাজার দর্শক ময়দানে সমবেত হয়েছিল·········। যখন জানা গেল যে ইস্ট ইয়র্কশায়ার পরাজিত হয়েছে, সে দৃশ্য বর্ণনার অতীত।······কিন্তু কোন জাতিগত বিদ্বেষ দেখা যায়নি···"।

স্টেটসম্যান কিন্তু সাধারণ বাঙালী দর্শকের চীৎকার এবং ছাতা জুতো ছোড়ার নিন্দে করলে। অবশ্য তার সঙ্গে এও বললে যে, গোরাদের অসভ্য ব্যবহারই তাদের প্ররোচনা দিয়েছিল। কিন্তু একথা জোরের সঙ্গে বললে স্টেটসম্যান, যে যোগ্য দলই জয়ী হয়েছে। পল্টনী খেলোয়াড়দের গাজোয়ারি খেলা ব্যর্থ হয়েছে বাঙালীদের কৌশলী খেলার কাছে। ইংলিশম্যান কাগজে যে আগের দিন লেখা হয়েছিল—মোহনবাগান বাইরে থেকে খেলোয়াড় আমদানী করেছে, তার প্রতিবাদ করে লিখলে স্টেটসম্যান—"শীল্ড বিজয়ে যে সব খেলোয়াড় নিয়ে খেলেছে মোহনবাগান, তাদের অধিকাংশই দলের বহুদিনের খেলোয়াড়। এবারে শীল্ড প্রতিযোগিতার সুরু থেকে দলের পক্ষে নিয়মিত খেলেনি, এমন কেউ শীল্ড ফাইনালে মোহনবাগনের পক্ষে নামেনি"।

লণ্ডনের ডেইলি মেইল লিখলে ঃ—"···শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ ফৌজীদলের বিরুদ্ধে বাঙালীদের এই জয় স্মরণীয় ঘটনা। কলকাতার প্যাচপেচে গরম বাঙালীরা শ্বেতকায়দের চেয়ে অনেক বেশী সহ্য করতে পারে, একথা সত্য। কিন্তু তাতে ঘটনার গুরুত্ব কিছু কমে না·········"।

ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান লিখলে ঃ—"···বাঙালীদের এই জয়ে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যে দলের দৈহিক পটুতা, দৃষ্টির প্রখরতা এবং বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা

বেশি, অ্যাসোসিয়েশন ফুটবলে জয়লক্ষ্মী তাদের পক্ষেই যেয়ে থাকেন…।"

সিঙ্গাপুর ফ্রী প্রেসের সংবাদদাতা লিখলে :—"……কম করে ধরলেও বলতে হয় এক লক্ষ লোক মাঠে জমা হয়েছিল, অনেকেই খেলার কিছুই দেখতে পায়নি…………। তবু জনতার মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায়নি। বিশেষ করে বাঙালী দর্শকরা খুব ভাল ব্যবহার করেছিল……। ইস্ট ইয়র্কসের গোল দেওয়ার হর্ষধ্বনি অনেক দূর থেকে শোনা গিয়েছিল…। দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগান দানবের মত খেললে।……আগাগোড়াই ঝরঝরে খেলা হয়েছে...…।"

মৌলানা মহম্মদ আলি সম্পাদিত কমরেড পত্রিকা সম্পাদকীয় নিবন্ধে মোহনবাগানকে অভিনন্দন জানালে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত বেঙ্গলি পত্রিকা মোহনবাগানের এগারজন খেলোয়াড়ের আলাদা আলাদা ছবি দিয়ে পুরো দুপাতা কাহিনী ছাপালে। মুসলিমসমাজের মুখপত্র সাপ্তাহিক মুসলিম লিখলে :—"…পৌরুষ প্রকাশের খেলায় ভারতীয়রা, যে কারো চেয়ে কম নয় মোহনবাগান তা সপ্রমাণ করেছে……। যদিও মোহনবাগান বাঙালীদল, তাদের সার্থকতার আনন্দ হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান নির্বিশেষে সর্বসমাজে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। হিন্দু ভাইদের জয়ের সংবাদে মোসলেম স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যবৃন্দ আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে ও ডিগবাজি খেতে থাকে……"।

ইংরেজ পরিচালিত সান্ধ্য পত্রিকা এম্পায়ার মাঠে নিজস্ব টেলিফোন বসিয়ে ছাপাখানায় খেলার ধারাবিবরণ চালান করেছিল। সম্পাদকীয় স্তম্ভে এম্পায়ার লিখলে :—"…এই জয়ের সবচেয়ে বিশেষত্ব যে বিজয়ী দলের প্রত্যেকে বাঙলার ছেলে, তার মধ্যে দুজনের বয়স মাত্র উনিশ। মোহনবাগান দলের ওই এগারজন খেলোয়াড় কলকাতার মুখ রক্ষা করেছে। কারণ, স্থানীয় সামরিক ও বে-সামরিক দলগুলি এক এক করে পরাজিত

হবার পর, কলকাতা ফুটবলের সম্মান ওরাই বাঁচিয়েছে। বস্তুত ওরা ফুটবল খেলারই গৌরবস্বরূপ"।

অমৃতবাজার "অমর এগারজন" শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লিখলে…"পাশ্চাত্য জাতিসমূহের চোখে আজ যারা স্বজাতির মর্যাদা তুলে ধরলে অভাবনীয় কৃতিত্বের জোরে, ঈশ্বরের আশীষ তাদের উপর বর্ষিত হোক। যে দৈহিক শক্তিতে বাঙালী এতদিন হীন বিবেচিত হত, তাতেই আজ আমরা জয়লাভ করেছি…"। মোক্ষম ছাড়লে খাস ইংরেজ মুখপত্র ইংলিশম্যান। সম্পাদকীয়তে লিখলে—কংগ্রেস এবং স্বদেশীওয়ালারা এতদিনের চেষ্টায় যা পারেনি, নেটিভদের চোখে ইংরেজদের এবং ব্রিটিশ ফৌজীদলের দৈহিক শক্তি ও পটুতার ইজ্জত ঢিলে করে দিয়েছে মোহনবাগান।

ফুটবলের যে ক্ষীণ ধারা একদিন মুষ্টিমেয় ধনীর অবসর বিনোদন ও মনোবিলাসের সামগ্রী হিসেবে এদেশে বইতে সুরু করেছিল, জনকয়েক আদর্শবাদী বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষাকে পুষ্পিত করার প্রয়োজনে যে ধারাকে লালন করছিলেন, আচমকা এক বন্যাস্রোত এসে তার চার পাশের বাধাবন্ধ চুর চুর করে দিল। ফুটবল পরিব্যাপ্ত হল বাঙালীর সমগ্র জীবনে।

কলকাতা ফুটবলের গৌরব—



গুরু স্থর ত্থীরাম



তুলসী দত্ত
(কুমারটুলি ও মোহনবাগান)



পার্সি নাইট
(ক্যালকাটা)



ডানকান
(ড্যালহৌসী)

কলকাতা ফুটবলের গৌরব—



সুখ চক্রবর্তী
(ইস্টবেঙ্গল)



দেবী ঘোষ
(হাওড়া ইউনিয়ান)



ডেভিস
(ড্যালহৌসী)



মন্মথ দত্ত
(মোহনবাগান)

এলো প্লাবন

শীল্ড ফাইনাল জিতে মোহনবাগান যখন ক্যালকাটা গ্রাউণ্ড থেকে বেরিয়ে নিজেদের মাঠের দিকে আসছিল, সেই সময় একজন খালি গায়ে পৈতে-ঝোলান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন খেলোয়াড়দের কাছে। সুধীর চ্যাটার্জিকে সবার সামনে পেয়ে বললেন—"দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করছি বাবা—যা করেছ! কিন্তু ওটা নাম্‌বে কখন?" বলেই দক্ষিণ দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন ফোর্ট উইলিয়ামের দিকে, যেখানে পত্‌ পত্‌ করে উড়ছিল ব্রিটিশ পতাকা, ভারতের পরাধীনতা ঘোষণা করে।

মোহনবাগানের শীল্ড বিজয়ের সঙ্গে অর্থাৎ খেলার মাঠে ফুটবল ম্যাচে ভারতীয়দের হাতে সাহেব ও গোরা-পল্টনদের পরাজয়ের সঙ্গে জাতির স্বাধীনতা-পরাধীনতার প্রশ্ন জড়িয়ে থাকতে পারে, এমন ক্ষীণ অনুভূতি হয়তো ছিল, তা প্রবল ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো সেদিনের ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথায়। জাতীয় আন্দোলন থেকে যুবসমাজকে ভ্রষ্ট করার জন্য যেই ফুটবলের প্রসারে সহায়তা করেছিল রাজভক্তমহল, ফুটবলকে সেই জাতীয় আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার সম্ভাবনা এবার অনেকের মনে সঞ্চারিত হল। বিশেষ করে ইংলিশম্যানের সম্পাদকীয় মন্তব্য সেই সম্ভাবনাকে আরও জোরালো করে দিলে।

ফুটবল ক্লাব গজিয়ে উঠলো আফিসে আফিসে কেরানীদের মধ্যে, পাড়ায় পাড়ায়, পল্লীতে পল্লীতে। ইতিপূর্ব্বেই মিশনারি সাহেবদের প্রচেষ্টায় গ্রামে ঢুকেছিল ফুটবল, পল্টনীদের দেখাদেখি অনেক মফস্বল সহরে ফুটবল

খেলা সুরু হয়েছিল, কলেজের সাহেব অধ্যাপকদের উৎসাহে বাইরের কলেজেও ফুটবল খেলা চলছিল। কিন্তু এতদিন তা ছিল মুষ্টিমেয় বেয়াড়া যুবকদের কাণ্ড। এবার সমগ্র তরুণ সমাজে সাড়া জাগলো।

খেলার উৎসাহ কাজে পরিণত করবার সুযোগ আর কজনের হয়। বিশেষ করে এই কর্মব্যস্ত ঘিঞ্জি সহর কলকাতায়। কিন্তু যারা বিপ্লবে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে পারেনি, তারাও যেভাবে ও বিপ্লবী আন্দোলনকে নানাভাবে সহায়তা করেছিল, ঠিক তেমনি ভাবে উৎসাহ দিতে এগিয়ে এল বাঙালী অখেলোয়াড় জনসাধারণ, মোহনবাগানের সমর্থনে। ১৯২৫ সালের আগে পর্যন্ত মোহনবাগানের সদস্য সংখ্যা ছিল নগণ্য। কিন্তু সমর্থক সংখ্যা গণনার বাইরে চলে যায় শীল্ড বিজয়ের অব্যবহিত পরেই। ইংরেজের বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনার প্রধান সংহতিকেন্দ্র হয়ে ওঠে মোহনবাগান।

মোহনবাগানকে চেঁচিয়ে জেতাতে হবে, দৈহিক কসরতে গোরা-পল্টন ও সাহেবরা বাঙালীদের চেয়ে ছোট তা প্রত্যক্ষ করতে হবে, এর মধ্যে আনন্দের সীমা পরিসীমা আছে কিছু? কিন্তু বছরে একটি দুটি শীল্ডের খেলায় সে সাধ আর কতখানি মেটে! তাই সাহেবদের লীগ খেলার ফাঁকে ফাঁকে তাদের ডেকে নিয়ে ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ খেলে মোহনবাগান; হারেই বেশী, তবে শুকনো মাঠ পেলে লড়ে নেয় এক হাত।

শীল্ড খেলায় ১৯১১ সালের চরম সার্থকতার পর এল কিছুটা শৈথিল্য। ১৯১২ সালে ক্যালকাটার বিরুদ্ধে হেরে গিয়ে প্রথম রাউণ্ডেই বিদায় নিতে হল। পরের বছরও ওই একই অবস্থা, এবার পরাজয় ঘটলো ই. বি. এস. আর-এর হাতে। মহারথী অধিনায়ক শিবদাস ভাদুড়ীর হাত থেকে ১৯১৩ সালে নেতৃত্বের দায়িত্ব তুলে নিলেন হাবুল সরকার। শিবদাস বা কানুবাবু নিয়মিত খেলতে পারে না। শূন্যস্থান পূরণ করছেন প্রকাশ ঘোষ। সুধীর চ্যাটার্জীকেও আহত হয়ে অবসর নিতে হয়েছে।

ভাগ্যকুলের মাঠে একটা কিশোরকে খেলতে দেখে রাজেন সেন তার কলকাতার ঠিকানা নিয়ে এসেছিলেন। ছেলেটা কলকাতারই স্কুলে পড়ে, খেলে কুমারটুলি পার্কের ক্যালকাটা ইউনিয়ন ক্লাবে। ছেলেটা দেশে গিয়েছিল গরমের ছুটীতে, আর সেখান থেকেই খেলতে গিয়েছিল ভাগ্যকুলে। ভাগ্যকূল থেকে যে জাহাজে ও বাড়ী ফিরছে সেই জাহাজেই নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছিলেন মোহনবাগানের ফুটবল-সেক্রেটারী শৈলেন বসু। তাঁর পরিচিত স্থানীয় এক ভদ্রলোক জাহাজে ছেলেটিকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দেন, শৈলেনবাবুও তার কলকাতার ঠিকানা নিয়ে রাখেন।

পরের বছর ছেলেটির ডাক পড়ে মোহনবাগানে। পাড়ার পার্কে এবং পাড়াগাঁয়ের ধাই-ধাপ্পা খেলায় অভ্যস্ত যে, তার ডাক পড়লো মোহনবাগানে পরীক্ষা দিতে। প্রথম খেলায় সে নিজস্ব রাইট-হাফ পোজিসনে খেললে। তার লম্বা লম্বা শট দেখে কেউ কেউ সুকুলকে বললেন—তোমার পাশে ব্যাকের শূন্যস্থান পূরণ করবার চেষ্টা করা যাবে কি ওকে দিয়ে? একটু ভেবে নিয়ে সুকুল বললেন— দেখা যাক। বৃষ্টিভেজা পিছল মাঠে ড্যালহৌসীর বিরুদ্ধে এক ফ্রেণ্ডলি খেলায় প্রথম ব্যাক খেলতে নামলে ছেলেটি, সংশয় ও আশঙ্কায় দুরুদুরু বুক নিয়ে, কিছুই খেলতে পারলে না। বিজ্ঞজনেরা হেসে বললেন—ছোঃ, বাদ দাও, বাদ দাও। সুকুল গম্ভীর। দুদিন বাদে নিজের মাঠে খেলা, চোদ্দটা ম্যাচে ২৮ পয়েণ্ট পাওয়া গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ন ব্ল্যাকওয়াচ-এর বিরুদ্ধে। ছেলেটি মাঠে এসেছে পরম সঙ্কোচে। বোধ হয় খেলা দেখার চেয়ে বেশি আশা নেই মনে। বিস্ময়ে বোবা মেরে গেল, যখন সুকুল বললেন. তুমি খেলবে আমার সঙ্গে। অনেকেই বললে—সুকুল-ই ডোবালে টিমকে আজ। দশ মিনিট খেলা এগোতে না এগোতে সবার অবজ্ঞা হতবাক্-এর পথ বেয়ে উচ্ছল প্রশংসায় ফেটে পড়লো। কি খেলা খেললে সতের বছরের ছেলে! কোন মতে ব্যাকজুড়িকে কাটাতে

পারলে না ব্ল্যাকওয়াচের দুর্ধর্ষ ফরোয়ার্ড দল, গোল দেওয়া তো দূরের কথা।

সেদিন থেকে পরবর্তী তেইশ বছর মোহনবাগান এবং কলকাতা ফুটবলের নামান্তর হল গোষ্ঠ পাল। বস্তুত ১৯১৩ সালে মোহনবাগানের প্রধান কৃতিত্বই এই গোষ্ঠ পালকে দলে নেওয়া। জহুরী জহর চিনেছিল। গোষ্ঠ বাবু নিজে বলেছেন, সেদিন সুকুলবাবু জোর না করলে হয়তো জীবনে ফুটবলার হবার সম্ভাবনা তাঁর অঙ্কুরেই মরে যেত।

এতদিনে আই.এফ.এ-র সাহেব কর্তৃপক্ষের কিছুটা হুশ হয়েছে যে বাঙালী তথা ভারতীয়দের লীগ ফুটবল থেকে সরিয়ে রাখলে লীগের জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই। তাই মোহনবাগান এবং আগের বছরের ট্রেডস্ কাপ বিজয়ী এরিয়ান ক্লাবকে অনুগ্রহ করে দ্বিতীয় বিভাগ লীগে খেলতে দিলে। ষোলটা খেলায় চারটে হেরে, দুটো ড্র করে, ২৭ গোল দিয়েও ১৬ গোল খেয়ে ২২ পয়েন্ট পেলে মোহনবাগান দ্বিতীয় বিভাগ লীগে। মেজারার্স ও ২২ পয়েন্ট পেলে, কিন্তু ৩৫ গোল দিয়ে ও ১৩ গোল খেয়ে তারাই রইল তালিকার উপরের ধাপে। আর তারও উপরে রইল চ্যাম্পিয়ান ৯৩-হাইল্যাণ্ডার্স 'বি'—পাঁচ পয়েন্ট এগিয়ে।

কে উঠবে 'এ' ডিভিশনে? ৯৩-হাইল্যাণ্ডার্স উঠতে পারে না, মেজারার্স দ্বিতীয় হলেও, তা শুধু গোলের জোরে; ২২ পয়েন্ট তো মোহনবাগানও করেছে। সাহেবরা প্রথম বিভাগের জনপ্রিয়তা বাড়াতে ব্যগ্র। তাবলে বেশী ব্যগ্রতা দেখালেও ইজ্জত থাকে না, নেটিভরাও পেয়ে বসে। তাই স্থির হল মেজারার্স ও মোহনাবগানে খেলা হবে।

ক্যালিডোনিয়ান (বর্তমানে পুলিশ) মাঠে খেলা। খেলছে মোহন-বাগান, তছনছ করে দিচ্ছে মেজারার্সের রক্ষণ-ব্যূহ, কিন্তু সর্বশেষ প্রাচীর গোলকীপার ডি'সিলভাকে কোনমতেই নড়াতে পারছে না। এমনি করে

দুদিন খেলার পর যা ঘটলো তা উল্টো। মেজারার্সই দিয়ে বসলো দুটো গোল। মোহনবাগান একটার বেশী শোধ করতে পারলে না। প্রথম বিভাগে খেলার আশা জলাঞ্জলি দিয়ে বসে থাকতে হ'ল।

পরের বছর (১৯১৫) লীগ সুরু হবার আগেই ফৌজীদল ৬২ কোং আর. জি. এ. জানালে তারা প্রথম বিভাগের বদলে দ্বিতীয় বিভাগে খেলবে। ২৬টা খেলায় ৬ পয়েণ্ট পেয়ে আর কী-ই বা করার ছিল? তিন পয়েণ্ট পাওয়া ওয়াই. এম. সি. এ-র সহযাত্রী হয়ে স্বেচ্ছায় নেমে গেল।

মোহনবাগানকে প্রথম বিভাগে খেলাবার জন্য যে সব সাহেব আগ্রহান্বিত ছিল, তাদের অগ্রণী ছিল আই. এফ. এ-র সহ-সভাপতি টি. সি. ক্রফোর্ড। মোহনবাগানের জন্য জায়গা করে দেবার এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে ক্রফোর্ড সাহেব। ফুটবল লীগের আইন বদলে গেল, দুটি ভারতীয় দলকে প্রথম বিভাগে নেওয়া যেতে পারে। এতদিনে মিটলো মোহনবাগানের মনের আশা। প্রধান সমরাঙ্গনে ঠাঁই হয়ে গেছে, সব রথী মহারথীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ লড়াই হবে নিত্যকার ঘটনা স্বাধিকারবলে, ফ্রেণ্ডলি ম্যাচের অনুগ্রহের আর নির্ভর করতে হবে না। আর প্রধান ফুটবল আসরে পাত পাড়তে দেওয়া মানেই তো যোগ্যতার স্বীকৃতি। জনগণ শীল্ড জয়ের পরেই মেনে নিয়েছে, মোহনবাগান ফুটবলে বিশ্ববিজয়ী হবার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু সরকারি স্বীকৃতি অন্য জিনিষ; আর তা যে কতখানি, তা বঞ্চিত ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না।

মোহনবাগান প্রথম বিভাগ লীগে খেলতে সুরু করা থেকেই কলকাতার তরুণ সমাজের তিনমাসের বাতিক সুরু হয়ে গেল। সুরু হল জল্পনা কল্পনা, অঙ্কের হিসেব, জ্যোতিষ ও আবহাওয়াতত্ত্বের আলোচনা। রোদের অগ্নিবৃষ্টিতে জলে পুড়ে যাচ্ছে সহর, গায়ে ফোস্কা পড়ার দাখিল। তা হোক, তাতেই তো মাঠ থাকবে খটখটে। কালো কাজল মেঘ যতই স্নিগ্ধ ছায়ায় শীতল করুক

নগরের জীবন, সে মেঘ যে বৃষ্টির ইঙ্গিত, মোহনবাগানের জয়ের পথ পিছল করে দেবে, আছাড় খেয়ে পড়ার সম্ভাবনা তের আনা। রবীন্দ্রনাথের বর্ষা-আবাহন গীতি কারো মুখে শুনলে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে, রেখে দাও ও সব কাঁচের ঘরে বসে চায়ের কাপ হাতে বর্ষাবিলাস।

তারপর ঋতুচক্রের অনিবার্য অনুবর্তনে বর্ষাকাল যখন এসেই গেছে, তখন সকালে উঠেই আকাশ দেখা, মেঘের টুকরো-টাকরা দেখা গেলেই মন বিষণ্ণ। ছাত্র হিসেবে ভূগোলে পড়ায় মেঘ-বিজ্ঞানের প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং হয়েছে সে যুগে মোহনবাগানের খেলা উপলক্ষ্যে। মেঘের চেহারা দিয়ে তার বর্ষণপ্রবণতা কষা হয়েছে দিনের পর দিন। সিনেমা নয়, প্রথম যুগে রাজনীতিও নয়, ফুটবলই ছিল তরুণ ও ছাত্র সমাজের একমাত্র চিন্তা, আর ফুটবল মানেই মোহনবাগান। শুধু কি তাই? রথযাত্রা, অম্বুবাচী, জন্মাষ্টমীতে বৃষ্টি হবেই, এই স্থির বিশ্বাস নিয়ে সেসব দিনের খেলায় জয়ের আশা বাদ দিয়ে হিসেব নিকেষ কষেছে সবাই। তীব্র রোদের মধ্যেও মাঠে ছুটেছে অদম্য উৎসাহে, কিন্তু আকাশে মেঘ দেখলেই পদক্ষেপ হয়েছে জলভার মেঘের মতই মন্থর।

হবেই বা না কেন! হালকা পায়ে আঙুলের কায়দায় টুক্‌টুক করে বল নিয়ে-দিয়ে হরিণের মত ছোটা, ভারি বুট-পরা পাথুরে শরীরের সাহেব খেলোয়াড়দের পিছনে ফেলে বা পাশ কাটিয়ে। পাথরের মত শক্ত, খটখটে শুকনো মাঠ ছাড়া তো আর তা সম্ভব হয় না! শুকনো মাঠে শুধু পায়ের উৎকর্ষ যত বেশী, সামান্যতম ভিজে মাঠে বিপর্যয়ের আশঙ্কাও সেই পরিমাণ।

বিশ্বের সবচেয়ে কাব্যময় বর্ষার দেশে সাধারণ বর্ষণকে ঘৃণা করেছে কলকাতার লোক একটি মাত্র কারণে। খেলার শেষে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ার এত বাধা নিষেধ ছিল না সে যুগে। ভিজের দিনে সম্ভব না হলেও

শুকনো দিনে মাঠে শুয়ে শিড়দাঁড়া সোজা করে নিতে হয়েছে কতদিন। অদ্ভুত ভালো খেলেও যেদিন শুকনো মাঠে হেরে গেছে মোহনবাগান, তার পর আর শিরদাঁড়া সোজা রাখা সম্ভব হয়নি কারো পক্ষে।

বাঙালীদলের বিরুদ্ধে খেলায় কিন্তু তেমন উৎসাহ জাগে নি। বাঙালী দলের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের খেলায় সে উৎকর্ষও ফোটেনি, যা ফুঠেছে ক্যালকাটা বা পল্টনী দলগুলির বিরুদ্ধে। অর্থাৎ যোগ্য প্রতিপক্ষ না পেলে মনপ্রাণ দিয়ে খেলতে পারেনি মোহনবাগান। সেই মনোভাবকেই আজ বলা হয় "বিগ ম্যাচ টেম্পারামেণ্ট"। আজ বিগ ম্যাচে স্নায়ুর যুদ্ধ চলে, কারণ সেখানে আসে ইজ্জতের প্রশ্ন। সেদিন ইজ্জতের প্রশ্ন জয় পরাজয়ে ছিল না, ছিল ভালো খেলায়, বিশেষ করে রাজজাতির বিরুদ্ধে। সে দিক দিয়ে শুকনো মাঠে শক্তিশালী ব্রিটিশ দলের বিরুদ্ধে কদাচিৎ ব্যর্থতা দেখিয়েছে মোহনবাগান।

মোহনবাগান ড্যালহৌসীর বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে অনেকবার। তবু ড্যালহৌসীই ছিল ওদের 'বগি টিম'। ড্যালহৌসীর সঙ্গে ওদের ক্রীড়া চাতুর্য অনেক সময় যথাযথ প্রকাশ পেতনা। কিন্তু ক্যালকাটা? দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত ক্যালকাটাকে থোড়াই কেয়ার করেছে। চোদ্দজনের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেও, চূড়ান্ত যুদ্ধ না করে সূচাগ্র মেদিনী ছাড়েনি কোন দিন।

ক্যালকাটার ব্রিটিশসিংহবিক্রমের বিরুদ্ধে মোহনবাগান প্রথম শক্তি-পরীক্ষা করেছিল মিণ্টোফিট প্রতিযোগিতায়। তারপর ১৯১২ সালের শীল্ড খেলায় রেফারির মর্জিতে ৩-২ গোলে জেতা খেলা হারতে হল ১-২ গোলে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করেই ১৯১৪ সালে 'সরকারী চ্যারিটি'র জন্য এই দুদলে বিশেষ প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। সে খেলায় কোন পক্ষই জয় লাভ করতে পারেনি।

কিন্তু প্রথম বিভাগ লীগে মোহনবাগানের স্থান হতেই বছরে দুবার করে শক্তিপরীক্ষা সুরু হয়ে গেল।

ষোল সালে প্রথম বছরে মোহনবাগান ঠিকমত দল খাড়া করার আগেই ক্যালকাটার সঙ্গে মুখোমুখি হতে হল। রাজেন সেন এবং অভিলাষ ও শরৎ সিংহের অনুপস্থিতিতে গৌর ঘোষকে সেণ্টারহাফে খেলিয়ে শিবদাস খেললে সেণ্টার ফরোয়ার্ড। প্রথম বারে ক্যালকাটা-মোহনবাগান খেলা গোলশূন্য ভাবে শেষ হয়। ফিরতি খেলায় ক্যালকাটা জেতে এক গোলে। লীগে মোহনবাগান ক্যালকাটাকে প্রথম হারায় ১৯২৩ সালের ফিরতি খেলায়। ঝির ঝিরে বৃষ্টির মধ্যে কুমারবাবু গোল করেন। সেই খেলাতে বলাইদার সঙ্গে সংঘর্ষে ড্বয়-এর শিনবোন দুখানা হয়ে গেল খটাশ করে, শব্দ শোনা গেল সারা মাঠে। ড্বয় পড়ে ছটফট করছে, কিন্তু জনতার কি উল্লাস! যেন ক্ষুদিরাম থেকে সুরু করে যতজন শহীদ হয়েছে ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করে, সবার বদ্লা নিলে বলাইদা, জাতীয় বীর বনে গেল সেই মুহূর্তে। তেইশ সালের জয় সোজা কথা নয়। কারণ সেবারেই লীগ শীল্ডের জোড়া মুকুট পেয়েছিল ক্যালকাটা। মোহনবাগান আবার ক্যালকাটাকে হারায় ১৯২৬ সালে, সারা লীগে সেবার ক্যালকাটার ঐ একমাত্র পরাজয়।

ক্যালকাটা-মোহনবাগানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে শুকনোর দিনে অন্য যে কোন মিলিটারী টিমের মতই ক্যালকাটা-ও অশেষ আশঙ্কাই নিয়ে মাঠে নামে।

১৯২১ সালে শীল্ডের প্রথম খেলায় দুদলের সাক্ষাৎ। খট খটে মাঠ, অগনিত জনতা মাঠ ছাপিয়ে চার পাশে বসে গেছে। খেলা সুরু হবার মিনিট কয়েকের মধ্যেই হঠাৎ বাঁশি ফুঁকে দিয়ে রেফারি বেরিয়ে গেল মাঠ থেকে। শোনা গেল, দর্শকরা মাঠের সীমানারেখা চড়াও হয়েছে বলে খেলা চালানো অসম্ভব দেখেই সে খেলা বাতিল করে দিয়েছে রেফারি। গাঁটের পয়সা,

দেহের কসরত আর মনের প্রত্যাশা সব এক সঙ্গে বানচাল। তাও জনতা সইতে রাজি ছিল। কিন্তু এমন শুকনো মাঠে মোহনবাগানের জয়ের অন্তত আট আনা সম্ভাবনা নষ্ট করে দিলে সাহেব রেফারি, এই জুলুম মুখ বুজে সহ্য করতে রাজি নয় তারা। মাঠে চড়াও হয়েই তৃপ্ত হল না। পার্কিং করা মোটর গাড়ি থেকে পেট্রোলের টিন টেনে নামিয়ে গ্যালারিতে আগুন জ্বালিয়ে দিলে। সে যুগে পাম্প থেকে সিধে মোটরের এঞ্জিনে পেট্রল ঢালার রেওয়াজ ছিল না, টিনে করে গাড়ির মধ্যে বয়ে বেড়াতে হত পেট্রল। মাঠের মধ্যে একদিকে আগুন, আর একদিকে কোলাহল ও সাহেব-বাঙালীর হাতাহাতি। মেম-সাহেবরা—"বাবুজ, হোয়াট ননসেন্স" বলে ভীতি ও উষ্মা প্রকাশ করছে, মিহি সুরে চূড়ান্ত উত্তেজনা মিশিয়ে। বেশ খানিকক্ষণ পরে এল পুলিশ ও গোরা। অবস্থা আয়ত্তে এল। ইংলিশম্যান পত্রিকা জোরের সঙ্গে বললে, ইংরেজের গোরা ও পুলিশ ছাড়া যে এদেশে শৃঙ্খলাসম্পন্ন জীবন সম্ভব নয়, এই উপলক্ষ্যে তা আর একবার প্রমাণিত হল। বর্তমান কালে মাঠের দক্ষিণে যে বিরাট কাঠের ফটক থাকে, প্রয়োজন বোধে ঘোড়সওয়ার পুলিশ ঢোকাবার জন্য, ১৯২১ সালের বিপর্যয়ের পরেই সেই ব্যবস্থা করা হয়। লোকে যা আশঙ্কা করেছিল, ঘটলো-ও তাই। কারণ খেলাটির পুনরনুষ্ঠান হল ঝমাঝম্ বৃষ্টিতে, অনেক গোলে হেরে গেল মোহনবাগান। পরের বছর ক্যালকাটার সবচেয়ে সেরা দলের বিরুদ্ধে আবার মোহনবাগানের সাক্ষাৎ শীল্ডের প্রথম রাউণ্ডেই। সে খেলাতেও ক্যালকাটা সেদিনের মত শুধু মুখে ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। শেষ মুহূর্তে নাইট দিয়ে দিলে এক গোল। সঙ্গে সঙ্গে সাদা গ্যালারিতে শ্বেতাঙ্গদের পরিমিত হাততালি সুশৃঙ্খল ও সুসভ্যভাবে এক সাথে সুরু হয়ে একই সঙ্গে থেমে গেল। আর দক্ষিণ-পূব কোণে ক্যালকাটার জামা পরা টেকো ও গুঁফো সজীব ভারতীয় ম্যাস্কটটা তার চিরাচরিত প্রথায় গোলের ধার পর্যন্ত ডিগবাজি খেতে লাগলো সার্কাসের ভাঁড়ের মত।

১৯২৩ সালের ফাইনালে ক্যালকাটা-মোহনবাগানের খেলা দেখবার জন্য সারা কলকাতা কোমর বেঁধেছিল। তারপর কাপড় গুটিয়ে হাঁটু-জল ভেঙে যারা পৌঁছুতে পারলে মাঠে, তারাও এই আশা নিয়েই গিয়েছিল যে খেলা হবে না। তাতে দুঃখ হত না, কারণ ও মাঠে মোহনবাগানের অনিবার্য পরাজয় সম্বন্ধে এতটুকু সংশয় ছিল না কারো মনে।

ক্যালকাটা-মোহনবাগানের শীল্ড সংগ্রাম শেষবারের মত বলা যেতে পারে ১৯৩৬ সালের সেমি-ফাইনালে। প্যাচপেচে কাদামাঠে সন্মথ দত্ত গোল-লাইনের বাইরে থেকে আলগোছে বল ঠেলে দিলে গোল-কীপার কে. দত্তকে, আর ধরতে গিয়েই কে. দত্ত পা পিছলে পড়ে গেল, বল ঢুকে গেল গোলে। অনেক সময় থাকা সত্ত্বেও সে গোল আর শোধ করতে পারলে না মোহনবাগান। অবিরত আক্রমণ করেও এপাশে ওপাশে শট মারলে শুধু।

মোহনবাগানের খেলায় সেকালে আবহাওয়াই যে প্রধান অংশ অভিনয় করেছে, তা একেবারে প্রথম যুগ থেকে। ১৯১৫ সালে প্রথম বিভাগ লীগের প্রথম বছরেই চ্যাম্পিয়ান মিড্‌লসেক্সকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে গোল দিয়ে বসলে মোহনবাগান। ঝিরঝিরে বৃষ্টি সুরু হয়ে গিয়েছিল আগেই, তার পর যে ঝড়বৃষ্টি নামলো, স্টেটস্‌ম্যানের মতে তা সে বছরের সবচেয়ে বড় দুর্যোগ। এরই মধ্যে গোল শোধ করে দিলে মিড্‌লসেক্স। তার পর হাফ-টাইমের কিছু পরে বৃষ্টি কমে এল, কিন্তু মাঠ যা হয়ে রইল তা অকথ্য। আরও তিনটে গোল দিয়ে জিতে গেল মিড্‌লসেক্স। সেবারই মোহনবাগান শীল্ড ফাইনালে উঠ্‌তে পারতো। কিন্তু কাস্টমসের সঙ্গে সেমি-ফাইনাল খেলা সুরুর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি এল ঝম্‌ঝম্ করে, দুগোল দিয়ে দিলে গ্যালব্রেথ। অথচ এই কাস্টমসকেই লীগের খেলায় শুকনো মাঠে দুগোলে হারিয়েছিল মোহনবাগান। প্রথম রাউণ্ডে মোহনবাগান হারিয়েছিল ড্যালহৌসীকে,

আর চার্চিল-সমেত লীগের রাণার্স-আপ ই. বি. এস. আর-কে হারিয়েছিল দ্বিতীয় রাউণ্ডে।

বৃষ্টির মধ্যে বেশীর ভাগই নাকাল হয়েছে মোহনবাগান, একথা সত্য। কিন্তু অল্পসল্প বৃষ্টি বা অনেক আগে বৃষ্টি হয়ে-যাওয়া কাদা মাঠকে সামলে নিয়েছে ওরা অনেক সময়। পনের সালে ই. বি. এস আর-কে যে হারালে তা বৃষ্টির মধ্যে। খেলা সুরুর সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নামা সত্ত্বেও ১৯২৪ সালের দুর্দান্ত ড্যালহৌসী দলকে ২—১ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল। ড্যালহৌসীর অসভ্যতায় রেফারি ডেমণ্ড খচে গিয়েছিল ওদের উপর। ১৯২৭ সালে চ্যাম্পিয়ান নর্থ স্টাফোর্ডসের সঙ্গে ফিরতি খেলা অম্বুবাচীর মধ্যে। চার দিন থেকে বৃষ্টি, সূর্যের অস্তিত্বের সাড়াশব্দটুকুও নেই। মাঠ হয়ে আছে চষা ক্ষেত। অনিবার্য পরাজয়ের আশঙ্কা নিয়েই মাঠে গিয়েছি। কিন্তু হাফ-গ্রাউণ্ডের একটু ওপাশ থেকে আউট-থ্রো-র বলে শুয়ে পড়ে এলসোনি মারে মোনা দত্ত এগিয়ে দিলে মোহনবাগানকে। সে গোল শোধ হয়ে গেলে আবার এগোল মোহনবাগান। পরাজয় নিশ্চিত জেনেই খেলা দেখতে গিয়েছিল যারা, তারা আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ২—২ গোলে ড্র হয়ে গেল খেলা, নৈরাশ্য ও বেদনায় টনটন করে উঠ্‌লো বুকের পাঁজর।

মোহনবাগান হেরে যাওয়ায় উপোস, অরন্ধন কথার কথা ছিল না, আত্মহত্যার খবরও মিলেছে। আবার কাস্টম্‌সের সঙ্গে ১৯২৫ সালের শীল্ডে ড্র করার পর, বুড়োর দল তরুণদের ক্ষেপাতে ছাড়লে না। উল্টোডাঙ্গা তেলকলের ধারে বটগাছে নাকি কতকগুলি লাশ ঝুলছিল, ওরা নাকি মোহন-বাগানের এগার জন খেলোয়াড়—গলায় দড়ি দিয়েছে। কুমারটুলির কাছে শীল্ডে হারার পরও গল্প চালু হয়েছিল। স্বামী বাড়ী ফিরে জামা-কাপড় ছাড়ে না, হাত মুখ ধোয় না, বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। স্ত্রী

জিজ্ঞাসা করে করে অনেক পরে জবাব পেলে, মোহনবাগান হেরে গেছে। লঘু বিস্ময় নিয়ে স্ত্রী প্রশ্ন করলে, "তাতে তোমার কি হয়েছে?" "তুইও কুমারটুলির দলে" সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে উঠলো স্বামী।

প্রথম বছর লীগে ১৪টি খেলায় ১৫ পয়েণ্ট করে চতুর্থ স্থান পেলে মোহনবাগান। কিন্তু পরের বছরই হল রাণার্স-আপ। অপরাজিত চ্যাম্পিয়ান ক্যালকাটা থেকে পাঁচ পয়েণ্ট পিছিয়ে থাকলেও সাতটা ম্যাচ জিতেছিল ওরা, লিঙ্কনসকেও হারিয়েছিল। কিন্তু ১৯২০ সালে যে ভাবে জিততে সুরু করলে গোড়া থেকে—ডি. সি. এল. আই-কে হারালে দুগোলে—মনে হল এবার বুঝি লীগ চ্যাম্পিয়ান হবেই। যোলটা খেলায় এগারটা জিতলেও, জল বৃষ্টি কাদায় হারতে হল দুটো ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত দু'পয়েণ্ট পিছিয়ে থাকতে হল চ্যাম্পিয়ান ক্যালকাটা থেকে। পরের বছর আবার সেই একই কাহিনী। দুই মিলিটারি দল রয়েল ওয়েস্ট কেণ্ট ও রয়েল স্কট ফুশিলিয়ার্স-কে কোণ-ঠাসা করেও দু'পয়েণ্টে আর মারতে পারলে না চ্যাম্পিয়ান ড্যালহৌসীকে।

তবে প্রত্যাশা গভীর হল ১৯২৫ সালে। একেবারে ভাঙ্গা দল। ব্যাকে গোষ্ঠবাবু প্রায় না খেলার সামিল। ফরোয়ার্ডে রবি গাঙ্গুলীর বদলে বৃদ্ধ হাবুল সরকারকে খেলতে হচ্ছে। রাইট-আউটে এবং সেণ্টার-ফরোয়ার্ডে কোন রকম পূর্বখ্যাতিবর্জিত অজানা খেলোয়াড় খোকা মুখার্জী ও করালী পাঠক। তাই নিয়েই মোহনবাগান চলেছে আগে আগে। এরিয়ানকে চার পয়েণ্ট ছেড়ে দিয়েও এগিয়ে রয়েছে। পিছে পিছে চলেছে ক্যালকাটা। মোহনবাগানের শেষ খেলা রেঞ্জার্সের সঙ্গে, যে রেঞ্জার্স লীগের তলায় এসে ঠেকেছে। অতএব, এবার বুঝি হল! কিন্তু আবার বাদ সাধলো আকাশ। ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি এল খেলার আগে। তাতে হয়তো ক্ষতি হত না, যদি রেঞ্জার্স তাদের নিজস্ব দল নিয়ে খেলতো। ভারতের মাটিতে সবচেয়ে শক্তিশালী

গোরাদল ডারহাম্‌স্‌ শীল্ডে নাম দিয়েছে বলে তাদের কিছু খেলোয়াড় আগেই এসে গেছে কলকাতায়। সে দলেরই তিনজন, রবিনসন, জব্লিন ও ব্রুক নেমে গেল রেঞ্জার্সের পক্ষে। আজকের মত কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না কিছু বাইরের খেলোয়াড়দের জন্য। লীগে একদলে খেলে, শীল্ডে অন্য দলে খেলছে, অমন হামেশা ঘটতো। ব্রুক-রবিন্সন-জব্লিন জলো মাঠে দুগোলে হারিয়ে দিলে মোহনবাগানকে। ড্র খেললেও যেখানে ক্যালকাটার সঙ্গে সমান পয়েণ্ট হত, আর এক হাত লড়ে দেখার সুযোগ মিলতো, সেখানে এক পয়েণ্ট পিছিয়ে আবার চতুর্থবার রাণার্স-আপ। খেলোয়াড় এবং সমর্থক সবাই গা এলিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাসে মনের চরম দুরাশা বাতাসে মিশিয়ে দিয়ে বললে, নাঃ, হল না আর আমাদের জীবনে।

তা বলে আশা কি মরে কখনো? পরের বছর সুরু থেকেই দুর্দান্ত বিক্রমে জিতে চললো আবার। এমন বাঘা দল নর্থ স্টাফোর্ডস্‌, তাকেও হারিয়ে দিলে। স্টেটসম্যান পর্যন্ত প্রশংসায় পঞ্চমুখ, এমন মনোরম খেলা কদাচ দেখা যায়। সেদিনই কুমারকে যাদুকর (wizard) আখ্যা দিলে ওরা। ক্যালকাটাকেও হারালে। ক্যালকাটার ওই একমাত্র পরাজয় সে বছরের লীগে। নর্থ স্টাফোর্ড অবশ্য আর একটা হেরেছিল ক্যালকাটার কাছে। প্রথম লীগে অপরাজিত থেকেও ফিরতি খেলায় বৃষ্টিকাদার মধ্যে তিনটে খেলায় হেরে গেল মোহনবাগান। তবে পায়ে বুট না উঠেও এবং শুক্‌নো মাঠে গতি ব্যাহত না হওয়া সত্ত্বেও এতদিনে মোহনবাগান কাদা মাঠে কিছুটা রপ্ত হয়ে উঠেছে। এত দিনের অভিজ্ঞতায় বুঝে নিয়েছে, কি করে খেলার কৌশল কিছুটা বদলে, দেহের ওজন মাটিতে চেপে এবং লম্বা পাস ও ড্রমড্রাম শট মেরে ভিজে মাঠে সবুট ভারি দলের সঙ্গে যুঝতে হয়। এ যুগেও জলকাদার মধ্যে হেরেছে-ই মোহনবাগান বেশির ভাগ, কিন্তু আগের মত আর নাকাল হয়নি, বা শোচনীয় পরাজয় সহ্য

করতে হয়নি নিরুপায়ের মত। এ যুগটায় ছিল শুকনো মাঠে জয়লাভের চৌদ্দ আনা সম্ভাবনা, ভিজেমাঠে মাত্র চার আনা। কিন্তু বিনা যুদ্ধে ডিগবাজি কোন মতেই কোন অবস্থাতেই নয়। আগের বারে ২২ পয়েণ্টে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ক্যালকাটা। এবারে সেই ২২ পয়েণ্ট-ই পেলে মোহনবাগান, সেই ষোলটা খেলায়। কিন্তু ক্যালকাটা ও নর্থ স্টাফোর্ড ২৬ পয়েণ্ট মেরে চ্যাম্পিয়ানশিপের চূড়ান্ত লড়াই করলে। শীল্ডে কোয়ার্টার-ফাইনাল অবধি এগিয়ে গেল মোহনবাগান অপ্রতিহত গতিতে। কিন্তু তার পর কাদা মাঠে শেরউড ফরেস্টার্সকে আর এঁটে উঠতে পারলে না।

কাগজপত্রের হিসেব মত ১৯২৬ সাল হয়তো মোহনবাগানের এমন মহাকৃতিত্বের বছর নয়। কিন্তু ১৯১১-র কথা ছেড়ে দিলে এই বছরকার দলগঠনই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। গোলে তেমন কড়া কেউ নেই; সন্তোষ দত্ত, অনু ভট্টাচার্য ও নৃপেন ভাদুড়ি ভাগাভাগি করে খেলছে। কিন্তু ব্যাকে গোষ্ঠ পাল ও আর. দাস, যার থেকে ভালো জুড়ি এক কলভিন-বেনেট ছাড়া হয়েছে কিনা সন্দেহ। হাফ-ব্যাক মতি সেন, বলাই চ্যাটার্জী ও সুধাংশু বসু; আর নরেন ব্যানার্জী, রবি গাঙ্গুলী, মোনা দত্ত, কুমার, ক্ষেত্র বোস নিয়ে গঠিত দুর্দম আক্রমণবাহিনী।

সত্যি কথা বলতে কি লীগে মোহনবাগানের গৌরব এর পর আর তেমন উঁচুতে থাকেনি। কারণ এর পর ১৯২৯ ও ১৯৩৪ সালে ডি. সি. এল. আই. এবং ড্যালহৌসীর সঙ্গে যথাক্রমে যুগ্ম রাণার্স-আপ হওয়াই লীগ তালিকায় ওদের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয়। অবশ্য ১৯৩৯ সালে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পূর্ববর্তী যুগের কথাই এখানে আলোচ্য। এর মধ্যে ১৯২৮ সালে চ্যাম্পিয়ান ড্যালহৌসীর বিরুদ্ধে ছাড়া প্রথম লীগের সব কটি খেলাতেই জয়ী হয়েছিল। ব্যারাকপুরের গোরাদল পি. ডব্লু. ভলাণ্টিয়ার্সকে

ছ গোলে হারিয়েছিল। পরের বছর ডি. সি. এল. আই-কে ছ গোলে ছত্রখান করেছিল।

মোহনবাগান এর পর থেকে লীগে যে পূর্বেকার উৎকর্ষ রক্ষা করতে পারেনি, তার অন্যতম কারণ প্রথম বিভাগে বাঙালী দলের সংখ্যাবৃদ্ধি। সাহেব বা গোরা-পল্টনের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের যে রূপ দেখা যেত, বাঙালীদলের বিরুদ্ধে সে দীপ্তি ম্লান হয়ে যেত অনেকখানি। ১৯১৫ সালে শীল্ডের সেমি-ফাইনালে পৌঁছুতে ওরা প্রবলতম বাধা পেয়েছিল টাউন ক্লাবের কাছে, তিন দিন বিনা-গোলে ড্র খেলার পর জিতেছিল মাত্র এক গোলে। টাউন ক্লাবের তখন প্রাচীনত্ব ছাড়া আর কোন গুরুত্ব নেই। অথচ তিনদিন অমীমাংসিত খেলার অন্তত একদিন তারাই খেলেছিল জয়লাভের যোগ্য খেলা।

এরিয়ান্স যতদিন লীগে একমাত্র সাথী ছিল মোহনবাগানের, তাতে বিপদ ছিল না। দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিক থেকেই এমন দুর্বল হয়ে পড়েছিল এরিয়ান্স, যে তাদের নেমে যাওয়ার আশঙ্কা রদ করার দায়িত্ব সম্বন্ধে নিরন্তর সচেতন থাকতে হয়েছে বড়দা মোহনবাগানকে। বছরে চারটে করে পয়েণ্ট ছাড়তে হয়েছে একাধিকবার। একবার ব্যাপরটা এমনই চোখে ঠেকলো, গোষ্ঠবাবু সেণ্টার-ফরোয়ার্ড খেললেন, গোল-কীপার বল ধরে পিছু হঠে গোল-লাইন পার করে দিলে বল। তার জন্য আই. এফ. এ-র সভা ডেকে তিরস্কার পর্যন্ত করা হল মোহনবাগানকে। কিন্তু কি করবে মোহনবাগান? ব্রিটিশ মুষ্টিগত আই. এফ. এ-তে কোন ছুতো পেলেই দূর করে প্রথম বিভাগ থেকে ঠেলে দেবে দুখীরাম স্তরের গরীব এরিয়ান্সকে। মোহনবাগান রক্ষা না করলে কে করবে?

কিন্তু ১৯২৫ সালে ইস্টবেঙ্গল যখন এল প্রথম বিভাগে, তাদের

প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্যালকাটা, ড্যালহৌসী বা পল্টনী দলগুলির সঙ্গে হল না; তারা প্রবলতম প্রতিপক্ষ মানলে মোহনবাগানকে। সাহেবদলগুলো তো শক্তিশালী আছেই। কিন্তু দেশী দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের একচ্ছত্র দাবী মোহন-বাগানের আর নয়, ওদেরও পরিপূর্ণ দাবী আছে সে সম্মানে, এই কথা সপ্রমাণ করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলো ইস্টবেঙ্গল। প্রথম খেলাতেই এক গোলে জিতে দাবী কিছুটা প্রতিষ্ঠাও করলে। কিন্তু জনগণের মনের মধ্যে স্থায়ী আসন করতে অনেক সময় লেগেছিল ইস্টবেঙ্গলের। ভারতীয় ফুটবল-প্রেমিক মাত্রই সেদিন মনের সিংহাসনে মোহনবাগানকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে; সেখানে আর কাউকে বসানো যায় কি না, তা বড় কথা নয়। প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ নড়ানো—তাও কি সম্ভব? শাস্ত্রের নিষেধ, প্রেমব্যবহারের সমগ্র নীতির বিরোধী, অন্তরের ধর্ম তাতে ব্যাহত হয়।

তাই ইস্টবেঙ্গলের বহু সদস্য তখন দোটানায় পড়ে দুদলকে ভালো-বেসেছে। এমন কি বহু বর্ষীয়ান মুসলমান মহামেডান স্পোর্টিং-এর যুগে নব-অভ্যুদিত দলের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েও বলেছে—আরে বাপ্, মোহনবাগানসে থোড়াই লড়াই, ওতো হামলোগোকা পুরানি পেয়ার।

কিন্তু পূর্বপ্রেমের বাধাবিহীন তরুণের দলই ইস্টবেঙ্গলের অভ্যুদয়ে মোহনবাগানকে নস্যাৎ করা সুরু করলে। আবার মহামেডানের অভ্যুদয়ে মুসলমান তরুণকুলের মনে দৃঢ় বিশ্বাস হল, মোহনবাগানকে হারাণোই মহামেডান স্পোর্টিং-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান এবং সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ।

যখন আপনা থেকেই বাঙালী ফুটবলরসিক সমাজে এমনি ভাঙন ধরবার উপক্রম, ঠিক সূচনাতেই তাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিলে তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার কুখ্যাত স্যর চার্লস টেগার্ট। প্রথম বিভাগে উঠেই ইস্টবেঙ্গল যখন তার কাছে ময়দানে ভালো একটা মাঠ চাইলে, টেগার্ট সাহেব মোহনবাগানকে বাধ্য করলে ইস্টবেঙ্গলকে অংশীদার করে নেবার জন্য।

ইস্টবেঙ্গলের সংগঠক ও তরুণ সমর্থকসমাজ তাদের ক্লাবকে মোহনবাগানের সমবিক্রম বলে জ্ঞান করছে সেই সময়েই। আর সেই অবস্থায় দুই সিংহকে একই খাঁচায় থাকবার ব্যবস্থা করে টেগার্ট সাহেব-ই, বর্তমানে দুই ক্লাবের সমর্থকদের মধ্যে যে তীব্র বিদ্বেষ, তার জন্য ক্ষেত্র তৈরী করে তাতে বীজ পর্যন্ত বপন করে দিয়ে গিয়েছে। একই মাঠে পাশাপাশি তাঁবু ও লাগালাগি সদস্য আসন। ফলে, এর পরাজয়ে ও টিটকারী দেয়, এদল জয়লাভ করে ওদলকে কলা দেখায়। এদলের সমর্থক খেলা দেখার প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে ও দলের মধ্যে আসন নিয়ে মনোভাব প্রকাশ করতে নাকাল হয়ে পড়ে; তা থেকে খণ্ডযুদ্ধও সুরু হয়ে যায়।

শুধু ইস্টবেঙ্গলই কেন? কুমারটুলি, স্পোর্টিং ইউনিয়ান, ভবানীপুর, হাওড়া ইউনিয়ান—সবাই প্রাণপণ করে খেলেছে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে, অবশ্য যখনই সুযোগ পেয়েছে প্রতিপক্ষ হবার। মোহনবাগানের সার্থকতা ছিল ক্যালকাটা, ড্যালহৌসী ও পল্টনী দলগুলোকে কাবু করায়। আর অন্যান্য ভারতীয় দল মনে করেছে মোহনবাগানকে কাবু করাই সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। প্রকারান্তরে তাতে মোহনবাগানের শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকৃত হয়েছে বটে, কিন্তু রেষারেষিও কম জাগেনি তার ফলে। ১৯২০ সালে শীল্ডের সেমি-ফাইনালে বৃষ্টির মধ্যে একটিমাত্র বুট-পায়ে খেলোয়াড় হুইটলে-র জোরে মোহনবাগানকে হারিয়ে দিলে যখন কুমারটুলি ২—১ গোলে, তখন কুমারটুলি যে অনেক শক্তিশালী দল এবং নাম করে করে কুমারটুলির প্রতিটি খেলোয়াড় যে মোহনবাগানের প্রতিটি খেলোয়াড়ের চেয়ে কৃতী, এমন চেঁচামেচি করার লোকেব দেখা পাওয়া গিয়েছিল। তারপর যখন কুচবিহার কাপে মোহনবাগান বাঙালী দল মেডিকেল কলেজ এবং হাওড়া ইউনিয়ানের কাছে হেরে যায়, তখনও একদল অনুরূপ মন্তব্যই করেছিল। কুমারটুলির তুলসী দত্ত এবং হাওড়া ইউনিয়ানের দেবী ঘোষ যে গোষ্ঠ

পালের চেয়ে অনেক ভাল ব্যাক, এই উপলক্ষ্যে ওই তুজন সম্পর্কে এমন গলাবাজিও শোনা গেছে। শিষ্টজনোচিত খেলার আলোচনা এবং সমালোচনা নয়, নিছক অশিষ্ট মন্তব্যে মোহনবাগানকে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা। তারপর যখন মহামেডান স্পোর্টিং সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল দল বলে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছে, তখনও সে পক্ষের উগ্র সমর্থকদের মুখে ওই একই সুরের প্রতিধ্বনি, স্পোর্টিং খেলেগা না খেলেগা কি তেরি মোহনবাগান। গান বেঁধেছে ওরা, মোহনবাগান উলট গিয়া, কিল্লা ফতে হো গিয়া।

যাই হোক, পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। প্রথম বিভাগ লীগে বাঙালী দলের সংখ্যাধিক্যে তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভের অনিশ্চয়তার ফলেই লীগের তালিকায় মোহনবাগানের স্থান নীচু হয়ে গেল। ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে বাধা দূর হতেই ১৯২৯ সালে প্রথম বিভাগে এল স্পোর্টিং ইউনিয়ান, ১৯৩২-এ হাওড়া ইউনিয়ান, পরের বছর কালীঘাট, ১৯৩৪-এ মহামেডান স্পোর্টিং, ১৯৩৭ সালে ভবানীপুর। অবশ্য এর মধ্যে ১৯৩৪-এ স্পোর্টিং ইউনিয়ান ফিরে গেছে দ্বিতীয় বিভাগে, হাওড়া ইউনিয়ান ফিরে গেছে ১৯৩৬ সালে। তবে এই যুগে মোহনবাগানের প্রতিপক্ষের যে মোটামুটি রূপান্তর ঘটেছে, মোহনবাগানের খেলায় পূর্বের হীরকদ্যুতি লোপ পাওয়ার তা অন্যতম প্রধান হেতু।

অবশ্য অপর কারণের গুরুত্বও কম নয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে যে দল ছিল মোহনবাগানের, তেমন দল তারপর আর হয়নি। রাজেন সেন, অভিলাষ ঘোষ, বলাই চাটুজ্যে, বাঘা সোম এবং সম্মথ দত্ত'র পর আর তেমন জোরালো সেণ্টার-হাফ এল না। এরা সবাই শেষ হয়ে গেল দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই। সম্মথ দত্ত পিছিয়ে ব্যাক খেলতে লাগলো। আবতুল হামিদ এল, তাও মাত্র তিন বছর। ব্যাকে গোষ্টবাবুর বয়োবৃদ্ধির পরেও কিছুদিন সাথে আর. দাসের মত জুড়ি ছিল। তারপর প্রতি বছরই

তাঁকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নাকচ করে নিরুপায় হয়ে মাঠে নামতে হয়েছে। চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অবশ্য সন্মথ দত্ত পূর্ণশক্তিতে খেলেছেন, কিন্তু একজনে কি দল হয়? সুরেন ঠাকুর, মতি সেন, মণি দাস ও সুধাংশু বসুর পর চতুর্থ দশকে একমাত্র নক্ষত্রমার্কা সাইড-হাফ হয়েছে বিমল মুখার্জী; আর ফরোয়ার্ডে কুমার, রবি গাঙ্গুলী, পণ্টু দাশগুপ্ত, নীরজ গাঙ্গুলী, আশু দত্ত, নরেন ব্যানার্জী, হেমাঙ্গ বোস, রবি বোস, ক্ষেত্র বোস সবাই তো দ্বিতীয় দশকেই শেষ। পরবর্তী যুগে প্রকৃত ধারওয়ালা ফরোয়ার্ড খেলেছে সতু চৌধুরী, হাবলা ভট্টাচার্য ও পণ্টু গাঙ্গুলী। অভিলাষ ঘোষ, শরৎ সিংহ মোনা দত্তর স্থান দখল করবার মত সেণ্টার-ফরোয়ার্ড পাওয়া যায়নি।

তবু লীগে যাই হোক না কেন, দলের ঐতিহ্য, নামের জোর আর জামার গুণ—এই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে শীল্ডে লড়ে গেছে মোহনবাগান তারপরও বহু দিন, জল বৃষ্টি কাদা সত্বেও। এ যুগের মত রেঞ্জার্স, জর্জ টেলিগ্রাফ ও বার্ণপুরকে হারিয়ে নয়, লিস্টার্স, প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভলাণ্টিয়ার্স ও কাস্টম্স্কে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে উঠতে হয়েছিল ১৯৩১ সালে। সেখানেও সাক্ষাৎ এইচ. এল. আই-র সঙ্গে। আগের ম্যাচে আহত হয়েছে সন্মথ দত্ত, কুমার ও রাইট-আউট আর. চৌধুরী। তাদের বাদ দিয়েই খেলতে হল। তাতেও পরোয়া নেই, ১—১ গোলে ড্র। শেষ মুহূর্তে ফাঁকা গোল পেয়েও অ্যাটিলি যদি বল উঁচু করে মাঠ পার করে না দিত, তবে সারা দিন ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি সত্বেও জয়লাভ ঠেকাত কে? রয়াল আইরিশ লিস্টার্স, উইল্টশায়ার—যেই হারিয়েছে মোহনবাগানকে অনেক ভালো খেলেই হেরেছে মোহনবাগান। ব্যাপারটা খবরের কাগজের হেডিং নিয়ে রসিকতার বিষয় নয়। শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত গোল শোধের প্রাণপণ চেষ্টা করেছে মোহনবাগান। বিপক্ষের গোলকীপার ও ব্যাক হয় ত অসম্ভব রকম ভালো খেলেছে। না হয় আধ ইঞ্চি এপাশ ওপাশ বা উপর দিয়ে গিয়েছে

বল, বারে বা পোস্টে লেগে ফিরেছে, নয়তো ফাঁকা গোলে শট করতে গিয়ে খালি-পা হড়কে পড়ে গেছে ফরোয়ার্ড। ১৯২৯ সালে যখন অমিত বিক্রমে কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠে গেল, স্টেটসম্যান লিখলে, আঠার বছর বাদে আবার বুঝি এগার সালের পুনরাবৃত্তি ঘটে। সে আশা জাগিয়েছিল মোহনবাগান খেলার কৌশলে। কিন্তু অসম্ভব কাদা বৃষ্টির মধ্যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে অতিরিক্ত সময়ে একগোলে হেরে গেল রয়াল আইরিশ ফুশিলিয়ার্সের বিরুদ্ধে।

শীল্ড বরাবরই ভিজে মাঠে খেলা হয়েছে। তাই দ্বিতীয় দশকের প্রথম যুগে একবার ফাইনালে যাওয়া সত্ত্বেও মোহনবাগান প্রায়ই এক দু রাউণ্ডে-ই কাৎ হয়েছে। তা বলে বিনা যুদ্ধে কখনও নয়। ১৯১৭ সালে মিডলসেক্সের কাছে যে হারলে, তাও অতিরিক্ত সময়ে ২-৩ গোলে। বৃষ্টির মধ্যে খেলতে পারার কৌশল আবিষ্কার হল অনেক পরে। ১৯৩৫ সালে আবদুল হামিদের প্রচেষ্টায় এবং মহামেডান স্পোর্টিং-এর দেখাদেখি যখন বৃষ্টিকাদায় হাল্‌কা বুট ব্যবহার সুরু হল, তখন শীল্ডে যুঝবার হাতিয়ার হল আরও কার্যকরী। সব চেয়ে থি্লিং জয় লাভ হল ১৯৩১ সালে লিস্টার্সের বিরুদ্ধে। দু গোলে পিছিয়েও শেষ মুহূর্তে সতু করে দিলে সমান সমান, তার পর অতিরিক্ত সময়ে মোনা দত্ত জিতিয়ে দিলে। তা বলে শুক্‌নো মাঠের খেলার সঙ্গে কি তুলনা! ১৯৩৬ সালে ইয়র্কস এ্যাণ্ড ল্যাঙ্কস্‌কে যখন ছ' গোলে হারালে, উচ্ছ্বসিত হয়ে অমৃতবাজার বললে, মোহনবাগানের স্বর্ণযুগের দীপ্তি পুনরুদ্ভাসিত। কুমার সম্পর্কে বললে, মখমলে তৈরী তার পায়ের আঙ্গুল, আরও কত কি? পরের বছর চতুর্থ রাউণ্ডে অতিরিক্ত সময়ে আবার লিস্টার্সের কাছে পরাজয়। আর আটত্রিশ সালে, হায় হায় দ্বিতীয় বিভাগের দল হাওড়া ইউনিয়ান হারিয়ে দিলে, বাঙালীদলের বিরুদ্ধে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে।

মহামেডান স্পোর্টিং-এর একটানা দুর্জয় অভিযানের সাফল্যে যখন নৈরাশ্য চরমে পৌঁছেছে, তখনই এল প্রতিক্রিয়া। ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ মিলিটারী দল তখন প্রায় গত, তারই মধ্যে নতুন পরিবেশে জন্ম হল নতুন মোহন-বাগানের। আই. এফ. এ-র সঙ্গে মতভেদের ফলে মহামেডান স্পোর্টিং ইস্টবেঙ্গল এবং কালীঘাট যখন লীগ থেকে সরে গেল, মোহনবাগান তখন ছ পয়েণ্ট এগিয়ে আছে, কার সাধ্য ধরে! ধরতে এলোও না কেউ, রণে ভঙ্গ দিয়ে চলে গেল। চ্যাম্পিয়ান হল মোহনবাগান। অগণিত ভক্ত-সমর্থকের স্বপ্ন সফল হল পঁচিশ বছরের চেষ্টায়। কিন্তু স্বপ্ন কি সার্থক হয়েছে? বাঘা বাঘা পল্টনী দল, সাম্রাজ্যের ও অন্নবস্ত্রের মালিক জনবুলী মেজাজের ক্যালকাটা, এবং কাঠ-গোঁয়ার পেটো ড্যালহৌসীকে পদানত করে লীগ নেওয়া, আর ঘরোয়া খেলায় জেতার সার্থকতা—একই জাতের হতে পারে না। এ জয় হয়েছে শুধু খেলায়, রাজ্যজয় বা জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে চূড়ান্ত জয়লাভ ১৯১১ সালের পরে আর হল না কোনদিন। শুধু চেষ্টা করে রুখেই সার্থকতা মানতে হল।

পরের বছর ১৯৪০ সালে শীল্ড ফাইনালে গেল মোহনবাগান। কলকাতা ফুটবলে পুরোপুরি ভারতীয়করণের প্রথম বছর সেবার। কিন্তু নিশ্চিত জয়লাভের পরিবর্তে ঘটলো এরিয়ান্সের হাতে ১-৪ গোলে পরাজয়। এ নিয়ে জল্পনাকল্পনা, গবেষণা ও অপবাদের সীমা রইলনা। খেলোয়াড়দের কেউ কেউ ঘুষ খেয়েছে, এমন অপবাদ রটনা করতে কুণ্ঠা বোধ করলে না অনেকে।

এর পরবর্তী ইতিহাস যথেষ্ট উজ্জ্বল হলেও মোহনবাগান যে সংগ্রামী জাতির প্রতীক, সে সত্তা লুপ্ত হয়ে গেছে এতদিনে। মোহনবাগান এখন ভারতের প্রাচীনতম ফুটবল তথা অন্যান্য খেলার ক্লাব। অন্যতম প্রধান এবং জনপ্রিয় ক্লাবতো বটেই।

সদস্য সংখ্যা বর্তমানে তিন হাজারের উপরে উঠেছে, সদস্যপদের কাঙাল সংখ্যা চাকরী-প্রার্থীদের ছাড়িয়ে যায়। অর্থমর্যাদাও অপরিসীম। সরকারী এবং বে-সরকারী অভিজাত সমাজের পোষকতাও প্রচুর। বিরূপ আই. এফ. এ-র বদলে এখনকার আই. এফ. এ মোহনবাগানের বন্ধুত্বের জন্য অন্য সব ক্লাবের বৈরিতা সহ্য করতে প্রস্তুত। বিজাতীয় বৈরী রেফারীর দল লোপ পেয়েছে। লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের এবং শীল্ড বিজয়ের মর্যাদা বহুবার জুটেছে তাই নয়, প্রতিবারই জুটতে পারে। খুব কম হলে আট আনা সম্ভাবনা আছেই। তবে প্রতিযোগিতা তো প্রতিবারই সেই চেনা এবং জানা ক্লাব কটির সঙ্গে। ঘুরে ফিরে এদলে ওদলে সেই একই খেলোয়াড়। অজানা শত্রুর সম্মুখীন হবার, অনিশ্চিতকে জয় করার সে শিহরণ, সে থ্রিল একেবারেই লোপ পেয়ে গেছে। বর্তমান কালের সমর্থকদের মনোভাব হল লীগ এবং শীল্ড দুই-ই মোহনবাগানের প্রাপ্য, না পাওয়াটাই অস্বাভাবিক। যদি মোহনবাগান না পায়, তবে ইস্টবেঙ্গলের পাওয়াটাই কোন মতে সহ্য করা সম্ভব। কারণ বিপক্ষ হলেও প্রতিপক্ষ। অর্থে সদস্য-সংখ্যায় ও সমর্থকদের বিরাটতায় ওরাই তবু পাশে দাঁড়াতে পারে। আর মোহনবাগানের তুলনায় বয়স যতই কম হোক, ওরাই বয়সে প্রাচীন। বর্তমানের ফুটবলে তাই প্রধান উত্তেজনা মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সবই ভালো, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা কিন্তু থেকে যায়, মনে হয়—"যত কর সাজ যত হাস আজ," তেমন করে সমগ্র গণমানসকে অভিভূত করার ও দোলা দেবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে মোহনবাগান। অবশ্য তা জাতির সামগ্রিক জীবনে ঐতিহাসিক পরিবর্তনেরই অনিবার্য পরিণতি। তাই দুঃখ নিরর্থক।

একদিন এই মোহনবাগানই কলকাতা ফুটবলের বাণী বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল আসমুদ্রহিমাচল। সাহেবী দলের প্রতিযোগিতা বোম্বাইয়ের রোভার্স

কাপ খেলতে মোহনবাগান যেদিন আমন্ত্রিত হয় ১৯২৩ সালে, বোম্বাইয়ের জনসাধারণও সেদিন থেকেই ফুটবলের রসে মশগুল হয়ে পড়ে। সোজা ফাইনাল পর্যন্ত উঠেও যায় মোহনবাগান দুর্দম বিক্রমে। ফাইনালে দশ মিনিট মাত্র যখন বাকী, তখনও এক গোলে এগিয়ে মোহনবাগান। তারপর সেই বেয়াড়া টিম ডারহামস দিয়ে দিলে চার গোল। এই উপলক্ষ্যে একটা গল্প চলতি আছে। কোন খেলোয়াড়ের নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু হয়েছিল। বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম গেল — এখনি চলে এসো, কাল শ্রাদ্ধ। জবাবে সে তার করলে, শ্রাদ্ধ স্থগিত রাখ, কাল ফাইনাল। এমনি ছিল ক্লাবের প্রতি খেলোয়াড়ের প্রাণের আকর্ষণ।

বোম্বাই-এ মোহনবাগানের জনপ্রিয়তা এত বেড়ে গেল যে ১৯২৭ সালে চ্যারিটি খেলার জন্য ডেকে নিলে ওদের, চেশায়ারের সঙ্গে ড্র হল সে খেলা। বোম্বাই-এর রোভার্স কাপ যে আজ ভারতের অন্যতম প্রধান প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে, মোহনবাগানের অংশ গ্রহণেই সে স্বীকৃতি সর্বপ্রথমে মিলেছিল।

ওদিকে হিমালয়ের বুকে শৈলবিহার সিমলায় বৃটিশ পল্টনীদলগুলির নিজস্ব প্রতিযোগিতার জাত মেরে পরিচালক সৈন্যবিভাগ ১৯২৫ সালে খেলতে ডাকলে মোহনবাগানকে। বার্কশায়ার, ইয়র্কস অ্যাণ্ড ল্যাঙ্কস ও এসেক্সকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে এসে শেরউডের কাছে হেরে গেল ১—২ গোলে, প্রাণপণ সংগ্রাম করে। সারা সিমলা ক্ষেপে গেল মোহনবাগান মোহনবাগান করে। পরে মোহনবাগান নয়া রাজধানী দিল্লীতে নবকলেবর ডুরাণ্ড কাপ জয় করেও এনেছে। কিন্তু সে জয়ে কি আজ আর ধনঞ্জয় আখ্যার অবকাশ আছে?

মোহনবাগানের এই গৌরবোজ্জল ইতিহাসের ভিত পত্তন করেছিল প্রথম দশকের যেসব সেরা খেলোয়াড়, তার মধ্যে অতুলনীয় এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্

শিবদাস ভাদুড়ী। গোষ্ঠবাবু বলেছেন—ফুটবলে ভগবদ্দত্ত মণীষা বলতে এক মাত্র শিবদাসকেই বলা চলে, শুধু সাধনার বলে সে উৎকর্ষ লাভ করা সম্ভব নয়। অবশ্য বিজয়দাস ভাদুড়ীর খেলায় অনেক বেশি চটকদারি ছিল। পায়ের কায়দায় সামাদের মত বিপক্ষ-নাচানো দক্ষতাও ছিল বিজয়দাসের। কত সময় দলের সবার দুমিনিট দম নেবার প্রয়োজনে বিজয়দাস নিজের পায়ে বল রেখে সময় কাটিয়েছে। কিন্তু পায়ের কায়দায়, গোল-করার মত জোরালো এবং কৌশলী শটে, আর বুদ্ধির চকিত দীপ্তিতে আক্রমণের কৌশল মুহুর্মুহু পরিবর্তনে শিবদাসের জুড়ি কখনও দেখা যায়নি।

ব্যাক সুকুল ১৯০৯ সালে ফরোয়ার্ড খেলতেন, তারপর ব্যাকে পিছিয়েও তিনি অনবদ্য দক্ষতার পরিচয় দেন। সুকুলের জুড়ি ১৯১১ দলের একমাত্র সবুট খেলোয়াড় সুধীর চ্যাটার্জী ছিলেন এল. এম. এস কলেজের অধ্যাপক। ছাত্র হিসেবে খেলবার সময়, ফরোয়োর্ডদের একতরফা আক্রমণে নিশ্চিন্ত হয়ে সেণ্ট্রাল কলেজের গোলকীপার যখন পোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করছিল, নিজের গোলের কাছ থেকে এক শটে গোল করেছিলেন সুধীর চ্যাটার্জী। এই জুড়ি অল্পকালের মধ্যেই নিজেদের মধ্যে এমন অপরূপ সমঝোতা কায়েম করে নিয়েছিলেন, যে তাঁদের ভেদ করে দুর্গ আক্রমণ করা কোন ফরোয়োর্ডদের পক্ষেই প্রায় অসম্ভব ছিল। যে সময় তিনবার ট্রেডস কাপ ও চারবার কুচবিহার জয়ী হয় মোহনবাগান, সে সময়ের প্রধান খেলোয়াড় ছিলেন—হীরালাল ; গিরিশ ঘোষ ও সুধীর চ্যাটার্জি ; এন. ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল রায় বা হাবুল সরকার ও কে. সিংহ ; দানু, দুখী, এইচ. মিত্র, বিজয়দাস ও শিবদাস।

হাবুল সরকার সেণ্টার-হাফ ছেড়ে এগিয়ে আসেন রাইট-ইনে, তারপর শীল্ড জিতে পরে আবার লেফট-হাফে পিছিয়ে যান। শিবদাসের পর তিনিই হন দলের অধিনায়ক। অবসর গ্রহণের পর ছ-সাত বছর বাদে ঠেকা বুঝে

১৯২৫ সালে তিনি অনেকগুলি ম্যাচ খেলেন। বাঙালীদের মধ্যে হাবুল সরকার একজন চৌকষ খেলোয়াড়। হকীতে তাঁর মত ব্যাক বাঙালীর মধ্যে আর হয়েছে কিনা সন্দেহ। ক্রিকেটেও তিনি কৃতী ব্যাটসম্যান ছিলেন।

ঢাকার রাজেন সেনগুপ্ত অক্লান্ত পরিশ্রমী সেণ্টার-হাফ। পরে সেণ্টার-হাফ খেলেন অভিলাষ ঘোষ। কানু রায় ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। পরবর্তী সালে মোহনবাগান এবং উয়াড়ী দুদলেই খেলেছেন, রাইট-আউটে এবং লেফট-আউটে সমান যোগ্যতা দেখিয়েছেন।

এই দলের পরে মোহনবাগান দলে যে দুজন খেলোয়াড় মোহনবাগানের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি বাড়িয়েছেন, তাঁরা হলেন গোষ্ঠ পাল ও উমাপতি কুমার। গোষ্ঠবাবু ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাক বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন। দুখীরাম বাবু বলতেন, গোষ্ঠ হেঁটে বেড়ায় যেন মত্ত সিংহ বিচরণ করছে। ইংলিশম্যান নাম দিয়ে ছিল "চাইনীজ ওয়াল", দুর্ভেদ্যতায় বস্তুতই তিনি ছিলেন চীনের প্রাচীর। ধীর স্থির বলিষ্ঠদেহ স্পোর্টসম্যানশিপে এবং ভদ্রতায় তাঁর জুড়ি দেখা যায়নি। অথচ গোষ্ঠপালকে এগিয়ে আসতে দেখে ভয় পায়নি, এমন বুকের পাটাওয়ালা ফরোয়ার্ড কলকাতায় খেলেনি। মোহনবাগানের এবং ভারতীয়দলের অধিনায়ক হিসেবে এবং অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেবার পরও ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি সকল ফুটবলারের নমস্য ছিলেন, আজও আছেন। হকীতে হাবুল সরকারের সঙ্গে ব্যাক খেলে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ক্রিকেটে এবং টেনিসেও তাঁর দক্ষতা সুপ্রমাণিত।

উমাপতি কুমার বা কুমার বাবুর খেলায় যে সূক্ষ্মকৌশল ও বুদ্ধির দীপ্তি দেখা গেছে, তেমনটি আর কেউ দেখাতে পারেনি। ১৯১৮ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত একটানা খেলেও যাঁকে পায়ে একটা অ্যাঙ্কলেট বা নীক্যাপ বাঁধতে

হয়নি, তিনি যে কত সূক্ষ্ম খেলোয়াড় ছিলেন, তা কি আর বলে দিতে হয়! কুমারবাবু বলে হেড দেননি কখনো, আচমকা এক আধবার যা লেগে যেত। কিন্তু মাথার বাইরের অংশ ব্যবহার না করলেও, ফুটবলে মস্তিস্কের ব্যবহার এতখানি আর কেউ করেছে কিনা সন্দেহ। যতজন বিপক্ষই সাঁড়াশী-ব্যূহ রচনা করে ঘিরে ধরুক তাকে, ঠিক বল এগিয়ে দেবেই সে গোলের মুখে সেণ্টার-ফরোয়ার্ডকে, অথবা আউটের পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে সেণ্টার করার উপযুক্ত করে। গোলের মুখে থ্রু-পাস দেওয়ার প্রবর্তক কুমারকেই বলা হয়। ধাক্কা নেই, হাকফাঁক নেই, অথচ মাথার মধ্যে চকিতে কত কৌশল ভেবে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা কাজে প্রতিফলিত করছে। নিজের দলের লেফট-আউট হরিণ-গতি ক্ষেত্র বোস বা ভারতীয় দলের লেফট-আউট সামাদ, কিংবা বে-সামরিক (সিভিল) অথবা স্থানীয় (লোকাল) দলে নাইট—এদের যার পাশেই খেলেছেন কুমারবাবু, সে জুড়ির খেলা হয়েছে নয়নমনোমোহন, অথচ বিপক্ষ রক্ষণ-ব্যূহ ছত্রখান হয়ে গিয়েছে। গোষ্ঠবাবুর পর কুমার বাবুই মোহনবাগান এবং ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন।

কানুবাবু এবং শিবদাসের পরে আউট হিসেবে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, তাঁরা হলেন—রাইটে প্রকাশ ঘোষ, আশু দত্ত, নরেন ব্যানার্জী, ও মানা গুঁই। লেফটে পল্টু দাশগুপ্ত, নীরজ গাঙ্গুলী, ক্ষেত্র বোস, ও সতু চৌধুরী। দাশ গুপ্ত ও গাঙ্গুলী দুই সীমান্তেই খেলতেন। অদ্ভুত দ্রুতগতি। ক্ষেত্র বোসের আবার গতির সঙ্গে দম। নরেন ব্যানার্জী বল কাটিয়ে ফ্ল্যাগ পর্যন্ত নেবেই যে কোন বিপক্ষের বিরুদ্ধে। আশু দত্ত ছিলেন আউট থেকে গোল করার ওস্তাদ। আর সতু চৌধুরীর সেণ্টার ছিল সব চেয়ে বিপদজনক। ক্ষেত্র বোসের মত চলতি বলে সেণ্টার নয়, কিন্তু বল থামিয়ে সেণ্টার করলে বা ফ্রী-কীক করলে তাতে বিপক্ষের সমূহ বিপদ অনিবার্য। সামাদ-ও খেলেছিল মোহনবাগানে। ১৯২৬ সালে ডুরাণ্ড কাপে ডারহামস-এর

বিরুদ্ধে সামাদের শ্রেষ্ঠ খেলা মোহনবাগানেরই পক্ষে। হাঁটু ভাঙ্গা বলাইদার ব্যর্থতায় প্রথম পনের মিনিটে তিন গোল খেয়ে নিজেদের গোল এলাকায় আবদ্ধ মোহনবাগান। একটি বল পেয়ে ডারহামসের দশজনকে নাজেহাল করে সে বলে সামাদ মোনা দত্তকে দিয়ে গোল করালে। যারা দেখেছেন, বর্ণনা করতে আজও আনন্দে কেঁদে ফেলেন তাঁরা।

হাবুলবাবুর পরে প্রধান রাইট-ইন রবি গাঙ্গুলী। এমন ড্যাশিং খেলোয়াড় আর হয়েছে কিনা সন্দেহ। ১৯২৪ সালে আই. এফ. এ. দল যখন দূর প্রাচ্য সফরে যায়, তখন বাটাভিয়ার ডাচ-দল হারিকিউলিস-এর চোদ্দবছর গোল-না-খাওয়া গোলকীপারকে চার্জ করে গোল করেন। সেই দৈত্যাকৃতি গোলকীপার অবশ্য ওকে ঘায়েল করে দেয়। এর পরে আর রবি গাঙ্গুলীকে পূর্ণ দীপ্তিতে দেখতে পাওয়া যায়নি। রবি গাঙ্গুলীর প্রায় সমসাময়িক, আউটে ও ইনে সমান যোগ্য ছিলেন ক্রিকেটার হেমাঙ্গ বসু। আর যাঁরা ইন খেলে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁরা হলেন—অ্যাটিলি, পণ্টু গাঙ্গুলী ও করুণা ভট্টাচার্য ওরফে হাবলা। অ্যাটিলি মাদ্রাজী, বাংলা ফুটবলের সর্ব্বপ্রথম মৌসুমী পাখী। যথাকালে খেলতে আসতো কলকাতায়, খেলার শেষে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরত। অনেক সময় সে সেণ্টার-ফরোয়ার্ড খেলেছে। ধনুকের মত বাঁকা দুপায়ে চড়াক করে শট মারতে পারতো, এই ছিল তার প্রধান বৈশিষ্ঠ। তৃতীয় দশকে রবি গাঙ্গুলীর শূন্য স্থান কিছুদিন পুরণ করেছিলেন উয়াড়ীর রবি বসু। রবি বসুর মত অমন চটকদারি খেলা খুব কম দেখা গেছে, বিপক্ষকে নাজেহাল করতে সেরা ওস্তাদ।

অভিলাষের মত ধাক্কা-মারা সেণ্টার-ফরোয়ার্ড আর হয়নি। অভিলাষ সেণ্টার-হাফে পিছিয়ে যেতে আবার শরৎ সিংহকে খেলান হয়, দুপায়ে সমান তীব্র শট নিয়ে সে গোরাদের অনেক গোল দিয়েছে। হাফ-গ্রাউণ্ড থেকে শট মারলেও গোলকীপার নাজেহাল হয়েছে অনেক সময়।

বাঙলা ফুটবলে গোষ্ঠ, কুমার, সামাদেরই মত অনন্য খেলোয়াড় এল মোহনবাগানে ১৯২৬ সালে। অ্যাটিলিতে কোনমতেই মন ভরছে না যখন, সেই সময় মোনা এল মুশকিল-আসান হয়ে। উয়াড়ীর ভুতপূর্ব্ব গোলকীপার চাঁদপুরের রমেশ দত্ত ওরফে মোনা দত্তই সেণ্টার-ফরোয়ার্ড হিসাবে দ্বিতীয় বিভাগ লীগে ইস্টবেঙ্গলকে ১৯২৪ সালের সার্থকতা দান করে। ইস্টবেঙ্গল প্রথম বিভাগে উঠে প্রথম বছরে যতখানি সার্থকতা অর্জন করেছিল, তার মূলেও মুখ্যত ছিল মোনা দত্তর খেলা। ১৯২৬ সালে মোনা মোহনবাগানে আসে, দুবছর বাদে আবার ফিরে যায় ইস্টবেঙ্গলে। তার পর ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত আবার মোহনবাগানে। ওর পরবর্তী জীবন কাটে ই. বি. আর-এ খেলে। যেমন ফরোয়ার্ড-পঞ্চকের মধ্যে সংহতি রক্ষা করে আক্রমণ এগিয়ে দেবার ক্ষমতা, তেমনি অব্যর্থ শট ও হেড। মোনার বাঁ-পায়ের চেটোর শটে পোজিশন পেয়েও ধরতে পারেনি বহু বাঘা বাঘা মিলিটারী গোলকীপার। সুযোগের আভাসটুকু চকিতে দেখা গেলেই মোনা তার সদ্ব্যবহার করবে। এক পা এগিয়েছে মোনা, সঙ্গে সঙ্গে বেনেট পিছন থেকে জামা টেনে ধরেছে, কিন্তু বল তো ততক্ষণে গোলের কোণে। আর হেড? বল মাথায় ঠেকলেই যেন গোল। ১৯৩১ সালে ডি. সি. এল. আই-র খেলায় শেষ তিন মিনিটে তিনটে কর্ণার থেকে হেডে তিনটে গোল করে দুগোলে হারা ম্যাচ ৩-২ গোলে জিতেয়ে দেওয়া মোনা দত্তর দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। বাছাই দলের যেকটা খেলা হত সে যুগে, মোনার স্থান তাতে বাঁধা। একবার হাওড়া ইউনিয়নের শচীন দত্ত আর একবার এরিয়ানের পল্টু গাঙ্গুলী নির্বাচিত হয়; কিন্তু তার পর এমন দুর্দান্ত খেললে মোনা, যে শেষ মুহূর্তে নির্বাচক সমিতির সভ্যদের বসতে হল মোনাকে নির্বাচন করতে। মোনা দত্তর আগে কিছুদিন সেণ্টার-ফরোয়ার্ড খেলেছিল ফজলুর রহমান—বাঙালী মুসলমান। ছুটে পারতো না কুমার,

রবি গাঙ্গুলীর সঙ্গে, তবে বল পেয়ে রয়ে সয়ে মারতে পারলে সে শট আটকানো সহজ ছিল না।

ব্যাকে গোষ্ঠবাবুর পরেই যাঁর স্থান, তিনি সন্মথ দত্ত (বর্তমানে ডাক্তার)। নেপিয়ার (বর্তমান খিদিরপুর) থেকে এসে প্রথম বছর রাইট-হাফ ও সেণ্টার-হাফ খেলেন; কিন্তু পরে ব্যাকে পিছিয়ে যান। হাফব্যাক হিসেবে যথেষ্ট ভালো খেললেও, ব্যাকে তাঁর খেলা ছিল উৎকৃষ্ট পর্যায়ের। এক দিনও তাঁর ব্যর্থতা চোখে পড়েনি, সাহেবদের খবরের কাগজে পর্যন্ত প্রতি খেলায় তাঁর উচ্ছ্বল প্রশংসা বেরিয়েছে। একবার লোকাল-ভিজিটার্স খেলায় তাঁকে দলে নির্বাচন করা হয়নি, তারপর লোকের অভাবে দর্শক আসন থেকে ধরে নামিয়ে দিলে লেফট-হাফে; স্টেটসম্যান তাকেই বললে সেদিনের খেলায় শ্রেষ্ঠ হাফব্যাক। উপযুক্ত স্থানটি বেছে নিয়ে দাঁড়ানো ও প্রতিপক্ষকে গতর দিয়ে ঠেকিয়ে রেখে বল কেড়ে নেওয়ায় সন্মথ ছিলেন সেরা ওস্তাদ, গোষ্ঠবাবুর যোগ্যতম শিষ্য। ১৯২৬ থেকে খেলতে খেলতে যেবার অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত করলেন, তার পরের বছরও বাধ্য হয়ে খেলতে হল; কিন্তু লীগ চ্যাম্পিয়ান হবার সম্মানের অংশ জুটে গেল তাতে। সর্বভারতীয় দলের প্রথম বিদেশ সফরে অধিনায়কত্ব করার সম্মান সন্মথবাবুই পেয়েছিলেন ১৯৩৪ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে।

গোষ্ঠ পালের যুগে পঁচিশ সাল থেকে বছর দুতিন ব্যাক খেলেছিলেন কোলিয়ারির ডাক্তার আর. দাস। তাঁর প্রথম বছরে তিনিই প্রধান, গোষ্ঠবাবু সেবার অসুস্থতার জন্য প্রায় খেলেনইনি। আর. দাসের সাথী ছিল জাফর আলী। তারই জোরে লীগ প্রায় ধরোধরো। বেঁটে গাঁটা মানুষটি; যেমন লাফিয়ে উঠে হেড ও শট মারা, তেমনি ছোঁ মেরে চিলের মত বল কেড়ে নেওয়া। কুমারটুলির তুলসী দত্ত এবং হাওড়া ইউনিয়ানের দেবী ঘোষও অল্প দিন মোহনবাগানের হয়ে ব্যাক খেলেছেন।

সাইড-হাফে সুরেন ঠাকুর, মতি সেন গুপ্ত, ক্রিকেটার মণিদাস, সুধাংশু বসু, লক্ষ্মী দত্ত, সুশীল চ্যাটার্জি এবং বিমল মুখার্জী-ই প্রধান। এদের মধ্যে তৃতীয় দশকের লেফট-হাফ সুধাংশু বসু-র জুড়ি কলকাতা ফুটবলে দেখা যায়নি। রাইট-হাফে মতি সেন-এর পরেই চতুর্থ দশকে বিমল মুখার্জী—১৯১১ সালের লেফট-হাফ মনোমোহন মুখার্জীর ছেলে। বিমল প্রথম রাইট-ইন হিসেবে সুরু করে, যেমন সুধাংশুকে-ও প্রথম ফরোয়ার্ডে পরীক্ষা করা হয়েছিল। সে পদে সুবিধা করতে না পারায় বিমল পিছিয়ে আসে রাইট-হাফে এবং সেখানকার খেলায় অশেষ দক্ষতা দেখায়। তার অধিনায়কত্বেই ১৯৩৯ সালে লীগ বিজয়ী হয় মোহনবাগান।

প্রফুল্ল রায়, রাজেন সেন ও অভিলাষ ঘোষের পরে সেণ্টার হাফের গুরু-দায়িত্ব পড়ে বলাই চ্যাটার্জীর উপর। এথলেট, বক্সার এবং চৌকষ স্পোর্টসম্যান হিসেবে পি. কে. বিশ্বাসের যোগ্য ছাত্র বলাই। খেলায় সূক্ষ্ম উৎকর্ষ কিছুই ছিল না; কিন্তু ট্রাম-গাড়ীর ঘোড়ার মত অক্লান্ত পরিশ্রম ক্ষমতা, শরীরের তাগদ আর লাফ-মারবার অদ্ভুত দক্ষতার ফলে বলাই'র খেলা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যকরী হয়েছে, সাধারণ দর্শকদের প্রীতও করেছে। তবে বলাইদা দাদা হয়ে ছিল সাহেবদের মেরে। কখন যে লাফ দিয়ে বল নেবার ছুতোয় লাথি মেরে কান ফাটিয়ে দেবে, টেরটি পাবে না কেউ। বলাইদার পরে সন্মথ দত্তই ভালো সেণ্টার-হাফ, অনেক উচ্চাঙ্গের খেলা তাঁর। এ ছাড়া আর সব সেণ্টার-হাফ—টেবি মুখার্জি, বাহাদুর বোথরা, বা লেফট-ইন থেকে টেনে নামানো প্রেমলাল—কেউ সে মান রক্ষা করতে পারে নি। অবশ্য উয়াড়ী থেকে বাবা সোম যোগ দিয়ে যথেষ্ট দক্ষতায় পরিচয় দেন, কিন্তু অল্প পরেই তিনি চলে যান ই. বি. আর-এ।

সেণ্টার-হাফ হিসেবে আবদুল হামিদের মত জনপ্রিয়তা আর কেউ লাভ করতে পারেনি। কোয়েটার যে স্যাণ্ডিমেরিয়ান্স ১৯৩১ সালে ডুরাণ্ডে

মোহনবাগানকে হারিয়েছিল, এবং মহামারকুটো টিম বলে যাদের কুখ্যাতি রটেছিল কলকাতায়, সেই দলের সেণ্টার-হাফ আবদুল হামিদ। সরকারী কাজে বদলি হয়ে তিন বছর কলকাতায় ছিল। মারকুটো দলের খেলোয়াড় হওয়া সত্বেও তার খেলা ছিল ঝরঝরে। রুচিতে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে সে ছিল অনবদ্য স্পোর্টসম্যান। পরিশ্রমের ক্ষমতা ও বুদ্ধির প্রকাশে তার খেলাকে আদর্শ বলা যেতে পারতো। সোজা মাথার উপর দিয়ে পিছন দিকে শট মারতে ওরকম ওস্তাদ বেনেটর পরে আর দেখা যায়নি কাউকে। যে কোন দিকে বল ঘোরাবার দক্ষতার ফলে তার আখ্যা হয়েছিল বল-বেয়ারিং অ্যাঙ্ক্‌ল্‌। মোহনবাগান দলে সুধীর চ্যাটার্জীর পরে প্রথম সবুট খেলোয়াড় হামিদ, আর কলকাতা ফুটবলে গুরুবক্স সিং-এর আগে পর্যন্ত এক-মাত্র দাড়িওয়ালা খেলোয়াড়। মহামেডান স্পোর্টিং এর বিরাট সংহতি সত্বেও হামিদ যে মোহনবাগানেই থেকেছে, এই জন্যই তাকে সাধারণ বাঙালী-দর্শক বেশী ভালো বেসেছে, অসাম্প্রদায়িক মনে করে। তৃতীয় বছরে ১৯৩৫ সালে তিনি দলের অধিনায়ক হন। মোহনবাগানে তরুণ খেলোয়াড়-দের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা তিনিই প্রবর্তন করেন। এবং বুট পরে খেলার প্রেরণাও তিনিই জাগান।

পূর্ণ দাস বা তালুকদারের মত গোলকীপার মোহনবাগানে দেখা যায়নি। সে যুগের হীরালালকেই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ বলা চলে। চতুর্থ দশকে মোনা দত্তর ভাই কে. দত্ত ওরফে হারাধন-ই তারপর সবচেয়ে ভালো। তবে দাদার মতই এদল ও ওদল করেছে সে এবং ১৯৪০-এর শীল্ড-ফাইনালে এরিয়ান্সের হাতে শোচনীয় ১-৪ গোলের পরাজয়ের মূলে তার সেদিনকার ব্যর্থতা মুখ্যত দায়ী ছিল। এর মধ্যে যে সব গোলকীপার ছিল, তার মধ্যে মাত্র বছর দুই উয়াড়ীর নগেন কালী খেলেছিলেন উচ্চাঙ্গের খেলা। তার পর পালিত, দাশগুপ্ত, নেপা ভাদুড়ী, কুঠারী,

অনু ভট্টাচার্য সবাই চলনসই খেলোয়াড়। ক্লাব কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টিতে না থাকার ফলে যে সন্তোষ দত্তকে থেকে থেকে খেলতে হয়েছে, তার মোট খেলার সময় দশ বছরের বেশি, আর মাঝে মাঝে অদ্ভুত উৎকর্ষও দেখা গেছে তার খেলায়। ১৯২১ সালে রয়েল ওয়েস্ট কেণ্টের সঙ্গে ভিজে মাঠে দুদিন ড্র তারই জোরে সম্ভব হয়েছিল। বস্তুত গোষ্ঠ বাবুর পিছনে খেলবার ফলেই মোহনবাগানের গোলকীপারের ধার খুব খোলেনি, এই ছিল সে যুগের মনোভাব।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও তার পরবর্তী যুগের যারা প্রখ্যাত খেলোয়াড়, তাদের মধ্যে নায়ার, মেওয়ালাল, পরিতোষ চক্রবর্তী, মোহিনী ব্যানার্জি প্রথম নাম করেন মোহনবাগানে। তবে সার্থকতার যুগের যে কজন খেলোয়াড়কে ব্যর্থতার যুগের প্রতিভার মিছিলে এক পঙক্তিতে দাঁড় করালেও খুব আপত্তি উঠবে না, তারা হল—রাইট-হাফ অনিল দে, সেণ্টার-হাফ টি. আও, ব্যাক শরৎ দাস ও মান্না এবং ফরোয়ার্ড সাত্তার।

মোহনবাগানের যোগ্যতার প্রমাণ শুধু স্থানীয় ফুটবলে বা বোম্বাই সিমলার প্রতিযোগিতায় নয়, সফরকারী বিদেশী দলের বিরুদ্ধেও সমান উৎকর্ষে খেলেছে মোহনবাগান। ১৯৩৭ সালে ইসলিংটন কোরিন্থিয়ানস-এর বিরুদ্ধে এক গোলে হেরেছিল চূড়ান্ত দুর্ভাগ্যে। ১৯৩৮ সালে ক্যালকাটা-মোহনবাগানের সমবেত দল বর্মা দলের কাছে যে ২-৩ গোলে হেরেছিল, খেলার সময় আগাগোড়া ওরকম আকাশ-ভাঙ্গা বৃষ্টি আর কখনও হয়নি কলকাতায়।

আজ মোহনবাগান আভিজাত্যের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত, সার্থকতা মিলছে প্রচুর। কিন্তু মোহনবাগানের সার্থকতা সেখানে নয়। রাজনীতিতে কংগ্রেসের মতন, মোহনবাগানকে কেন্দ্র করেই ফুটবলে উৎসাহ এবং জনপ্রিয়তার প্লাবন পরিব্যাপ্ত হয়েছিল দেশময়।

কলকাতা ফুটবলের গৌরব—



মণি তালুকদার
(ইস্টবেঙ্গল)



ছোনে মজুমদার
(এরিয়ান্স)



ভুলাল
(ইস্টবেঙ্গল)



করুণা ভট্টাচার্য (হাবলা)
(এরিয়ান্স ও মোহনবাগান)

কলকাতা ফুটবলের গৌরব



বীরেন ঘোষ
(এরিয়ান্স)



আবদুল হামিদ
(মোহনবাগান)



মজিদ
(এরিয়ান্স ও ইস্টবেঙ্গল)



হাফিজ রসিদ
(মহামেডান স্পোর্টিং)



কে. প্রসাদ
(এরিয়ান্স)

পূবালী ঝড়

সারা বাংলা থেকে আহরিত ধনে-জনেই কলকাতার সমৃদ্ধি। কলকাতার ফুটবলে সমাবোহ এবং উৎকর্ষ যতই হোক না কেন, সে উৎসবে খেলোয়াড় এসেছে সারা বাঙলা থেকে, আজ আসে সারা ভারত-পাকিস্তান থেকে। তাই তো উৎসব এত জম্‌জমাটি।

ইংরেজের তৈরী সহর কলকাতা বাঙলার রাজধানী এবং প্রাণকেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও, পদ্মা-মেঘনা পারের বাঙলার সঙ্গে কলকাতার সংযোগ সহজ এবং সরল হয়নি কোনদিন। তাই পূব বাঙলার প্রাচীন রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করেই এ যুগেও পূব বাঙলার আধুনিক জীবন গড়ে উঠেছিল, যদিও সামুদ্রিক বন্দরের যুগে কলকাতার চেয়ে সবদিক দিয়েই পিছনে থাকতে হয়েছে বাঙলার দ্বিতীয় সহর ঢাকাকে।

কলকাতায় ফুটবল প্রচলিত হবার অল্প ক'দিনের মধ্যেই বাঙলার জেলায় জেলায় এই 'কলকেতিয়া ফ্যাশান' চালু হয়ে পড়ে। পূব বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পড়াশুনা করতে অনেক তরুণ ঢাকায় আসতো। তাছাড়া, ঢাকা চিরদিনের সমৃদ্ধ নগর। সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতো এমন মধ্যবিত্তের সংখ্যাও নগণ্য নয়। তাছাড়া ঢাকা সহরে দুটো করে বৃটিশ পল্টন নিয়মিত অধিষ্ঠিত থাকতো। এই সব মিলে যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে ঢাকার জীবনে ফুটবল অচিরেই নিজস্ব স্থান করে নেয়। সে ফুটবলে শুধু যে ঢাকানিবাসী এবং ঢাকাপ্রবাসী তরুণ মহলই যোগ দেয়, তা নয়। পূব বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের ক্লাব-

গুলোও মাঝে মাঝে ঢাকায় আসতে থাকে প্রতিযোগিতায় এবং ফ্রেণ্ডলি ম্যাচে যোগ দিতে। আর সেই সুযোগেই বাইরের খেলোয়াড়েরা ঢাকার কোন ক্লাবে যোগ দিয়ে ইজ্জত বাড়িয়ে নেয়।

এই শতকের প্রথম দশক থেকেই ঢাকায় নিয়মিত লীগ ফুটবল চলতে থাকে। তবে তার মধ্যে প্রধান দল ছিল দুটি। ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং প্রাচীনতর হলেও, বিত্তবান এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পোষকতায় উয়াড়ী ক্লাবই শক্তিসামর্থ্যে বড় হয়ে ওঠে এবং ইংলণ্ডের আর্সেনাল দলের মত ঢাকা উয়াড়ীও ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের নকল করে লাল-সাদা জামা খেলার পোযাক হিসেবে ব্যবহার করে।

কিন্তু ঢাকায় বড় হলেও সাধ জাগে কলকাতার দরবারে মর্যাদা সন্ধান করে বড়ত্ব পুরোপুরি ও নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠা করতে। তাই মোহনবাগানের শীল্ড বিজয়ের পরে যখন প্রমাণ হয়ে গেল যে ফুটবলে বাঙালী অপাঙক্তেয় নয়, সাহেব এবং গোরা-পল্টনদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় বাঙালীদলের পরাজয় অনিবার্য বিধিলিপি নয়, তখন দেখাদেখি ক'বছরের মধ্যেই উয়াড়ী কলকাতায় আসে আই. এফ. এ. শীল্ডে শক্তির পরীক্ষা দিতে।

এই খেলতে আসার ফল হয়েছে দু তরফা। একেত ঢাকার দল ঝোড়ো হাওয়ার মত ছুটে এসে কলকাতার খেলায় বাঘা বাঘা দলকে নাজেহাল করেছে। আর এরই ফলে কলকাতার ক্লাবগুলির সঙ্গে পূব বাঙলার ফুটবলারদের সম্পর্ক নিবিড়তর হয়েছে।

দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকে কলকাতায় এসে মাঝে মাঝে ফ্রেণ্ডলি ম্যাচে এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে উয়াড়ী স্থানীয় মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওদের সে যুগের খেলোয়াড়দের মধ্যে ফুলব্যাক সোনা মিয়া উল্লেখযোগ্য। ঢাকা কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক ও পরবর্তী কালে যুক্ত বাঙলার শিক্ষা-অধিকর্তা ডাঃ জেঙ্কিন্‌স্ একাধিকবার সে যুগে

উয়াড়ীর পক্ষে কলকাতায় সেণ্টার-হাফ খেলেন, আর খেলেন পূর্ব্বাঞ্চলের প্রাক্তন সৈন্যাধিনায়ক মেজর-জেনার্ল এস. বি. এস. রায়।

দলে দু'একজন সবুট খেলোয়াড় থাকলেও ঢাকা উয়াড়ীও মোহন-বাগানের মত শুধু পায়ের খেলাতেই উৎকর্ষ দেখায় এবং ভিজে মাঠে নাকাল হলেও শুকনো মাঠ পেলে গোরা-পল্টন দলগুলিকেও নাচিয়ে ছেড়ে দেয়। বিশেষ করে শীল্ড বিজয়ী দলের কানু রায় ছিলেন মূলত উয়াড়ীর খেলোয়াড়, কলকাতায় থাকাকালীনই যা তিনি মোহনবাগানে খেলতেন। কাজেই কলকাতা এবং ঢাকার এই দুই প্রধান বাঙালী ফুটবল দলের মধ্যে আত্মিক ও আদর্শগত ঐক্য সহজেই গড়ে ওঠে। উয়াড়ীর বিরুদ্ধে সাহেব-দলগুলির খেলাতে কলকাতার দর্শক প্রচুর উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দেখায়। ১৯১৫ সালে শীল্ডের খেলায় দুর্দ্ধর্ষ কাস্টম্‌স্‌-এর বিরুদ্ধে দু'দিন গোলশূন্য-ভাবে খেলা শেষ করে, তৃতীয় দিনে বৃষ্টির মধ্যে হেরে যায়। তারপর ১৯১৭ সালে আই. এফ. এ শীল্ডের খেলায় যখন লীগ চ্যাম্পিয়ন লিঙ্কন্‌স্‌কে ধরে হারিয়ে দেয় ওরা, তখন উৎসাহ ও উদ্দীপনা চরমে ওঠে। আর তারও পরের বছর শীল্ডের খেলায় কানু রায়েরই নেতৃত্বে উয়াড়ী মোহনবাগানকে পরাজিত করে সে সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখে। কানু রায়ই গোষ্ঠ পালকে কাটিয়ে এগিয়ে যেয়ে হেড করেন, আর তাতেই জয়সূচক গোল হয়।

উয়াড়ী আবার শীল্ডে মোহনবাগানের মুখোমুখী হয় ১৯২৩ সালের সেমি-ফাইনালে। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় ২-১ গোলে জয়ী হয় মোহনবাগান। সেবারের সংযোগের ফলেই পরের বছর উয়াড়ীর সেণ্টার-হাফ বাঘা সোম মোহনবাগানে যোগ দেন। ১৯২৫ সালে শীল্ডের প্রথম খেলাতেই উয়াড়ী দুর্দ্ধর্ষ শেরউডের সম্মুখীন হয় এবং ১-২ গোলে পরাজিত হয়। তবে সেদিনের খেলাতে ইংরেজচালিত সংবাদপত্রগুলিও শেরউডকে ভাগ্যবলে জয়ী বলে ঘোষণা করেছিল। ১৯২৯ সালে উয়াড়ী প্রথম ম্যাচ খেলে রেঙ্গুন

কাস্টম্‌সের সঙ্গে এবং প্রথমে গোল দিয়েও প্রথম দিনের খেলায় ১-১ গোলে অমিমাংসিতভাবে খেলা শেষ করতে বাধ্য হয়। পরদিন অবশ্য বৃষ্টির মধ্যে তিন গোলে হারে উয়াড়ী। কিন্তু প্রথম দিনের খেলা সম্পর্কে সংবাদপত্রের মত ছিল যে, ভাগ্য এতটুকু অনুকূল হলেই ঢাকার ছেলেরা রেঙ্গুনওয়ালাদের ফিরতি জাহাজে দেশে ফিরতে বাধ্য করতো।

উয়াড়ীর বহু খেলোয়াড় কলকাতায় এসে স্থানীয় দলের পক্ষে প্রচুর খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেছে, কলকাতা ফুটবলেরও মর্যাদা বাড়িয়েছে। সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইন-সাইড ফরোয়ার্ড তাজহাটের ধীরা মিত্র মুলত উয়াড়ীর খেলোয়াড়। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের বিখ্যাত গোলকীপার নগেন কালী-ও উয়াড়ী থেকে এসেছিলেন।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের অন্যতম এবং প্রথম অধিনায়ক নসা সেন উয়াড়ীর রাইট-আউট ছিলেন। প্রথম যেদল নিয়ে ইস্টবেঙ্গল আই. এফ. এ. শীল্ডে সাড়া জাগায় এবং পরে দ্বিতীয় বিভাগ লীগ এবং প্রথম বিভাগ লীগে চমক সৃষ্টি করে, তার মধ্যে অনেকেই উয়াড়ীর খেলোয়াড়। দীনেশ গুহ, ভোলা, ভানু দত্ত রায়, মোনা দত্ত, প্রশান্ত বর্ধন, জ্ঞানা পোদ্দার, ধীরা মিত্র—ইস্টবেঙ্গলের এই সবাই উয়াড়ীর প্রাক্তন খেলোয়াড়। পরবর্তী যুগের হীরেন সেন ও পাখী সেন দুজনই উয়াড়ীতে আগে খেলেছেন। কলকাতা ফুটবলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইন্‌সাইড-ফরোয়ার্ড মোহনবাগানের রবি বোস-ই ছিলেন ১৯২৬ ও ১৯২৯ সালে উয়াড়ীর সার্থকতার মূলে।

উয়াড়ী যে ঢাকার প্রধান ফুটবল দল, সেখানকার ফুটবলের শক্তি যে কতখানি তার প্রমাণ ১৯৩৭ সালে বিশেষ করে পাওয়া যায়। কারণ, ঐ বছরে বিলেতী অপেশাদার দল ইস্‌লিংটন কোরিন্থিয়ান্স সারা ভারত সফর করে যে একটি মাত্র খেলায় পরাজয় বরণ করে, তা ঢাকার স্থানীয় দলের বিরুদ্ধে। জয়সূচক গোল দেন পাখী সেন। সর্বভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার

প্রবর্তনে প্রথম উৎসাহ দেখায় ঢাকা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন, এবং প্রথম বছরে ঢাকা পৃথক্ দল হিসেবে যোগদান করে। কলকাতা ফুটবলের এবং সর্বভারতীয় ক্রীড়া-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান পরিচালক পঙ্কজ গুপ্তর কলকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভে উয়াড়ীর দান অনেকখানি। কারণ, শীল্ডের খেলায় উয়াড়ীর স্থানীয় ম্যানেজারী করেই তিনি নিজস্ব যোগ্যতা প্রমাণ করবার সুযোগ পান, এবং পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা যথেষ্ট বাড়িয়ে ফেলেন।

উয়াড়ীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হিন্দুরা বেশীর ভাগ কলকাতায় চলে এসে এখানে উয়াড়ী প্রতিষ্ঠা করেছে। ঢাকা উয়াড়ী পূবালী ঝড়ের মতই আচমকা কলকাতায় এসে এখানকার ফুটবলে দমকা আঘাত সুরু করেছিল, শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে; অপ্রত্যক্ষ ভাবে নতুন ফুটবল পরিবেশ সৃষ্টিও করেছে।

কলকাতার আদি বাসিন্দা এবং পশ্চিম বাঙলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত অধিবাসীদের মধ্যে যে আত্মিক সৌহার্দ্য ছিল, নানা কারণে পূব বাঙলা থেকে আগত লোক এবং কলকাতার পশ্চিম বঙ্গীয় সমাজের মধ্যে অনুরূপ সদ্ভাব ও আন্তরিকতা গড়ে ওঠেনি। কলকাতার ফুটবলে, বিশেষ করে মোহনবাগানের শীল্ড-বিজয়ী দলে শিবদাস, বিজয়দাস, অভিলাষ, কানু রায়, রাজেন সেন, সুধীর চ্যাটার্জী প্রমুখ পূর্ববঙ্গীয় খেলোয়াড়দের উৎকর্ষে কলকাতার পূর্ববঙ্গীয় সমাজে যে গর্ববোধের সৃষ্টি হয়েছিল, তা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল উয়াড়ীর সাফল্যে এবং শেষ পর্যন্ত তা থেকেই একদলের মনে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠার প্রেরণা জাগে। আর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাই কলকাতা ফুটবলে এক প্রধান ঘটনা, কারণ যুদ্ধোত্তর স্বাধীন ভারতের ফুটবলে ইস্টবেঙ্গলের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বর্তমানে কলকাতা ফুটবলের মূল প্রেরণা হল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই সব কারণে ঢাকা উয়াড়ীর কলকাতায় শীল্ড খেলতে আসাকে নিশ্চয় বিরাট ঘটনা বলা যেতে পারে, যার ফল হয়েছে সুদূর প্রসারী।

আমাদের স্যর

বাঙালীদের মধ্যে ফুটবল খেলা প্রথম প্রচলিত করার কৃতিত্ব যিনিই দাবী করুন না কেন, বাঙালী ফুটবলের লালক-পিতা এবং গুরু বলতে একমাত্র দুখীরাম মজুমদারকেই বোঝায়। সাইকেল হাতে টেনে নিয়ে, কেডস্ জুতো পায়ে, প্যাণ্টালুনের তলাটা ক্লিপ্ দিয়ে আটকে, গলাবন্ধ কোট এঁটে, আর সাদা হ্যাটে টাক-মাথা ঢেকে ধীর পায়ে হেঁটে চলেছেন স্যর, সঙ্গে তরুণ ফুটবলরসিক দল চলেছে গল্প শুনতে শুনতে—৩৫।৪০ বছর আগে উত্তর কলকাতায় এছিল নিত্যকার দৃশ্য। মাঝে মাঝে হয়তো গল্প জমে গেলে বসে গেলেন কোন রোয়াকে। বাগবাজার গঙ্গাতীরে ঠাকুবাড়ি ঘাটের বিরাট বট-অশথের ছায়ায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর কাছে ফুটবলের গল্প শোনা ছিল সে দিনের এক পরম বিলাস।

উমেশচন্দ্র মজুমদার ওরফে দুখীরাম বাবু নিজে কোথায় কার কাছে ফুটবলের রসে এবং কৌশলে দীক্ষিত হয়েছিলেন, আজ তা জানবার উপায় নেই। তবে শ্যামপুকুর তেলিপাড়ার মাঠে তাঁর লুনার ক্লাব চালু ছিল ১৮৮৫-৮৬ সালে। তারপর তিনি মোহনবাগান ভিলা-য় স্টুডেণ্টস ইউনিয়ন ক্লাব পত্তন করেন এবং সর্বশেষে ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন এরিয়ান্স ক্লাব। শেষ জীবন পর্যন্ত এরিয়ান্স ক্লাবই ছিল তাঁর ইহকাল পরকাল, স্ত্রী পুত্র পরিবার—একাধারে সব।

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথম দিকে কাস্টমসের সঙ্গে খেলায় গ্যালব্রেথ তাঁকে জখম করার আগে পর্যন্ত তিনি নিজে সেণ্টার-হাফ খেলতেন।

তার পর বছর কয়েক প্রয়োজন বোধে অনিয়মিতভাবে লেফট-হাফ খেলেন। বাঙালী জনসাধারণে ফুটবলের জনপ্রিয়তা যখন বেড়েছে, তার আগেই দুখীরাম বাবু খেলা ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু ১৯২৯ সালে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগের দিন পর্যন্ত তাঁর ফুটবল প্রেমে ভাঁটা পড়েনি এতটুকু। দুখীরামবাবুর নিজের খেলা খুবই উচুস্তরের ছিল, কিন্তু বাঙলা-ফুটবলে দুখীরামবাবুর প্রধান ভূমিকা খেলোয়াড়ের নয়; শিক্ষক এবং গুরু হিসেবে তাঁর স্থান অদ্বিতীয়।

ভাদুড়ীরা চার ভাই মুলত এরিয়ান্সেই খেলা সুরু করেন দুখীরামবাবুর সঙ্গে। দ্বিজদাস এরং রামদাস যখন খেলতেন, তাদের জামাকাপড় নিয়ে মাঠের ধারে বসে থাকতো কিশোর বিজয়দাস ও শিবদাস। দুখীরাম বাবুর শিক্ষাধীনেই ফুটবলে ছোট দুভাই প্রথম পাঠ গ্রহণ করে। শুধু সে যুগেই কেন, সব যুগেই দুখীরামবাবু খুঁজে বেছে এপাড়া ওপাড়া বা মফস্বল শহর থেকে তরুণ সম্ভাবনাসম্পন্ন খেলোয়াড় সংগ্রহ করে আনতেন, তাদের শিক্ষা দিতেন। তার পর অবশ্য তাদের অনেকেই চলে যেত অন্য ক্লাবে, বেশির ভাগই মোহনবাগানে। এ জাতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গোর ঘোষ, প্রকাশ ঘোষ. রূপচাঁদ দফাদার, পূর্ণ দাস, বলাই চ্যাটার্জী, সামাদ, সূর্য চক্রবর্তী, হাবলা ভট্টাচার্য, ফজলুর রহমান, এস. দে. তারাপদ প্রভৃতি। কিছুটা যোগ্যতা ও সুনাম অর্জন করেই এরা দুখীরাম বাবুকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করেনি।

আরও আগের যুগে, এই শতকের গোড়ার দিকেও দুখীরামবাবুর ছাত্রদের মধ্যে যারা বড় খেলোয়াড় হয়েছে—তাদের মধ্যে নাম করতে হয়—গোলে পুঁটে সেন, ব্যাকে কালী ঘোষ সুবল ঘোষ, শৈলেন বসু, নালুবাবু ও বঙ্কা মুখার্জী, হাফে অমূল্য ঘোষ ও গবাবাবু, ফরোয়ার্ডে নুটেবাবু, দেবেন দত্ত, জিতেন বাগচী, এস. ঘোষ, যতীন চ্যাটার্জী, ভোঁদাবাবু, নির্ম্মল চাটার্জী

ছানা বাবু, রমা রায় প্রভৃতি। আর পরবর্তী যুগে যে সব দুখীরাম-শিষ্য এরিয়ান্সেই আজীবন খেলে চূড়ান্ত উৎকর্ষে দর্শকদের মনে স্থায়ী আসন করে রেখে গিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগের ব্যাক টগর মুখার্জী ও সুশান্ত ঘোষ, হাফ-ব্যাকে কানাই ও কৃষ্ণ ঘোষ, এবং ফরোয়ার্ডে বীরেন ঘোষ, মতিয়ার রহমান, কে প্রসাদ, হরিদাস ও তুলু প্রধান।

কবে কোথায় মফস্বলে খেলতে গিয়ে কোন ছেলেটির খেলা দেখে এসেছেন স্যর, ছোবলের রকম দেখেই বুঝে ফেলেছেন এ বাচ্চা হলেও জাত কেউটে, স্যর তাকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। তারা থাকা যাওয়া পড়া-শুনা বা কাজকর্ম সবদিকে পিতা ও গুরুর কর্তব্য করতেন, তার পর চলতো তার অনুশীলন আর শিক্ষা। এমনি জলপাইগুড়ি থেকে এল সূর্য চক্রবর্তী, বহরমপুর থেকে এল হাবলা ভট্টাচার্য, পূর্ণিয়া থেকে এল সামাদ, কৃষ্ণনগর থেকে এল দফাদার, চুয়াডাঙ্গা থেকে এল মতিয়ার রহমান, চুঁচুড়া থেকে বীরেন ঘোষ। আবার স্যরকে দেখা যেত সাইকেলে হেলান দিয়ে পার্কে পার্কে খেলা দেখছেন। কলকাতা ও আশে পাশের পার্ক থেকে যাদের আবিষ্কার করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন গোলকীপার পূর্ণ দাস, প্রকাশ ঘোষ, গৌর ঘোষ, ফজলুর রহমান এবং পুরাণো যুগের কালী ঘোষ, সুবল ঘোষ, অমূল্য ঘোষ, নির্মল চ্যাটার্জী প্রভৃতি। স্বয়ং গোষ্ঠ পালও কিছুদিন স্যরের অধীনে এরিয়ানে খেলেছেন।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার এক জনকে সারা বছর একই দলে খেলতে হবে, এমন কোন নিয়ম যে যুগে ছিল না। কোন একটা প্রতিযোগিতায় এক দলের হয়ে খেলে, অন্য প্রতিযোগিতায় অন্যের হয়ে খেলতে পারতো যে কেউ। সেই কারণে এরিয়ান্সের অনেক খেলোয়াড় একই সময় তাজহাট, শোভাবাজার, কুমারটুলী এমন কি মোহনবাগানেও খেলেছে।

খেলোয়াড়সংগ্রহে প্রতিদ্বন্দ্বীদলও স্থরের মতকেই সবচেয়ে দাম দিত। একবার স্থরের সঙ্গে সঙ্গে মোহনবাগানের লোকও গিয়েছে সহরতলীর কোন খেলা দেখে কোন খেলোয়াড়কে দলে গাঁথতে। শেষোক্ত ব্যক্তি লুকিয়ে স্থরের মতটা জানবার মতলবে তাঁরই আশপাশে ঘুর ঘুর করছে। দেখতে পেয়েই কূটবুদ্ধি খেললো স্থরের মাথায়, তাকে শুনিয়ে বললেন—এই খেলোয়াড় ? সাতজন্মেও ফুটবলার হবে না ও। বিরক্তি ও হতাশা দেখিয়ে স্থর চলে আসতেই মোহনবাগানের লোকও চলে এল। স্থর বললেন, জাত খেলোয়াড়, কিন্তু মোহনবাগানকে ধাপ্পা দিয়ে না ভাগালে ওদের সঙ্গে জোরে পারবো কেন।

খেলোয়াড়দের কলকাতায় রাখার ব্যাপারে কম অস্থবিধা বোধ করতে হয়নি তখন। হোটেলের যুগ ছিল না সেটা। অন্যের বাড়িতে রাখতে জাত এবং ধর্মের প্রশ্ন উঠ্‌তো। পূর্ণিয়ার মুসলমান ছেলে সামাদকে সন্তোষ নামকরণ করে হিন্দু পরিচয়ে রাখতে হয়েছিল কোন বাড়িতে, এবং সংশয় নিরসন করবার জন্য ভাল বাঙলা বলতে শেখার ব্যবস্থাও করতে হয়েছিল। রূপা দফাদার ছিল খৃষ্টান, তার বেলায়ও পরিচয় গোপনের প্রয়োজন ছিল। খেলোয়াড় কেউ আহত হলে বা রোগে পড়লে, তার জন্য স্থরের চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি হয়নি কোনদিন। খেটে-খাওয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থ হয়েও, তিনি খেলোয়াড়দের সব কিছুর তদারক করতেন। যক্ষ্মারোগ-গ্রস্ত হরিদাসের জন্য শ্যামপুকুর থেকে টিউব-ওয়েলের জল পৌঁছে দিতেন প্রতিদিন বরাহনগরে।

দুখীরামবাবুর হাতে এদের অনেকের শিক্ষা হয়ে থাকলেও প্রথম-পাঠ হয়েছিল অন্যত্র। কিন্তু হাতে-খড়ি থেকে শেষ পাঠ-পর্যন্ত তাঁরই কাছে হয়েছিল ভাই-পো ছোনে (সন্তোষ) মজুমদারের। টার্কী-ছোনে দু ভাই ছিলেন এই চিরকুমারের পুত্রাধিক। নিজে বুট পায়ে খেলতেন, ছোনেকেও সেই

অভ্যাস করিয়েছিলেন। একেলে হালকা ও নরম বুটের চলন ছিল না সে যুগে। বুটরপ্ত করাই ছিল মস্ত ব্যাপার, পাথুরে ফুটপাতে ছোনেকে নিয়মিত দৌড় করাতেন স্তর বুটরপ্ত হবার জন্য।

বর্তমান রুশ ফুটবলে যে শিক্ষা-পদ্ধতি, অর্থাৎ প্রতি খেলোয়াড়কে যে-কোন জায়গায় খেলবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, সে নীতি খাটিয়েছিলেন স্তর ছোনের বেলায়। ফুটবলে গোলকীপার থেকে লেফট-আউট পর্যন্ত সব পোজিশানে খেলতে পারতো ছোনে। ব্যাক, হাফ-ব্যাক এবং সেণ্টার-ফরোয়ার্ড হিসেবে সে প্রতিনিধিমূলক খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, ফুটবল শিক্ষার জন্য বই লিখেছিলেন স্তর। সেই অধুনা-দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে খেলার যে কৌশল শ্রেষ্ঠ বলে নির্দিষ্ট আছে, তা আধুনিক কালের রুশ ফুটবলেরই অনুরূপ। অর্থাৎ বল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাপা পাস দেওয়া ; হাক-ফাঁক নেই, প্রয়োজনমত হুহু করে এগোবার ও পিছোবার চেষ্টা এবং পরস্পর বোঝাপড়া করে এমন ভাবে জায়গা নেওয়া, যেন দেওয়া-নেওয়া যন্ত্রের মত নিখুঁতভাবে চক্ষের পলকে সাধিত হতে পারে। অথচ দুখীরাম বাবুর এই জ্ঞান ফুটবলের মাঠে খেলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই আহৃত।

মাঠে মাঠে সর্বত্র ইংরেজ বাঙালী সব খেলোয়াড় তাঁকে যে স্তর বলে সম্বোধন করতো, তা শিক্ষকতায় এবং জ্ঞানে তাঁর যে উৎকর্ষ ছিল, তারই স্বীকৃতি। দুখীরামবাবুর সমগ্র সত্তা ছেয়ে ছিল ফুটবল ও ক্রিকেট। আর মনের ভাব আবেগের তীব্রতায় মুখে প্রকাশ পেত নাটকীয় ভাষায় ও বাচন-ভঙ্গীতে। তা সবসময়েই শ্রোতৃবৃন্দের মনে গেঁথে গেছে। একবার তিনি নিজে আহত, দলের মনোবল দুর্বল ; এমন সময় খেলা পড়লো প্রবল মিলিটারী দলের বিরুদ্ধে। অধিনায়ক কালী ঘোষ পরামর্শ দিলেন প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নিতে। স্তর তাঁকে তিরস্কার করে বললেন, "বৃদ্ধ গোবিন্দসিংহ থাকতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন কখনও সম্ভব নয়।

সেনাপতি যদি ভীত হয়ে থাক তো অন্তঃপুরে আশ্রয় নাও।" হাফ-ব্যাকে নামলেন স্থর আহত পা নিয়ে খেলতে, বললেন, "থিয়েটারে সব সখীই গান গায় না। পিছনে যারা থাকে তারা মুখ বাঁকিয়েই সামনের গাইয়ে সখীদের গান জমিয়ে দেয়। তোমরা গান গাইবে, আমি মুখ বাঁকাব।" হলও তাই। টুক টুক করে খেলেও এমন দুখানা ফরোয়ার্ড-পাস দিলেন স্থর, যা থেকে গোল করে এরিয়ান্স জিতে গেল ৩-১ গোলে। কালী ঘোষ ছুটে এলেন স্থরের পায়ের ধুলো নিতে। পা সরিয়ে নিলেন স্থর, বললেনঃ—"কাপুরুষের স্পর্শ অশুচি।"

দ্বিতীয় দশকে এরিয়ান্সের তখন খুব দুর্দিন, কোন মতে প্রথম বিভাগে টিকে থাকার সংগ্রাম করতে হচ্ছে, খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেরই দেখা যাচ্ছে চেষ্টার অভাব। তখন দুখীরামবাবুর সেকি বিলাপ—"আমি একা রাণা প্রতাপসিংহ ঘাসের রুটি খেয়ে পর্বতের কন্দরে কন্দরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পঞ্চাশ হাজার লোক মোহনবাগানাইজ্‌ড্ হয়ে গেছে, গরীব এরিয়ান্সের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না!" দলের খেলোয়াড়দের চেষ্টার অভাবে ব্যথিত হয়ে বলতেন—"যত সব মীরজাফর আর মীরজুমলার দল, একটা মোহনলাল খুঁজে পাই না!" ভবানীপুরে কাটাকাপড় বেচতো এমন একজন খেলোয়াড়কে স্থর এরিয়ানে আনেন। নাম হতেই সে চলে যায় মোহনবাগানে। ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থর—"গজে মেপে কাপড় বেচতিস, আমি তোকে রাজার সম্মান পাইয়ে দিলাম, আর তুই কিনা বিশ্বাসঘাতকতা করলি!" পরের যুগে বলতে শুনেছি—"যা যা! আবার খুঁজে আনবো। দরকার হয় কুমোরটুলি থেকে পুতুল গড়ে খেলোয়াড় বানাবো। দুখীরাম মজুমদার কারো তোয়াক্কা করে না।"

খেলোয়াড়দের যোগ্যতা নির্ণয়ে এবং তার বর্ণনায়ও দুখীরামবাবুর অলঙ্কারপ্রয়োগ ছিল অনবদ্য। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর তরুণ ছাত্র হাবলা

ভট্টাচার্য গেছে এরিয়ানের সঙ্গে বোম্বাইয়ে রোভার্স কাপে খেলতে। দলগঠন ব্যাপারে বর্ষীয়ান খেলোয়াড় দুজন আপত্তি জানালে, ওই ষণ্ডা-মার্কা মিলিটারীদের বিরুদ্ধে পাতলা-দুবলা হাবলা কোন মতেই চলবে না। উত্তরে স্যর বললেন—"ওরে মূর্খ, কেউটের বাচ্চা আর ময়ালের তফাৎ বুঝিস না। আকার দেখে শক্তি বিচার করিস। ময়াল নড়তে নড়তে বাচ্চা কেউটে তিন ছোবল কষিয়ে দেয় তা জানিস।" বলা বাহুল্য ১৯২৮ সালে রোভার্স কাপের সে খেলায় হাবলার দেওয়া গোলেই এরিয়ান্স আর. জী. এ-কে হারিয়েছিল।

দুখীরামবাবুর ব্যক্তিত্ব ছিল প্রবল, ক্লাবের প্রতি প্রীতিই ছিল তাঁর কাছে সবার উপরে। প্রথমে তিনি এস. রায়-এর খেলার সরঞ্জামের দোকানে চাকরী করতেন। একদিন এরিয়ান্সের খেলায় দলগঠনে কিছু গোলমাল হয়েছে। দুপুরেই দোকান বন্ধ করে চন্দননগর চলে গেলেন স্যর খেলোয়াড় আনতে। খবর জেনে দোকানের মালিক সারদা রায় মশায় দুঃখ প্রকাশ করলেন,—"দোকানের স্বার্থও তোমার দেখা উচিত।" দুখীরামবাবু সঙ্গে সঙ্গে চাকরীতে ইস্তফা দিলেন, রায় মশায়ের বহু অনুরোধেও তাঁর সে সিদ্ধান্ত বদল হল না। এর পর তিনি পাইকপাড়ারাজ মণীন্দ্র সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় প্লাম্বিং এর কাজ সুরু করেন, এবং অচিরেই সে বিষয়ে যোগ্যতার লাইসেন্স জোগাড় করে নেন। সেই বৃত্তিই চালিয়ে যান শেষজীবন পর্যন্ত।

পূর্ণ দাস তখন কলকাতার শ্রেষ্ঠ গোলকীপার এবং এরিয়ান্সের অধিনায়ক। কিন্তু তাঁর কদিনের খেলায় দুখীরামবাবু মর্মাহত। সেদিন ড্যালহৌসী মাঠের পিছনে গাছতলায় যখন টিম খেলবার জন্য তৈরী হচ্ছে, পূর্ণ দাসের জামা পরা হয়ে গেছে, স্যর হুকুম দিলেন—"জামা খুলে ফেল, তুমি খেলবে না আজ।" অধিনায়ক পূর্ণ দাস হতভম্ব হয়ে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই

খুলে ফেললে জামা। সেদিনের মত সে জামা উঠ্লো ছোনের গায়ে। অথচ এরিয়ান ক্লাবে কেউ ছিলেন না স্যর, না সেক্রেটারী, না অধিনায়ক বা আর কেউ। কংগ্রেসে গান্ধিজীর মত বোধ হয় চার আনার সদস্যও নয়। খেলতে খেলতে খেলোয়াড়দের অবিরত নির্দেশ দিতেন শিক্ষক দুখীরাম। একদিন বিরক্ত হয়ে সাহেব রেফারি বললে, তোমার ওই গ্রামোফোন থামাবে কি? ধমক দিয়ে উত্তর দিলেন স্যর—"তোমার কাজ খেলা চালান; আমি কোচ, আমার কাজ খেলোয়াড়দের নির্দেশ দেওয়া।" এর উত্তরে আর কোন জবাব করেনি সাহেব।

ফুটবলের আগ্রহাতিশয্যে নিজের কথা ভুলে যেতেন স্যর। অসুস্থতার জন্য ডাক্তার তাঁকে তখন সম্পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিয়েছে। বিকেলের দিকটা বাড়ীর সামনে রাস্তার ধারে চেয়ার পেতে বসে থাকেন। আগের দিন ডুরাণ্ডের খেলায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে মোহনবাগান, মূলত সেণ্টার-হাফ বলাই চ্যাটার্জীর ব্যর্থতায়। কলেজ থেকে ফিরছি। স্যরকে দেখেই বললাম—একী হল স্যর! বলাই-এর খেলার মূল ত্রুটি এবং আহত হাঁটু নিয়ে খেলা যে অন্যায় হয়েছে, সে আলোচনা করতে করতে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে স্যর ব্যাখ্যা করতে সুরু করলেন সেণ্টার-হাফ খেলার কৌশল। ছুটে এগিয়ে পিছিয়ে লাফিয়ে পুরোপুরি ডিমনস্ট্রেশন দিতে লাগলেন, ভাঙ্গা শরীর নিয়ে, চিকিৎসকের নির্দেশ অমান্য করে।

খেলোয়াড় জুটিয়ে এনে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে তুলতে তুলতেই যে ক্লাবের খেলোয়াড় দলান্তরে যায়, সে ক্লাবের পক্ষে বিশেষ গৌরব অর্জন করা সহজ নয়। তবু দুখীরাম স্যরের এরিয়ান্স একেবারে প্রথম বছরেই ১৮৯৩ সালে কুচবিহার কাপের ফাইনালে ওঠে, ফোর্ট উইলিয়াম আর্সেনালের কাছে হেরে যায়। ১৯০৮ সালে প্রথম কুচবিহার কাপ জেতে ওরা। তারপর খাঁটি বাঙালীদল হিসেবে ন্যাশানাল এবং মোহনবাগানের পরে এরিয়ান্সই

ট্রেডস-কাপ জেতে ১৯১৩ সালে। কিন্তু খেলায় জিতেও এরিয়ান্স তখন কাপ পায়নি, কারণ পরাজিত মেজারার্স এরিয়ান্সের গোলকীপার খাঁটি ইংরেজ অ্যানস্টিস-এর মার্কামারা ভারতীয় দলে খেলবার অধিকার নিয়ে প্রতিবাদ জানায়। সে প্রতিবাদ অবশ্য শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হয়নি। কোন কোম্পানীর বড় সাহেব হিসেবে কলকাতায় এসে ময়দানে বেড়িয়ে ফুটবল দেখবার সময় স্যুর-এর সঙ্গে সংযোগ হয় অ্যানস্টিস-এর। পরের বছর স্যুর-এর অনুমতি নিয়েই সে ক্যালকাটায় যোগ দেয়।

১৯১৪ সালে মোহনবাগানের সাথে সাথেই এরিয়ান লীগে স্থান পায় এবং দ্বিতীয় বছরে রানার্স-আপ হয় ১৬টি খেলায় ২৪টি পয়েণ্ট পেয়ে ও একটিমাত্র খেলায় পরাজয় বরন করে। এরই জোরে ১৯১৬ সালে প্রথম বিভাগে উঠে আসে এরিয়ান্স এবং পরবর্ত্তী কালে চারবার লীগ তালিকায় সবার নীচে পড়ে থাকা সত্বেও কোনদিনও প্রথম বিভাগ থেকে নামতে হয়নি ওদের।

১৯২০-২১ সালে চতুর্থস্থান লাভই সে যুগে লীগে এরিয়ান্সের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। চূড়ান্ত স্থান যাই হোকনা কেন, বাগে পেলে কোন দলকেই ছেড়ে কথা বলেনি এরিয়ান্স। ১৯১৭ সালে ক্যালকাটার সঙ্গে ফিরতি খেলায় ড্র করে ওদের পর পর দ্বিতীয়বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। সে যুগেই শীল্ডে ব্রেকনক্স্ ও ড্রাগন গার্ডসকে হিমশিম খাইয়েছে। অখ্যাত অজ্ঞাত সেণ্টার-ফরোয়ার্ড কার্ত্তিকের দেওয়া গোলে গর্ডনকে ফিরতি ট্রেনে কলকাতা ছাড়তে বাধ্য করেছে। পরের যুগে ১৯২৭ সালে দুর্ধর্ষ নর্থ স্টাফোর্ডের গতি রুখে দিয়েছে ২-২ গোলে। ড্যালহৌসীকে হারিয়ে তাদের চ্যাম্পিয়ানশিপের আশা ধুলিসাৎ করেছে। ১৯২৯ সালেও লীগ চ্যাম্পিয়ান ড্যালহৌসীকে হারিয়েছে। তারও পরে ৩-১ গোলে পরাজিত করেছে মহামেডান স্পোর্টিং-এর দিগ্বিজয়ী দলকে।

১৯২৮ সালে রোভার্স কাপের সেমি-ফাইনাল খেলেছে, ১৯৩৭ সালে ডুরাণ্ডের সেমি-ফাইনালে অপরাজিত হয়েই ফিরে এসেছে।

ডুরাণ্ডের এই খেলাকে কেন্দ্র করেই সিমলার বৃটিশ ফৌজ-শাসিত আরুণ্ডেলের মাঠে প্রচণ্ড দর্শক-বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। চেশায়ার্সের বিরুদ্ধে এক গোলে এগিয়েছিল এরিয়ান। তারপর যখন চেশায়ার্সের পক্ষে সে গোল শোধ হল, অগণিত দর্শক দেখলে সে গোল রেফারির দান, চেশায়ার্সের স্বোপার্জন নয়। হৈ হৈ করে সিমলার সরকারী কর্মচারী জনতা মাঠ চড়াও করলে। গোরা পুলিশ পারলে না শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে। জনসভায় প্রস্তাব গৃহীত হল, রেফারির পক্ষপাতিত্ব ও বে-আইনির প্রতিবাদে এরিয়ান যেন আর না খেলে। সৈন্য দপ্তরের সব উপরোধ উপেক্ষা করে প্রতিযোগিতাকে সেই অবস্থায় ফেলে এরিয়ান ফিরে এলো কলকাতায়।

এরিয়ানের গৌরব পূর্ণতা পায় ১৯৪০ সালে, দুখীরাম মজুমদারের মৃত্যুর এগার বছর পরে। মোহনবাগানকে ৪-১ গোলে পরাজিত করে আই. এফ. এ-শীল্ড পায় ওরা। ১৯১১ সালে মোহনবাগানের পর ইতিমধ্যে ভারতীয় দল শীল্ড পেয়েছে একমাত্র মহামেডান স্পোর্টিং ১৯৩৬ সালে। অর্থাৎ কলকাতা ফুটবলে ভারতীয়করণ পূর্ণ হবার পর প্রথম শীল্ড জয়ের গৌরব এরিয়ান্সের। ১৯৩২-৩৪ সালে পর পর তিনবার কুচবিহার কাপ জয় করে এরিয়ান্স, যে কীর্তি এক ন্যাশানাল ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এরিয়ান্সের যে সব খেলোয়াড়কে এ রাজ্যের দিকপাল বলা যেতে পারে, তাদের মধ্যে দুখীরাম মজুমদারের সৃষ্টি ছোনে মজুমদার। ১৯১৪ সালে একেবারে কিশোর বয়সে অনিয়মিতভাবে এরিয়ান্সের পক্ষে খেলতে সুরু করেন। তারপর তৃতীয় দশক থেকে নিয়মিত খেলে ১৯৪০ সালে শীল্ড-জয়রূপ পিতৃ-তর্পণ করে অবসর গ্রহণ করেন। সেণ্টার-হাফ এবং ব্যাক হিসেবে ছোনে বহুদিন সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছেন। যেমন বল ঠেকানোয় দৃঢ়তা, তেমনি ফরোয়ার্ডকে

নির্ভুল বল দেওয়া। আবার সেণ্টার-ফরোয়ার্ড খেলে শীল্ডের চ্যারিটি ম্যাচে ক্যালকাটার বিরুদ্ধে একা দুগোল করার রেকর্ডও তাঁর আছে। বাঙালী স্পোর্টসম্যান বলতে এক কথায় ছোনে। ক্রিকেটে ব্যাট্‌স্‌ম্যান হিসেবে যেমন ছিলেন তিনি নিরেট ঠেকাদার, তেমনি চাবুকের মত মারে মারে বিপক্ষকে অন্ধকার দেখিয়েছেন তিনি। একাধারে গুগলি বোলার ও উইকেটকীপার ; আর ফিল্ডিং-এ তাঁর জুড়ি বেশী দেখা যায়নি কলকাতা ক্রিকেটে।

গোলে ডি'সিলভা ও পূর্ণ দাস কলকাতা ফুটবলের গৌরব। প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগের ব্যাক-জুড়ি টগর মুখার্জী ও সুশান্ত ঘোষকে কলকাতার শ্রেষ্ঠ ব্যাকদের মধ্যে ধরা যায়, যেমন যায় প্রাক-যুদ্ধ যুগের কালী ঘোষ এবং সুবল ঘোষকে। দুপায়ে সমান শট্‌, তার উপর বাঘের মত বলের উপর লাফ দিয়ে পড়তেন সুবল ঘোষ। আক্রমণকারী ফরোয়ার্ড নাকাল, বল চলে গেছে নিজের দলের হাফ-ব্যাক বা ফরোয়ার্ডের পায়ে। চতুর্থ দশকের ব্যাকদের মধ্যে নাম করার মত আশু ভট্টাচার্য ও ভোলা সরকার। আশু ভট্টাচার্যের অধিনায়কত্বে প্রথম বে-সামরিক দল ই. আই. আর. ডুরাণ্ডে রানার্স-আপ হয় ১৯২৭ সালে।

হাফ-ব্যাক হিসেবে প্রাক-যুদ্ধ যুগের অমূল্য ঘোষ ও ফকির শীল এবং তৃতীয়-চতুর্থ দশকের কানাই ঘোষ ও কৃষ্ণ ঘোষ সর্বশ্রেষ্ঠ। কলকাতা ফুটবলে একমাত্র অমূল্য ঘোষের কাছেই শিবদাস ভাদুড়ী জব্দ ছিল। এছাড়া প্রথম যুদ্ধোত্তর যুগের হারান সাহা এবং তুলসীদাস উল্লেখযোগ্য। এদের দুজনই পরে ইস্টবেঙ্গলে চলে যান।

এরিয়ান্সে তৃতীয় দশকের শেষার্ধের খেলোয়াড় বীরেন ঘোষকে নিঃসন্দেহে ১৯১১ সালের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ ভারতীয় রাইট-আউট বলা চলে। যেমন বুদ্ধিদীপ্ত সূক্ষ্মকৌশল, তেমনি দৈহিক শক্তির প্রয়োগ—দুই-এর অনবদ্য

সমন্বয় দেখা গেছে তাঁর খেলায়। যেমন ক্ষিপ্রগতি, তেমনি পায়ের কায়দা। তারপর বল পড়বে হয় গোলের সামনে, নিজ দলের ফরোয়ার্ডের পায়ের ডগায় বা মাথার সামনে, না হয় একেবারে গোলের ভিতর। আউট-এ খেলে অনেক গোল করেছেন তিনি। সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িত থেকে কারান্তরালে তাঁকে যৌবন কাটাতে হয়েছে। ১৯৩২ সালে কুচবিহার কাপের ফাইনালে খেলার ঠিক পরে মাঠ থেকেই পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তাঁকে। সেই থেকেই তাঁর খেলায় পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। বীরেন ঘোষের যুগের লেফট-আউট দলুবাবু এবং তার আগের যুগের হরিদাস ইয়োরোপীয়ান দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের পক্ষে খেলবার মর্যাদা অর্জন করেছিলেন।

বীরেন ঘোষের আগের যুগে এরিয়ানের শ্রেষ্ঠ ফরোয়ার্ড ছিলেন ডি. গুহ ওরফে ছানা বাবু। মার্জিত ও কৌশলী খেলায় কুমারের জাতের ছিলেন তিনি। অনেকের মতে ছানা বাবুই ঐতিহাসিক যুগে এরিয়ানের সর্বশ্রেষ্ঠ ফরোয়ার্ড। পরের যুগে ইন-সাইড মতিয়ার রহমান-এর খেলাও এই একই জাতের ছিল। আরও পরে দুখীরামবাবুর পরের যুগে এরিয়ান দলে যারা নাম করেছিল, তাদের মধ্যে প্রধান হল কে. প্রসাদ, নির্মল ঘোষ ও ডি. ব্যানার্জী। আউট হিসেবে প্রসাদ যেমন ছিল দৌড়ের ওস্তাদ, তেমনি লাফিয়ে মোক্ষম সেণ্টার ফেলতো। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রসাদ-ই সেদেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। সে দেশের লোকে ওর নাম দিয়েছিল "মিকি মাউজ।" নির্মল ঘোষ স্পোর্টিং ইউনিয়ানে খেলেই কিছু নাম করেছিলেন, তবে খেলার উৎকর্ষ এরিয়ানে এসেই বাড়ে। একেবারে প্রথম শ্রেণীর রাইট-আউটদের দলে তাঁর স্থান নিঃসন্দেহ। ডি. ব্যানার্জী, সেণ্টার-ফরোয়ার্ড। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ফাইনালে একাই তিনটে গোল করে ব্যানার্জী চূড়ান্ত সাফল্য দেখিয়েছিলেন।

তবে সেণ্টার-ফরোয়ার্ড হিসেবে প্রাক্-যুদ্ধ যুগের নির্মল চ্যাটার্জীর

দানবীয় শটের তুলনা নেই। কলকাতার সবসেরা গোলকীপার মাচ-এর কব্জি ভেঙ্গে গিয়েছিল চ্যাটার্জীর শট ধরবার চেষ্টায়। চেষ্টা সার্থক হয়নি, কারণ তাতে গোল হয়ে যায়, আর তারই জোরে সে বছর লক্ষ্মীবিলাস কাপ জেতে এরিয়ান।

ন্যাশানালের মন্মথ গাঙ্গুলী এবং মোহনবাগানের দ্বিজেন বসু ও গাইসবাবুর পরে আই. এফ. এ. দপ্তরের দায়িত্ব পান এরিয়ান্সের প্রফুল্ল মুখার্জী বা পি. কে। ১৯২৯ সালের ফুটবল-বিপর্যয়ে নৃপেন সরকার যে মধ্যস্থতা করেন, তার সহযোগিতায়ও দৌড়-ঝাঁপ দেখা-সাক্ষাৎ অনেকখানি করেছিলেন তিনি। পরের চার বছর আই. এফ. এ-র যুগ্ম সম্পাদকতা করেন। তাঁরই সময়ে, তাঁরই চেষ্টায় খেলোয়াড়দের দলবদলের নিয়মকানুনে বাঁধাবাধির সৃষ্টি হয় এবং সমগ্র আইনের বহু পরিবর্তন সাধিত হয়। আই. এফ. এ-র পাকাপাকি আফিস প্রফুল্ল বাবুরই কীর্তি, এবং সে আফিসের আধুনিক কালের কর্ণধার ভারতীয় ক্রীড়াজগতের অনন্যসাধারণ ব্যক্তি বিশু বসু তাঁরই আবিষ্কার। ১৯৩৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ভারতীয় দলের ম্যানেজার হিসেবে তিনি সেদেশে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

এরিয়ান আজও শক্তিমান দল এবং জনপ্রিয়ও বটে। আজও যে কোন শক্তিশালী দল এরিয়ান্সের বিরুদ্ধে নিঃশঙ্কচিত্তে খেলতে নামতে পারে না। আজও এরিয়ান্সকে কলকাতার ফুটবলারদের লালনাগার বলা চলে, কারণ এই ব্যাপক খেলোয়াড় আমদানীর যুগেও এরিয়ান স্থানীয় ফুটবলার নিয়েই দলগঠন করে। তবে দুখীরামবাবুর মত খেলোয়াড় আবিষ্কার করার এবং কাঁচা খেলোয়াড়কে ঘষেমেজে মানুষ করার, আজ কারো নেশাও নেই, যোগ্যতাও নেই। কোথায় আজ সে গুণিন যে ছোবল দেখলেই বিষের তীব্রতা ও পরিমাণ বুঝে নিয়ে বলবে ও জাত-সাপ?

এরা ওরা ও আরো অনেকে

কলকাতা ফুটবলের আসর জমেছে রথী-মহারথী মোহনবাগান, এরিয়ান্স, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিংকে কেন্দ্র করে। তাবলে সভাসদ ছাড়া সভা জমে কি কখনো? কাজেই এদের আশেপাশে যেসব বাঙ্গালী দল নিজেদের খেলা খেলে গিয়েছে, কলকাতা ফুটবলের বিকাশে তাদের দান একেবারে অবহেলার বস্তু নয়। বিশেষ করে এরিয়ান্স ছাড়া আর সব বড় দলই তৈরী খেলোয়াড় নিয়ে দলপুষ্ট করেছে, আর তার জোগান এসেছে অন্যান্য জৌলুষবিহীন ক্লাব থেকে। বিশেষ করে, সারা ভারত সেঁচে মানিক-মার্কা খেলোয়াড় সংগ্রহের নেশা চতুর্থ দশকের আগে কোন দলের মধ্যেই দেখা যায়নি।

কলকাতা ফুটবলের দরবারে এই সব সভাসদদলের মধ্যে প্রথম যুগে প্রধান ছিল চুঁচুড়া স্পোর্টিং ও টাউন ক্লাব। পরবর্তী যুগে প্রধান পারিষদের মর্যাদা পায় কুমারটুলি ও তাজহাট। তৃতীয় দশকে প্রাধান্য লাভ করে স্পোর্টিং ইউনিয়ান ও হাওড়া ইউনিয়ান এবং চতুর্থ দশকে পার্শ্ব অভিনয়ে আসর মাত করে কালীঘাট ও ভবানীপুর।

চুঁচুড়া কোনদিন লীগ খেলার সুযোগ পায়নি। শীল্ড খেলেছে, বাঙালীদের বিরুদ্ধে, জিতেছেও। এমন কি একবার চতুর্থ রাউণ্ড পর্যন্তও গিয়েছিল। টাউন ক্লাব দ্বিতীয় লীগে স্থান পায় ১৯১৭ সালে, বোধ হয় প্রাচীনত্বের জোরে। ১৮৮৫ সালে শোভাবাজার এবং ন্যাশানালের সঙ্গে একই বছর প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাব বর্তমানে কলকাতার মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রাচীনতম।

১৯১৫ সালে শীল্ডের কোয়ার্টার-ফাইনালে যে ভাবে মোহনবাগানের সঙ্গে রুখেছিল, তার পুরস্কার স্বরূপই হয়ত লীগে স্থান পেয়ে থাকবে। ১৯২১ সালে ২৪টা খেলায় ৩৫ পয়েণ্ট পেয়ে লীগে রানার্স-আপ হয়, ওয়েস্ট কেণ্ট 'বি'-র পিছনে। কিন্তু সেকালের যথেচ্ছাচারের যুগে প্রথম বিভাগে উঠতে পারে নি তারা, বোধ হয় প্রথম বিভাগ থেকে কাস্টমসকে নামানো মেডলিকটের মনঃপূত ছিলনা। দুবছর বাদে কুচবিহার-কাপে ফাইনালে ওঠে ওরা; ভবানীপুর স্পোর্টিং-এর কাছে হেরে যায়। ১৯৩২ সালে লীগে সবার নীচে পড়ে থেকেও নেমে যেতে হয়নি টাউন ক্লাবকে। কারণ, প্রথম বিভাগ তালিকার শেষ ধাপে ছিল ড্যালহৌসী। অতএব তাদের রেখে একটা দল বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে সব বিভাগে নামানো বন্ধ রাখা হল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রাচীন টাউন ক্লাব তৃতীয় বিভাগে নেমে যায় ১৯৫৫ সালে। টাউন ক্লাবের গৌরবের বছর ১৯৩৭। মহামেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করে কুচবিহার কাপে জয়ী হয় সেবার। মোহনবাগানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় সতু চৌধুরী টাউন ক্লাবের দান। সে দলের অন্যান্য বিখ্যাত খেলোয়াড়দের মধ্যে তালুকদার, দাশগুপ্ত, পাঁচু চ্যাটার্জী ও আই. এফ. এ-র সহ-সভাপতি নীরেন দে উল্লেখযোগ্য।

তাজহাটের রাজা গোপাল লাল রায় ১৯১৫ সালে যে তাজহাট টিম তৈরী করেন, বাঙলা ফুটবলে সে দলকে অন্যতম শক্তিশালীদল বলা চলে নিঃসন্দেহে। ১৯০৫ সালে নানা দল থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহ করে রাজা বাহাদুর সাময়িক ভাবে তাজহাট দল গঠন করে নবাব বেগম কাপ জয় করেন, কলকাতারই খেলায়। ১৯১৫ সালেই তাজহাট কুচবিহার কাপ জেতে, আবার জেতে আঠার ও উনিশ সালে; দ্বিতীয়বারে দ্বিতীয় বিভাগ লীগ চ্যাম্পিয়ান কুমারটুলিকে পরাজিত করে। শীল্ডের খেলায় তাজহাট বিরাট বিক্রম দেখায়। ১৯১৬ সালে সমারসেটকে পরাজিত করে।

পরের বছর লীগ চ্যাম্পিয়ান লিঙ্কন্‌স্‌কে পরাজিত করে উয়াড়ী এসে হারে তাজহাটের কাছে। মিডলসেক্স অতিরিক্ত সময়ে ২-১ গোলে তাজহাটকে হারায়। ১৯২০ সালে কুমারটুলি যখন তাজহাট, এরিয়ান্স ও মোহনবাগানকে হারিয়ে শীল্ড ফাইনালে হেরে যায়, তখন এই কথাই বলেছে লোকে যে, তাজহাট উঠলে শুকনো মাঠে তাকে হারাতে পারতো না ব্ল্যাকওয়াচ। পর পর কবছর সাফল্যের জোরে কুড়ি সালে ওরা দ্বিতীয় বিভাগ লীগে ঠাঁই পায়। কিন্তু ওই শেষ। রাজা বাহাদুরের খেয়াল মিটে গেছে এতদিনে। তাই পরের বছরে তুলে দিলেন টিম, আর দ্বিতীয় বিভাগ লীগে তাদের শূন্য আসন দখল করলে ইস্টবেঙ্গল। জনশ্রুতি ছিল ইস্ট-বেঙ্গল দলগঠনে সহানুভুতি বোধ করে দ্বিতীয় বিভাগে তাদের স্থানলাভ সহজ করার জন্যই টিম তুলে দেন তাজহাটরাজ গোপাল রায়।

রাজার খেয়ালে সখের টিম, খেলোয়াড়েরা প্রচুর তোয়াজ পেয়েছে সেখানে। কাজেই মোহনবাগানের বাইরে যত ভালো খেলোয়াড়, সব জমা হয় তাজহাটে। শোভাবাজারের বিখ্যাত গোলকীপার সুরপতি মুখার্জী ছিলেন তাজহাট (রাজসাহী) এস্টেটের কর্মচারী। তিনিই হন দলের প্রথম অধিনায়ক। দল গঠনে রাজাবাহাদুরের ডান হাত ছিলেন এরিয়ান্সের বিখ্যাত ব্যাক সুবল ঘোষ।

ইস্টবেঙ্গলের ব্যাক ভোলা সেন ও প্রফুল্ল চ্যাটার্জী ছিলেন তাজহাটে। মণি দাস এবং ননী গোঁসাই-ও ছিলেন তাজহাটের হাফ-ব্যাক। ফরোয়ার্ডে সামাদ, ধীরা মিত্র, বিজন মিত্র, নালু রায়, যামিনী রায়, সুবোধ মিত্র, তখন তাজহাটকে দুর্দম করে তুলেছিল। রাজা গোপাল রায় নিজেও ছিলেন ভালো সেণ্টার-ফরোয়ার্ড। তবে পাকাপাকি দলগঠন করার পর নিয়মিত খেলেননি তিনি। তাজহাট ক্ষণিক-দীপ্তিতে কলকাতা ফুটবলের অঙ্গন উদ্ভাসিত করে চকিতেই মিলিয়ে যায়; খেলোয়াড়েরা নানা দলে ছড়িয়ে পড়ে।

কুমারটুলির কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। প্রায় শোভাবাজারের সমসাময়িক এই ক্লাব ১৯১৪ সালে ট্রেডস কাপে জয়ী হয়, এবং ১৯১৭ সালে দ্বিতীয় লীগে জায়গা পায়। ওই বছরই লীগের রাণার্স-আপ হওয়া ছাড়াও ওরা কুচবিহার কাপ জেতে। বিশ সালে শীল্ডে ফাইনাল খেলার পরই কুমারটুলির জৌলুষ ক্রমশ মিলিয়ে আসে। বিশেষ তখন কুমারটুলি ক্লাবের ধনী পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অনেকেই, কুমারটুলির যোগ্যতার সম্মান না পাওয়ায় হতাশ হয়ে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেছে।

কুমারটুলির কথা বলতেই সর্বপ্রথম মনে আসে ব্যাক তুলসী দত্তর কথা। কলকাতা ফুটবলে তুলসী দত্ত নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাক, কুমারটুলি দলের সমগ্র সার্থকতার মূলস্তম্ভ। যেমন লম্বা লম্বা শট, তেমনি যথাস্থান বেছে নিয়ে দাঁড়ানো, ও বল কেড়ে নেবার ক্ষমতা। আর অমন অব্যর্থ ফ্রী-কীক আর কারো হয়নি কোনদিন। ফরোয়ার্ডে ফিরিঙ্গী হুইটলে ছিল খুব চতুর খেলোয়াড়; চটপট যে কোন অবস্থা থেকে শট মারায় ওস্তাদি ছিল তার। মোহনবাগানে যোগ দেবার আগে ফজলুর রহমান খেলতো কুমারটুলিতে। প্রথম দশকে কুমারটুলির সবচেয়ে নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন লেফট-আউট মশা বোস ও হাফ-ব্যাক দ্বিজেন ঘোষ।

কুমারটুলির সে যুগের কথায় গোলকীপার বংশী গোঁসাইর কথা স্বতই এসে পড়ে। ১৯১৯ সালে তরুণ গোঁসাই খুব নাম করেছিল। বিশ সালে বন্ধু-বৎসল বংশী আব্দার ধরলে, তার প্রাণের বন্ধু সাহাজাদাকে গোলে খেলাক কুমারটুলি। সাহাজাদা ক্লাবে দুনম্বর গোলকীপার ছিল, কিন্তু বংশীকে বসিয়ে তাকে খেলানো কারো মনঃপূত ছিল না। শেষ পর্যন্ত সাহাজাদাকে শীল্ডে খেলবার সুযোগ করে দেবার উদ্দেশ্যে বংশী আত্মগোপন করলে। অনেক খোঁজাখুজি করেও তার সন্ধান মিললো না। ক্লাবও রাগ করে সাহাজাদাকে খেলালে না, খেলালে তারক দে-কে। কুমারটুলি ক্লাবের অনেকের আজও

বিশ্বাস, শীল্ড ফাইনালে যে দুটো গোল ওদের দিয়েছিল ব্ল্যাকওয়াচ, বংশী থাকলে তার একটাও গোলে ঢুকতো না।

কুমারটুলির পরেই দ্বিতীয় বিভাগে লীগে বাঙালী চ্যাম্পিয়ান দল স্পোর্টিং ইউনিয়ান। ক্রিকেট ক্লাব হিসেবেই ছিল সে দলের প্রধান খ্যাতি। ১৮৯৬ সালে মার্কাস স্কোয়ারে দ্বিজেন সেন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর জে. এন. ঘোষ বা খোঁড়াবাবুর নেতৃত্বে ক্লাব ক্রমে জমে ওঠে। ১৯২০ সালে দ্বিতীয় বিভাগ লীগে ক্লাব সংখ্যা বাড়িয়ে যখন নয় থেকে বারো করা হয়, তখনই স্পোর্টিং ইউনিয়ানের স্থান হয় সেখানে। তারপর মাঝামাঝি থাকতে থাকতে, ১৯২৮ সালে কুড়িটা খেলায় অপরাজিত থেকে ও ৩৬ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়। পরের বছর প্রথম বিভাগে উঠে প্রথম বারেই আটটা খেলায় জয়লাভ করে ওরা পঞ্চম স্থান পায়, ড্যালহৌসী, ডি. সি. এল. আই, মোহনবাগান ও ক্যালকাটার পরেই। কিন্তু তার পর দু বছর টিকে থেকে ১৯৩৩ সালে লীগ তালিকার একেবারে তলায় নেমে যায়। ১৯৩৪ ও ১৯৩৭ সালে দ্বিতীয় বিভাগে রাণার্স-আপ হয় ওরা এবং ১৯৪৬ সালে আবার চ্যাম্পিয়ান হয়ে বর্তমানে সেই থেকে প্রথম বিভাগেই খেলছে। ১৯৩৩-এ দ্বিতীয় বিভাগে নেমে গিয়েও সেবারই ওরা কুচবিহার কাপের ফাইনালে খেলে এবং তারপর আবার খেলে ১৯৩৫-৩৬ সালে; কিন্তু প্রতিবারই রাণার্স-আপ হতে হয়। ১৯৩৩ সালেই আই. এফ. এ. শীল্ডের সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁচেছিল ওরা।

ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে স্পোর্টিং ইউনিয়ানের অনেক খেলোয়াড়ই প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি খেলার মাঠে আঘাত পেয়ে মারা যান প্রতুল ব্যানার্জী, তিনি প্রথম শ্রেণীর ব্যাক ছিলেন। ক্রিকেটার শৈলজা রায় অদ্ভুত ভালো ফরোয়ার্ড ছিলেন, আর সেণ্টার-ফরোয়ার্ডে প্রচুর খ্যাতি ছিল গবা ঘোষের। গোরা বসাকের খ্যাতিও

কিছু কম ছিল না। গোলকীপার সন্তোষ দত্ত এ দলেই প্রথম খেলেন। আই. এফ. এ-র বর্তমান সেক্রেটারী বেচুবাবু প্রথম স্পোর্টিং ইউনিয়ানে হাফ-ব্যাক খেলেই নাম করেন এবং দূর প্রাচ্য সফরকারী প্রথম দলে স্থান পান ১৯২৪ সালে। পরে তিনি কিছুদিন ই. বি. আর-এ খেলেন। শেরউডের বিরুদ্ধে খেলায় তাদের বিখ্যাত লেফট-আউট হাওয়েলকে একেবারে বগলদাবা করে রেখেছিলেন বেচুবাবু।

প্রথম বিভাগ লীগের যুগে স্পোর্টিং ইউনিয়ানের সবচেয়ে খ্যাতিমান খেলোয়াড় নাসিম, সেলিম ও নির্মল ঘোষ। নাসিমের মত সাইড-হাফ এবং সেলিমের মত আউট খুব বেশি হয়নি। দুজনই ভারতীয় দলের পক্ষে খেলেছে, এবং পরে মহামেডান স্পোর্টিং এ যোগ দিয়েছিল। তারও পরে নাসিম এরিয়ান্সে যোগ দেয় এবং শীল্ড-বিজয়ী এরিয়ান্স দলে ছিল সে-ই প্রধান বীর। কর্ণার কীক, ফ্রী-কীক বা একটু থামিয়ে সেণ্টার করায় সেলিম ছিল বিপক্ষের বিভীষিকা। পায়ে যাদের বল পড়লে বিপক্ষের বুক দুরুদুরু সেলিম ছিল সেই জাতের। মহামেডান স্পোর্টিং-এ খেলে যখন, একদিন আর তাকে পাওয়া গেল না। গুজব শোনা গেল, জাহাজে কাজ নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়েছে। স্পোর্টিং ইউনিয়ানের যুদ্ধোত্তর যুগের খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যাকে সুনীল চ্যাটার্জী, সেণ্টার-ফরোয়ার্ডে টেষ্ট ক্রিকেটার পঙ্কজ রায় ও ইন হিসেবে সাংবাদিক অজয় বসু উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাসাগর কলেজে পড়বার সময় বন্ধু বান্ধবের চেষ্টায় স্পোর্টিং ইউনি-য়ানের সংস্পর্শে আসেন পঙ্কজ গুপ্ত। এই ক্লাবের প্রতিনিধি হিসেবেই তিনি আই. এফ, এ-তে প্রবেশ করেন এবং ১৯২৪ সালে সুদূর প্রাচ্য সফরকারী বাঙালী ফুটবল দলের সহকারী ম্যানেজার হন। বস্তুত ক্রীড়া সংগঠনের আত্ম প্রতিষ্ঠায় স্পোর্টিং ইউনিয়ানই ছিল তার প্রথম এবং প্রধান সোপান।

স্পোর্টিং ইউনিয়ানের পরের বছরই দ্বিতীয় বিভাগ লীগ চ্যাম্পিয়ান হয় হাওড়া ইউনিয়ান। ওরা সেবার অপরাজিত ছিল এবং ১২টি খেলায় ১৭ পয়েণ্ট পেয়েছিল। ১৯২৬ সালে মোহনবাগানকে হারিয়ে ওরা কুচবিহার কাপের ফাইনালে ওঠে এবং তাতেই নাম করে। ফাইনালে অবশ্য মেডিকেল কলেজের কাছে হেরে যায়। এই সুনামের জোরে ১৯২৭ সালে দ্বিতীয় লীগে স্থান পায় এবং ১৯৩১ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত প্রথম বিভাগে খেলে। ডি সি. এল. আই. ও ইস্টইয়র্কসকে হারিয়ে ১৯৩৬ সালে শীল্ডের সেমি-ফাইনালে ওঠে আর ১৯৩৮ সালের শীল্ডে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে পরাজিত করে।

কুমারটুলীর যেমন তুলসী দত্ত, হাওড়ার তেমনি দেবী ঘোষ। গোষ্ট পালের চূড়ান্ত খ্যাতির যুগেও ব্যাক হিসেবে এদের দুজন প্রচুর নাম করেছিলেন। দীর্ঘকায় এবং শীর্ণদেহ দেবী ঘোষের কীক এবং অবস্থান-বুদ্ধি ছিল অনবদ্য। হাওড়ার অপর খ্যাতিমান খেলোয়াড় ছিল সেণ্টার-ফরোয়ার্ড শচীন দত্ত। গোলকীপার পদ্ম ব্যানার্জী তখনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হত, পরে মোহনবাগানেও কিছুদিন খেলেছে। হাওড়ার অপর কৃতী গোলকীপার ছিল প্লাকনেট। এদলের অন্যান্য প্রখ্যাত খেলোয়াড় ছিল—শচা বোস, আহ্লু পাল, দাশু মিত্র, সোনা ভট্টাচার্য ও রাজা মুখার্জী। খেলার মাঠে আঘাত পাওয়ার ফলে রাজা মুখার্জীর অকালমৃত্যু ঘটে। মোহনবাগানখ্যাত ল্যাংচা মিত্র ও বিজন বোস প্রথমে হাওড়া ইউনিয়ানে খেলতেন।

আজও কালীঘাট দলের বিরুদ্ধে শনি মঙ্গলবারে খেলার সম্পর্কে একটা ভয় আছে যে কোন দলের। কালীঘাট কিন্তু প্রথম প্রকাশেই যে তেজ দেখায়, তাতে তাদের কলকাতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীশ্রী৺ কালীমাতার আশীর্ব্বাদপুষ্ট মনে করা বিচিত্র কিছু নয়।

১৯২২ সালের ইস্ট ইউথ ক্লাব ছ বছর বাদে নাম বদলে কালীঘাট ক্লাব

হয়। ১৯৩১ সালে তৃতীয় বিভাগ লীগে প্রথম স্থান পেয়েই ওরা চ্যাম্পি-য়ান হয়, এবং পরের বছর দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়ে ১৯৩৩ সাল থেকে প্রথম বিভাগে খেলছে। ১৯৩৩ সালই ওদের সব থেকে গৌরবের বছর। কারণ, লীগের প্রথম অর্ধের শেষে ওরাই ছিল তালিকার শীর্ষে, যদিও শেষ পর্যন্ত কাস্টমস ও মোহনবাগানের সঙ্গে সমান পয়েণ্ট করে তৃতীয় স্থানের ভাগীদার হতে হয়, চ্যাম্পিয়ান ডারহাম থেকে চার পয়েণ্ট পিছনে। ঐ বছরেই লক্ষ্ণৌর প্রতিযোগিতা আই. এফ. সি. শীল্ডে প্রথম ভারতীয় বিজয়ীর গৌরব অর্জন করে। এর পর লীগে বা শীল্ডের খেলায় তেমন বিশেষ কৃতিত্ব না থাকলেও, শক্তিশালী দল বলে ওদের খ্যাতি অনেক দিন পর্যন্ত ম্লান হয়নি। বাইরের খেলোয়াড় আমদানী করে এবং খেলোয়াড়দের জন্য অর্থ ব্যয় করে দলগঠনে পথ-প্রদর্শক কালীঘাট। দিল্লী থেকে আসে আকিল আহমেদ, দক্ষিণ ভারত থেকে জন, জোসেফ, রামালু, এমন কি ব্রহ্ম দেশ থেকে পর্যন্ত আসে পাগস্‌লে, হ্যারিস, ও ডি লা টেস্ট। ইস্টবেঙ্গলখ্যাত আপ্পারাও-কে কালীঘাট-ই প্রথম কলকাতায় আনে। কলকাতা ফুটবলের আরও অনেক খ্যাতিমান খেলোয়াড় কালীঘাট-এর হয়ে প্রথম পরিচিতি অর্জন করে। তাদের মধ্যে তরু সেনগুপ্ত, বেণীপ্রসাদ, প্রেমলাল, নন্দা রায় চৌধুরী, হীরা দাস, মোহিনী ব্যানার্জী ও এস নন্দী উল্লেখযোগ্য। কালীঘাটের গোলকীপার এস. ব্যানার্জী কলকাতার মাটিতে প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ ভারত বনাম চীন খেলায় ১৯৩৬ সালে ভারতের পক্ষে খেলেছিলেন।

কার্জন পার্কের দক্ষিণে রাজপথের পাশে ময়দানের মধ্যে বৃহত্তম যে তাঁবু, তার অধিকারী ভবানীপুর ক্লাব, ন্যাশানাল-এর উত্তরাধিকারী হিসেবে, দক্ষিণ কলকাতার ধনী ও অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। ভবানীপুর ইম্পিরিয়াল এবং ভবানীপুর স্পোর্টিং মিলিত হয়ে এই ক্লাব গঠিত হয় ১৯২৫ সালে। সেই থেকেই যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে দ্বিতীয় বিভাগে খেলে ১৯৩৬

সালে ওরা চ্যাম্পিয়ান হয়। ইতিমধ্যে ১৯২৬, ১৯২৭ এবং ১৯২৯ সালে কুচবিহার কাপ জেতে, শেষের বার মোহনবাগানকে হারিয়ে। ১৯৩৭ সালে প্রথম বিভাগ লীগে খেলতে এসেই ওরা ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যুগ্ম রানার্স-আপ হয়। আবার রাণার্স-আপ হয় ১৯৪০ সালে এবং ১৯৫২ সালে। ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে শীল্ড ফাইনাল খেলে ১৯৪৮ সালে এবং তাতে মোহনবাগানের কাছে হেরে যায়।

পুরানো যুগে ভবানীপুরের বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন ফণী মিত্র, বুনো মিত্র ও থাকো মিত্র। তারপরও যারা নাম করেন, তাদের মধ্যে ল্যাংচা মিত্র, নরেন ব্যানার্জী ও মানা গুঁই পরে মোহনবাগানে খেলে। তারও পরবর্তী যুগে সুধীর সেন, টোনা দে, ভূপেন দাস ও বিজন বোস ভবানীপুরের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। এযুগে অজীত নন্দী, অনিল বসু, বেবি গুহ, তাজমহম্মদ ও রবি বসুই সর্বশ্রেষ্ঠ।

দল হিসেবে টেলিগ্রাফের আজ কোন খ্যাতি না থাকলেও ১৯২০ এবং ১৯২৯ সালের ট্রেডস কাপ বিজয়ী এবং ১৯২৫ সালের কুচবিহার কাপে রানার্স-আপ এই দল সে যুগে যথেষ্ঠ নাম করা ছিল। এদলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড মারকুটো কালু ঘোষ আর গোলকীপার পিণ্ডে দত্ত সে কালের প্রখ্যাত খেলোয়াড়। কালু ঘোষ ভবানীপুর এবং ইস্টবেঙ্গলেও খেলেন।

বর্তমানে যে সব দল প্রথম বিভাগে খেলছে তাদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী দল রাজস্থান। মাড়োয়াড়ী ক্লাব হিসেবে ১৯৩২ সালে চতুর্থ ডিভিশন লীগের পত্তন থেকে খেলতে সুরু করে। পরে ১৯৩৭ সালে রানার্স-আপ হয়ে তৃতীয় বিভাগে আসে এবং ১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিভাগেও আসে তৃতীয় বিভাগের রানার্স-আপ হিসেবেই। ১৯৪৮ সালে দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়ে তারপর থেকে রাজস্থান নামে পূর্ণ কৃতিত্বে প্রথম বিভাগ লীগে খেলে চলেছে ওরা।

জর্জ, টেলিগ্রাফ ১৯৩৩ সালে চতুর্থ বিভাগে এবং পরের বছর তৃতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় বিভাগে খেলে। শেষোক্ত বছর দ্বিতীয় বিভাগে চাম্পিয়ান হয়ে তারপর থেকে প্রথম বিভাগে রয়েছে।

বি. এন. আর ১৯২৯ সালে তৃতীয় বিভাগে খেলতে এসেই চ্যাম্পিয়ান হয়। কিন্তু পাঁচ বছর দ্বিতীয় বিভাগে থেকেই আবার নেমে আসে এবং ১৯৩৬ সালে খেলতে হয় একেবারে চতুর্থ বিভাগে। ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ সালে যথা ক্রমে চতুর্থ এবং তৃতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়ে তারপর থেকে দ্বিতীয় বিভাগে নিয়মিত খেলে। ১৯৪৯ সালে দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েই বর্ত্তমানে ওরা খেলছে প্রথম বিভাগে।

বর্তমানের খিদিরপুর ক্লাব নেপিয়ার হিসেবে ১৯২৮ সাল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে খেলে, ১৯৪৫ সালে চ্যাম্পিয়ান হয়। কিন্তু যুদ্ধের অজুহাতে ওঠা-নামা সাময়িকভাবে স্থগিত থাকার ফলে প্রথম বিভাগে উঠতে পারেনা। ইতি-মধ্যে নাম বদল করে আবার চ্যাম্পিয়ান হয় ১৯৫২ সালে এবং প্রথম বিভাগে স্থান পায়।

অরোরা একই সঙ্গে হকি, ক্রিকেট ও ফুটবলে প্রথম বিভাগে উঠে অনন্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কিন্তু ১৯৪১ সালেও ওরা দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধের ওজুহাত! ১৯২৮ থেকে তৃতীয় বিভাগে খেলে ১৯৩৭ সালে রানার্স-আপ হিসেবে দ্বিতীয় বিভাগে আসে। যুদ্ধের ওজুহাতে ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েও শালকিয়া ফ্রেণ্ডস প্রথম বিভাগে উঠতে পারেনি। আর পারেনি রবার্ট হাডসন, ১৯৪২ এবং ১৯৪৪ সালে। এরা ১৯৪০ সালে চতুর্থ বিভাগে সুরু করে পর পর তৃতীয় বছরেই প্রথম বিভাগে উঠবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। কিন্তু হায় যুদ্ধ!

কলকাতা ফুটবলের গৌরব—



বিমল মুখার্জী
(মোহনবাগান)



আর লাম্‌সডেন
(রেঞ্জার্স)



রহমৎ (মহামেডান স্পোঃ)



মুরুগেশ
(ইস্টবেঙ্গল)



পাগ্‌স্‌লে
(কালীঘাট ও ইস্টবেনল)

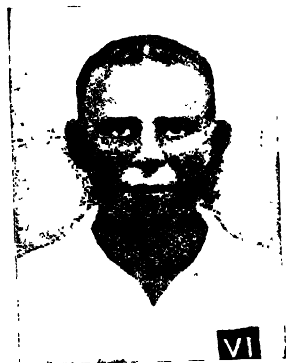
কলকাতা ফুটবলের ক্ষণিকের অতিথি—



লী ওয়াই টং
(চীনা দল—১৯৩৬)



পি. বি. ক্লার্ক
(ইস্‌লিংটন কোরিন্থিয়ান্‌স্‌)



বেকার (ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড)



ট্যারাণ্ট
(ইস্‌লিংটন কোরিন্থিয়ান্‌স্‌)

লীগ-বিজয় না দিগ্‌বিজয়

"ভেনি. ভিডি. ভিসি"-প্রাচীন যুগের মহাবীরপুরুষ জুলিয়াস সীজার তাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন এই তিনটি শব্দে। কলকাতা ফুটবলে ঠিক অনুরূপভাবে—এলাম, দেখলাম, জয় করলাম-বলবার সহজ অধিকার অর্জন করেছিল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

আঠার বছর ধরে মোহনবাগান এবং ন'বছর ধরে ইস্টবেঙ্গল প্রাণপণ চেষ্টা করেও যখন লীগ ফুটবলে ক্যালকাটা, ড্যালহৌসী এবং পল্টনীদল-গুলির প্রাধান্য কোন মতেই কমাতে পারছেনা, দুর্জয় দাপটে এগিয়েও হয়তো শেষ খেলায় বাজে দলের কাছে হেরে গিয়ে এক পয়েণ্টের জন্য রাণার্স-আপ হচ্ছে, আর নৈরাশ্যে গা এলিয়ে দিচ্ছে, এমন সময় ১৯৩৪ সালে প্রথম বিভাগে খেলবার সুযোগ পেল মহামেডান স্পোর্টিং। যেই এল আর দেখলো, সঙ্গে সঙ্গে জয়ের সংকল্প নিয়ে ছুটলো, ভারতীয় ফুটবলের দীর্ঘদিনের অপমানের কালিমা মুছে দিল নবজাগ্রত মুসলিম ফুটবলচেতনা। মধ্যযুগের দুর্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী মুসলিম বাহিনীরই মত বিজিগীষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মহামেডান স্পোর্টিং-এর বাহিনীও ছুটলো ঝড়ের মত, সবকিছু বাধা পদানত করে। মনে হল কলকাতা ফুটবলে আর কোন দল নেই। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত প্রথম বিভাগ লীগে এমন একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করলে, যে ধরণের দীর্ঘ একটানা আধিপত্য কোন প্রতিযোগিতামূলক খেলায় কোন দেশেই দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য, এর মধ্যে ১৯৩৯ সালে মোহনবাগান লীগ পেয়েছিল। মতভেদের ফলে মহামেডান স্পোর্টিং সরে গিয়েছিল আগেই।

আই.এফ.এ. শীল্ডও জিতলে তিনবার, এমন কি ডুরাণ্ড কাপে বৃটিশ পল্টনের একাধিপত্যও ভেঙ্গে দিলে।

ধর্ম-সংহতিতে বিশ্বাস মুসলিম সংস্কৃতির এক প্রধান বৈশিষ্ঠ্য। তাই ফুটবল খেলার উদ্দেশ্যেও কলকাতার মুসলমান সম্প্রদায় নিজস্ব দল গঠন করেছিল, মোহনবাগান ও এরিয়ান্স প্রতিষ্ঠিত হওয়ারও আগে। নবাবজাদা আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বে তারা জুবিলি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে ১৮৮৭ সালে। এর পর ক্রিসেণ্ট ক্লাব ও হামিদিয়া ক্লাব নাম পরিবর্তন করে সেই ক্লাবই ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব হয়ে বসে। ক্লাবের অস্তিত্ব থাকলেও সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পুরোভাগে আসতে এদেশের মুসলিম সমাজের যেমন নানা কারণে বিলম্ব হয়েছিল, ফুটবলের ক্ষেত্রেও তাই ঘটলো।

প্রথম যুগে ক্লাবের আর্থিক অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। বিশেষ করে সম্পন্ন মুসলমান সমাজ তখন মুসলিম ইনস্টিট্যুটের পৃষ্টপোষকতা করছে। ফলে মাঝে মাঝে দুএকটা ফ্রেণ্ডলি ম্যাচ খেলে নামকা ওয়াস্তে টিকে রইল শিয়ালদা কাইজার স্ট্রীটের মাঠে গরীব মুসলমানদের ক্লাব মহামেডান স্পোর্টিং। এরই মধ্যে শতাব্দীর শেষের দিকে ট্রেডস কাপে নাম দেবার সখ হল। প্রথম রাউণ্ডে ন্যাশানালের সঙ্গে ড্র করে তার পর হেরে গেল ৫-১ গোলে। পরের বছর খেলা সাহেবদল হেস্টিংস-এর সঙ্গে, এবার সাত গোলে কাৎ।

শতাব্দীর মোড় ফেরার মুখে মহামেডান স্পোর্টিং-এর ভাগ্যেরও মোড় ফিরলো সাময়িকভাবে। ইতিপূর্বে সি. বি. এস. স্কুলের মাঠে খেলবার জায়গা পেয়েছিল, এবার সৈয়দ আনিস হোসেন খাঁ-র কৃপাদৃষ্টি পড়ায় ময়দানে মাঠ জুটে গেল বর্তমান কালীঘাট মাঠে। ১৯০২ সালে ট্রেডস কাপের তৃতীয় রাউণ্ডে পৌঁচেছিল, কিন্তু শিবপুরের কাছে হেরে গেল ৩-০ গোলে। সেই

বছরই নবাব বেগম শীল্ডে ন্যাশনালের সঙ্গে ছ দিন ড্র খেললে। তারপর সার্থকতা চরমে তুললে কুচবিহার কাপ জিতে। এর পর ১৯০৬ সালে এবং ১৯০৯ সালে আবার কুচবিহার কাপ জিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করলে মহামেডান স্পোর্টিং।

কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আবার আঁধার ঘিরে ধরলো। সম্ভ্রান্ত ও বিত্তবান মুসলমানেরা জমা হল ওরিয়েণ্টাল স্পোর্টিং-এ, অবজ্ঞাত মহামেডান ময়দানের কোণে কোনমতে দিনপাত করতে লাগলো। ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালে চেষ্টা করে ওরিয়েণ্টালকে লীগে স্থান করে দেওয়া হল; তবে দ্বিতীয়বার তলায় পড়ে থেকে ১৯২১ সালে লীগ খেলবার অধিকার হারাল ওরা।

তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে কিছু কিছু বর্ধিষ্ণু সমাজের আনাগোনা সুরু হয়। কিন্তু তারা উৎসাহ দেখায় ক্রিকেট ও হকিতে, ফুটবল অবজ্ঞাত হয়েই থাকে। এই সময় ক্লাবের সেক্রেটারী হন এস. এ. রসিদ এবং তাঁরই আগ্রহে ক্লাবের ফুটবল দল নতুন করে সংগঠিত হয়। ১৯২৭ সালে ট্রেডস কাপের ফাইনালে পৌঁছয় ওরা, তবে পুলিশের কাছে হেরে যায়।

এই কৃতিত্বের দাবীতেই পরের বছর ওরা দ্বিতীয় বিভাগ লীগে খেলবার অধিকার পেল। কিন্তু মরশুমের শেষে দেখা গেল মাত্র দশটি পয়েণ্ট মিলেছে, আর তার ফলে পড়ে থাকতে হয়েছে একেবারে তলায়, সেণ্ট জেভিয়ার্সের সাথী হয়ে। কে নামবে তৃতীয় বিভাগে তার জন্য দুদলে খেলা। ভাগ্যের জোরে সে খেলায় সেণ্ট জেভিয়ার্সকে হারিয়ে কোন মতে টিকে গেল মহামেডান স্পোর্টিং। কিন্তু পরের বছর অবস্থা আরও শোচনীয়। শেষ পর্যন্ত মাত্র আট পয়েণ্টের বেশি আর হল না। এবার সাথীবিহীন হয়ে তলদেশ থেকে নিচে পড়ে যাওয়া ঠেকাবার কোন উপায় নেই। ত্রিশ

সালে লীগ খেলা বন্ধ। ইতিমধ্যে হাওড়ার ই. আই. আর. দল উঠে যাওয়ায়, সেই শূন্য স্থানে থেকে যাবার অনুমতি পেল মহামেডান স্পোর্টিং।

দলের ভূতপূর্ব হকি-অধিনায়ক এস. এ. আজিজ এই সময় ক্লাব পরিচালনায় দায়িত্ব পান। তাঁর মাথায় খেলে যায় যে, ক্লাবের পিছনে যদি মুসলিম জনসাধারণের সমর্থন না আসে তো জনকয়েক বড় লোকের মজলিশ হয়ে ক্লাব বড় হতে পারে না কোনদিন; আর জনপ্রিয়তা অর্জনের একমাত্র পথ হল ফুটবলে সার্থকতা লাভ। এই স্থির বিশ্বাসে আজিজ সাহেব ফুটবল দল সংগঠনে আত্মনিয়োগ করলেন। ফলে একত্রিশ সালে দ্বিতীয় বিভাগ লীগে চতুর্থ স্থান পেল মহামেডান; ইস্টবেঙ্গল, ই. বি. আর. ও লয়াল রেজিমেণ্ট 'বি'-র পিছনে। পরের বছর মোহনবাগানের নাকচ-করা কালে খাঁ এবং হাফিজ রসিদ-কে আজিজ সাহেব দলভুক্ত করলেন, অনেকখানি দূরদৃষ্টি ও ফুটবল জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে। আরও এল সীমান্ত প্রদেশ থেকে প্রেমলাল, ফয়জাবাদ থেকে নূর মহম্মদ ও কানপুর থেকে বিশ্বেশ্বর সিং। প্রেমলাল লাল নামে আর সিং সালার নামে পরিচিত হল। এত করেও খুব সুবিধা হল না, ষষ্ঠ স্থান পেয়েই তুষ্ট থাকতে হল।

আজিজ সাহেবের আকাঙ্খা উচ্চ। আব্দুল হামিদ মোহনবাগানে খেলতে এলে তারই সঙ্গে বন্ধুত্বের জোরে কোয়েটার স্থাণ্ডিমেরিয়ান্স থেকে কিছু খেলোয়াড় আনালেন। পুষ্ট হল দল। কিন্তু প্রেমলাল চলে গেছে কালীঘাটে, নূর মহম্মদ চলে গেছে ইস্টবেঙ্গলে। তা সত্ত্বেও রাণার্স-আপ হল, কে. আর. আর. 'বি'-র আট পয়েণ্ট পিছনে, ২২টি খেলায় ২৯ পয়েণ্ট করে। সেবারের দলগঠন ছিল—কালে খাঁ; রহমান ও শিরাজ; শফি, শেখ ও বাহার; আব্বাস, ইয়াসিন, রসিদ, গণি ও হাবিব। পূর্বপাকিস্তানের বর্তমান কালের নেতা হবিবুল্লা বাহার ইস্টবেঙ্গল থেকে এসে দলের অধিনায়কত্ব করলেন।

এবার আজিজ সাহেবের কাজ হল আরও কঠিন। ক্লাবের মাসিক আয় মাত্র আশি টাকা, মাঠ দেখাশোনা করাই কুলোয়না তাতে। ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের জোরে যার যা পকেট মারা যায়; কিন্তু ক্লাব সম্বন্ধে উৎসাহ কিছুই সৃষ্টি হয়না বিত্তশালী মহলে। অথচ প্রথম বিভাগ লীগে খেলতে হবে। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে টক্কর না দিতে পারলে চলবে কেন? কোন উৎসাহে মুসলিম জনসাধারণ দলে দলে আসবে সমর্থন করতে?

কিন্তু মুসলিম সংহতি এক অদ্ভুত জিনিষ। ইসলামের নামে আজিজ সাহেব যেখানে খেলোয়াড় খোঁজ করলেন, খুব বেগ পেতে হল না। সবচেয়ে বেশি এল বাঙ্গালোর থেকে, সেখানকার মুসলিম দল একযোগে সাড়া দিল। কোয়েটার আনোয়ার ছিল এখানে রেল কর্ম্মচারী, তার অধিনায়কত্বে দল গঠন হল। এল সীমান্ত থেকে জুম্মা খাঁ, এল বাঙ্গালোর থেকে মাসুম, মহীউদ্দিন ও রহমত; কালীঘাট ক্লাব ছেড়ে এল দিল্লীর আকিল আহ্‌মেদ। রেল দল ছেড়ে এল অতুলনীয় সামাদ।

ড্যালহৌসীকে হারালে চার গোলে, ক্যালকাটাকে দিলে তিন গোল, ইস্টবেঙ্গলের কাছে ১-২ গোলে হারলেও, মোহনবাগানের সঙ্গে ১-১ গোলে খেলা অমীমাংসিত হল। ক্রমে চ্যাম্পিয়ানশিপের আশা দেখা দেয় আর দলে দলে মুসলিমসাধারণ এসে জোটে খেলার মাঠে।

ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ফিরতি খেলায় আধপথে ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি এল। দেখা গেল হাফ-টাইমের পরে মহামেডানের এগার জনই বুট পায়ে বেঁধে নেমেছে। ওই বুটের জোরে ৪-২ গোলে জিতে গেল ওরা।

১৯৩২ সালে মহামেডান দলে স্যাণ্ডিমেরিয়ান্সের যে সব খেলোয়াড় ছিল, তারা সবাই ছিল বুটওয়ালা। অধিকাংশ সবুট খেলোয়াড়ের জোরে যখন দারুণ বৃষ্টির মধ্যে দ্বিতীয় বিভাগের খেলায় মহামেডান ১৪-০ দিয়েছিল নেবুবাগানকে সেদিনই আজিজ সাহেবের মাথায় ঢুকেছিল, প্রথম বিভাগে

খেলতে হলে বুট চাই। কিন্তু যথাসময়ে সেই চাই-কে কাজে লাগানোর প্রস্তাব করতে বাঙ্গালোরের খেলোয়াড়েরা প্রবল আপত্তি তুললে। তারা হরিণগতিতে টুকটক্ করে বল দিয়ে-নিয়ে এগোয়, পায়ের কায়দা খাটিয়ে। ভারি বুট পরে দেহের ওজন বাড়ানো, পায়ের কায়দা নষ্ট করা এবং গতি শ্লথ করা তাদের মনঃপূত হল না। অনেক ভেবে চিন্তে আজিজ সাহেব হাল্কা বুট পরীক্ষা করলেন, ফোর্ট উইলিয়াম থেকে তৈরী করালেন ঠিক পছন্দমত। সে বুট যেমন হাল্কা, চামড়া তেমনি নরম, পায়ের উপর অংশ প্রয়োজন ও ইচ্ছামত বাঁকানোর পক্ষে কোন অন্তরায় হয়না তাতে। তবে তলায় স্টাড দিয়ে জলকাদার মধ্যে খাড়া থাকার ব্যবস্থা ঠিকই রইল।

বাঙ্গালোরের খেলোয়াড়েরা পরীক্ষা করে দেখলো, ঠিক হায়; সাগ্রহে অনুমোদন করলে। এতদিন বর্ষার ফুটবলে ভারতীয়দের যে প্রধান দুষমন ছিল ভিজে মাঠ, তার প্রতিকূলতা দূর করবার হাতিয়ার জুটে গেল। শুকনো মাঠে শুধু পায়ের শর্ট-পাসিং খেলা যেমন চলছিল, সকালে নিজের মাঠ জলে ভিজিয়ে বুট পরে খেলার অনুশীলনও চললো তেমনি। এই যে টু-ইন-ওয়ান, অর্থাৎ একের ভিতর দুই, মহামেডান স্পোর্টিং-এর চূড়ান্ত সার্থকতায় পৌছবার এইটেই হল চিচিং ফাঁক। অর্থাৎ যে সব খেলোয়াড় শুকনো মাঠে খেলে পায়ের কায়দায় ও বিদ্যুৎগতি শর্ট পাসিং-এর খেলায় বুটপরা ভারী দলকে নাকাল করবে, তারাই আবার ভিজে মাঠে বুট পায়ে বৃষ্টির মধ্যে যুঝবে। এই ডবল কৌশল আবিষ্কার করেই মহামেডান তাদের জয়যাত্রার পথ বাঁধিয়ে ফেললে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ড্যালহৌসী ও মোহনবাগান থেকে তিন পয়েন্ট এগিয়ে থেকে কুড়িটা খেলায় ২৭ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়ে গেল মহামেডান স্পোর্টিং।

সেই কবে শীল্ড জিতেছিল মোহনবাগান। তারপর এই দীর্ঘ তেইশ বছর ইউরোপীয়ান সামরিক ও বে-সামরিক দলগুলির জয়জয়কার স্বীকার

করেই চলতে হয়েছে ভারতীয়দের, যতই ভালো খেলুক না কেন মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল। আর মহামেডান কিনা প্রথম প্রচেষ্টাতেই লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে গেল! ইংরেজ রাজত্বের পত্তনের ফলে যে মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল, সেই ক্ষোভে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতা থেকে দূরে সরে ছিল সাধারণ মুসলমান সমাজ। ফলে নবযুগের সাড়া, নবজীবনের চেতনা, নতুন জীবন-যাত্রার জৌলুষ—সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে মুসলিম সাধারণ ম্রিয়মান হয়ে জীবন যাপন করছিল। নব-ভারতের নবজীবনে তাদের স্থান খুঁজে না পেয়ে নিরুৎসাহ দারিদ্র্য ও বিষাদের মধ্যে দিন গুজরান করছিল। মহামেডান স্পোর্টিং-এর এই হঠাৎ-সার্থকতায় তারা দেখলে, মুসলমান এ যুগেও নব-জীবনের অন্ততঃ একটা ক্ষেত্রে সর্ব্বজয়ী হতে পারে। সারা কলকাতা বা সারা বাঙলা নয়, সারা ভারতময় সাড়া পড়ে গেল। মুসলিম সংহতি ও মুসলিম জাগরণের এক নতুন রূপ প্রকাশ পেল। চ্যাম্পিয়ান শব্দের নতুন অর্থ হল মহামেডান স্পোর্টিং। ঘরে ঘরে দোকানে দোকানে চ্যাম্পিয়ান দলের ছবি ঝুললো। পথে ঘাটে দরিদ্র খেটে-খাওয়া মুসলমান কাজ করতে করতে গান গাইতে লাগলো—"মহামেডান স্পোর্টিং তুমকো লাখো সালাম, হামলোগ দেশকা বাদশা হুয়া, আউর সব হায় গুলাম।" কবে কোন অতীতে বাদশাহী খুইয়ে মনের ক্ষোভে দিন কাটাচ্ছিল, এতদিন বাদে নতুন রাজ্যে নতুন বাদশাহীতে নতুন করে ধুলার তাজমহল গড়বার স্বপ্ন সার্থক হল।

এবার অভিজাত, সম্ভ্রান্ত, সম্পন্ন সবাই এসে জুটলে। সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধিতে বার্ষিক আয় উঠলো লাখ টাকায়। তবু ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে ক্লাব ভাঙ্গে ভাঙ্গে হয়েছিল। অনেক অশিক্ষিত খেলোয়াড়ের সরল বিশ্বাসকে ভাঙ্গিয়ে তাদের দলত্যাগ করাবার চেষ্টাও কিছু হয়েছিল। তার পর বাঙ্গালোরে এক খেলায় অশিষ্ঠ আচরণ করার অভিযোগে মুসলিম

দলের অনেকে যখন সাসপেণ্ড হল, তারমধ্যে মহামেডান স্পোর্টিং-এর অনেকেই ছিল। বুদ্ধি, চেষ্টা এবং প্রতিপত্তির ফলে আজিজ সাহেব সব বিপদ কাটিয়ে উঠলেন। স্বয়ং নাজিমুদ্দিন হলেন ক্লাবের সভাপতি। দলত্যাগী খেলোয়াড়েরা সবাই ফিরে এল। আর মিলিটারী-শাসিত বাঙ্গালোর এফ. এ-ও সাসপেনশন রদ করলে।

দ্বিতীয় বছরে এর সঙ্গে ভাইজাগ থেকে নতুন খেলোয়াড় আসে রহিম। হবিব আহত হলে তার জায়গায় প্রথম দিন খেলেই একা চার গোল করে, কলকাতা ফুটবলে স্থায়ী আসন করে নেয়। চিরদিনের দিগ্বিজয়ের ঐতিহ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে ওরা। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইস্টবেঙ্গল, ব্ল্যাকওয়াচ, মোহনবাগান, কালীঘাট সবাই সমান বিক্রমে চলছিল সাথে সাথে। শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলকে একপয়েণ্টে হারিয়ে মেরে বেরিয়ে এল মহামেডান।

১৯৩৬ সালে পুরানো মাঠ ছেড়ে নতুন মাঠে এল ওরা, আর সঙ্গে সঙ্গে সে মাঠ ঘেরার ব্যবস্থাও হল। জনপ্রিয়তা এত বাড়লো যে মহামেডানের মাঠই হল এখন সমগ্র মুসলিম সমাজের প্রধান মিলনকেন্দ্র। রমজানে এখানে সমবেতভাবে নমাজ ও রোজা-খোলার ব্যবস্থা হল। দরিদ্র মুসলিম সাধারণের উৎসাহ যত, দারিদ্র্যও তত। তাই খেলা দেখার প্রয়োজনে তারা ব্যাপকভাবে ঘরেতৈরী দু-কাঠের পেরিস্কোপ ব্যবহার সুরু করলে।

নতুন মাঠে তৃতীয় বছর লীগ জয়ের আকাঙ্খা। পরপর দুবছর লীগ তো এর আগে আটটা দল পেয়েছে। প্রথম সম্ভাবনায় ১৯১৭ সালে ক্যালকাটার কাল হয়েছিল মোহনবাগান, ফিরতি-খেলায় হারিয়ে স্বপ্নসৌধ ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। তবে ক্যালকাটা-ও দুঃখ পরে ঘুচিয়ে নিয়েছে ১৯২২-২৩ সালে। পর পর তিন বছর লীগ এই ডারহামসই সেদিন যা জিতেছে। সে কীর্তিকেও ছাপিয়ে যেতে হবে। নুর মহম্মদ ফিরে এসেছে, দিল্লী থেকে এসেছে গোলকীপার ওসমান। এল নাসিম, ছোট নুর

মহম্মদ ও সেলিম। নিঃসংকোচেই এগোচ্ছিল। হতভাগা অ্যাটাচ্‌ড্‌ সেকশান, খেলার নামে কিছু নেই, পেলতো মোট পাঁচ পয়েন্ট। কিন্তু খটাস করে প্রধান সৈন্য হাফিজ রসিদের টেংরি ভেঙ্গে দুখানা করে দিলে! তা হোক। তবু মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের সমস্ত প্রার্থনা ব্যর্থ করে এবারও চ্যাম্পিয়ান হল মহামেডান, দু পয়েন্ট পিছিয়ে রইল ব্ল্যাকওয়াচ।

বত্রিশ সালে প্রথম শীল্ড খেলতে গিয়ে প্রথম রাউণ্ডেই কালীঘাটের কাছে হেরে গিয়েছিল। পরের বছর ডি. সি. এল. আই-র বিরুদ্ধে চল্লিশ মিনিট কাল ৩-১ গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত হেরে গিয়েছিল ৫-৩ গোলে। চ্যাম্পিয়ান হয়েও প্রথমবার শীল্ডে সুবিধা হয়নি। বাগি-টিম ই. বি. আর. হারিয়ে দিয়েছিল প্রথম ম্যাচে। পরের বছর মনের জোর কিছু বেশি। তাই শীল্ডের খেলায় এগিয়ে গেল সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত, কিন্তু কাদা মাঠে ইস্ট ইয়র্ককে আর এঁটে উঠ্‌তে পারলে না।

এবার মনের জোর অনেক বেশি। ডারহামসের সমান রেকর্ড হয়েছে, তাদের রেকর্ড ভাঙ্গতে হবে এবার। যতই করুক, শীল্ড পায়নি একবারও ডারহামস। মনের সাধ আরও মিটলো, সেই ডারহামসেরই সাথে সাক্ষাৎ কোয়ার্টার-ফাইনালে, আর সে জয় লাভের আনন্দ কল্পনাতীত। ফাইনালে আর্মস্ট্রং বাদ সেধেছিল। শেষ পর্যন্ত ছোট রসিদ ও রহিম জিতিয়ে দিলে ২-১ গোলে।

এবার সত্যি—আউর সব হায় গুলাম। শুধু লজ্জায় ও সঙ্কোচে নয়, ভয়েই মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের মুখ দিয়ে কথা বার হয় না। মহামেডানের বিরাট সমর্থক-সংহতির মধ্যে বিজয়ী জাতির ঔদ্ধত্য তখন পুরোমাত্রায়। এতদিনের মাথা নিচু করে চলা বাসুকী যেন সুযোগ পেয়ে সহস্রফণা তুলে আত্মগৌরব ও আত্মশক্তি জাহির করে, সবাইকে ফোঁস ফোঁস করে শাসাচ্ছে—সাবধান। ১৯৩৭ সালের লীগ খেলায় ইস্টবেঙ্গলের কাছে

যখন হেরে গেল মহামেডান, তখন মাঠে যে ছোটখাট দাঙ্গা বেঁধেছিল, তার জন্য মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কর্তৃপক্ষ কম লজ্জা ও দুঃখ বোধ করেনি।

সে যাই হোক, একদিকে মুসলিম জনসাধারণের অকুণ্ঠ ভালোবাসা, আর একদিকে মুসলিম লীগ গভর্ণমেণ্টের সমগ্র কেউকেটা সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা, তার উপর অতুলনীয় রেকর্ড; মহামেডান স্পোর্টিং তখন সত্যিই দেশকা বাদশা। ১৯৩৮ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের উপর্যুপরি পঞ্চমবার পূর্ণ হলেও শীল্ড ফাইনালে ইস্টইয়র্কসের কাছে হারতে হল তৃতীয় দিনে।

১৯৩৯ সালে ইস্টবেঙ্গল ও কালীঘাটের সঙ্গে একযোগে আই. এফ-এ ছেড়ে বি. এফ. এ-র পত্তন করেছিল ওরা। শীল্ডের বিকল্প প্রতিযোগিতায় জয়ীও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মিটমাট হয়ে যেতে আবার আই. এফ. এ-তে চলে আসে সবাই। একটানা জয়যাত্রায় যে ছেদ পড়েছিল ১৯৪০-৪১ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে তারি ধারা রক্ষা করলে মহামেডান। কে. ও. এস. বি-কে ফাইনালে হারিয়ে ১৯৪১ সালে দ্বিতীয়বার শীল্ডও জিতলে। আর পরের বছর লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ ইস্টবেঙ্গলকে ছেড়ে দিতে হলেও শীল্ড ফাইনালে প্রতিশোধ নিয়ে সে ক্ষোভ মেটালে। চল্লিশ সালে রোভার্স কাপ জিতলে, জিতলে ডুরাণ্ড কাপ, দিগ্বিজয় পূর্ণ হল। শুধু আই. এফ. এ. শীল্ডের কোয়ার্টার-ফাইনালে রেঞ্জার্স-এর কাছে দু গোলে হেরে নিজের ঘরে পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় ফাঁকি পড়ে গেল।

যে কারণে আকবর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল, সেই একই কারণে মহামেডান স্পোর্টিং-এর প্রাধান্যও লোপ পেল। যে দল গঠনের জোরে ১৯৩৪-৩৫ সালের সার্থকতা, তারই উপর নির্ভর করে ও সার্থকতার গৌরবে মশগুল হয়ে ওরা ভুলে গেল যে, নতুন দলকে পুরাতনের স্থান নিতে হবে। তরুণ খেলোয়াড় সংগ্রহে উপেক্ষার ফল ফললো, একদিন আটকে গেল বিজয় রথের চাকা। অবশ্য মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের শ্রেষ্ঠ

খেলোয়াড়বৃন্দ যখন লণ্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় দলের পক্ষে খেলতে গেছে, সেই বছরে বেচন, আবিদ ও লতিফ, এই তিন নতুন খেলোয়াড়ের জোরে আবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল মহামেডান, এবং ইতিপূর্বে যা কখনো ঘটেনি তাই ঘটেছিল এবার, একটা খেলাতেও পরাজয় বরণ করতে হয়নি।

মহামেডান স্পোর্টিং-এর সার্থকতার মূলে ছিল তাদের দলগত সংহতি, দলগঠনের ভারসাম্য, এবং প্রতি খেলায় একটি নির্দিষ্ট মান, যে মান সব সময়েই একটা বিশিষ্ট স্তরে থেকেছে। অর্থাৎ একদিন খুব ভালো, আর পরদিন ছোঃ ছোঃ—এ ছিল না ওদের খেলায়। সবার উপর ছিল ওদের নিষ্ঠা ও বিজিগীষা, জিতবোই এই বিশ্বাস, জিততে হবেই এই পণ।

ব্যক্তিগত যোগ্যতায় গোলে ওসমান, ব্যাকে জুম্মা খাঁ ও তাজমহম্মদ; হাফে নাসিম, নূরমহম্মদ, সাবু, মহীউদ্দীন, মাসুম ও আকিল—প্রত্যেকেই একেবারে প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়। নূর ও আকিল কলকাতা ফুটবলের শ্রেষ্ঠ সেণ্টার-হাফ। আর ফরোয়ার্ডে রহিম-রসিদ-রহমতের জোড়া দেখা গেছে শুধু রবি গাঙ্গুলী-মোনা-দত্ত-কুমার ত্রয়ীর মধ্যে। রহমতের বুদ্ধির জোরে আক্রমণ কৌশল রচিত হয়েছে। রহিমের যেমন বুদ্ধি-খাটানো খেলা, তেমনি গোল করার ক্ষমতা। আর রসিদ, পেনালটি বক্সে পেলে অব্যর্থ শট বা হেড দেবেই, বিশেষ যদি বাঁ পায়ে বল পড়ে। তা ছাড়া কোন বিপদকে বিপদ মানে না, এমন মরিয়া সে। ড্যাশিং ও শুটিং-এর সমন্বয়ে সে মোনা দত্ত ও অভিলাষ ঘোষের যুগ্ম-প্রতীক। শুধু এই তিনজনের মধ্যেই যে অপরূপ সমঝোতা ছিল তাই নয়। আউটে প্রথমবার সামাদ, তার পর ছোট নূর মহম্মদ, ওদিকে আব্বাস বা ছোট রসিদ সকলেই দলের মধ্যে একেবারে মিলে মিশে এক হয়ে যেত। বাচ্চি খাঁ খেলোয়াড় ছিল ভালোই, তবে ওর মতো মারকুটো খেলোয়াড় কলকাতায় বেশি দেখা যায়নি।

ভারতীয়দের জাতীয় আন্দোলনে মোহনবাগানের যা ভূমিকা, তার চেয়ে গুরু ভূমিকা অভিনয় করেছে মহামেডান স্পোর্টিং পাকিস্তান অর্জনে। পাকিস্তানের জন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলনের কোন স্থান ছিল না এই খেলার ক্লাবে। কিন্তু যে বিরাট মুসলিম সংহতি গড়ে উঠেছিল এই ক্লাবকে কেন্দ্র করে, এবং মহামেডান স্পোর্টিং-এর অতুলনীয় বিজয়-অভিযানে আত্মপ্রতিষ্ঠার যে চেতনা ও প্রবল কামনা জেগেছিল মুসলমান জনসাধারণের মনে, পাকিস্তানের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনে তাকে সহজেই চালিত করা সম্ভব হয়েছিল।

আজও মহামেডান স্পোর্টিং শক্তিশালী দল, অতুলনীয় ঐতিহ্যের জোরে অধিকতর বলীয়ান। তবু সে তাজমহলের হীরে জহরৎ আজ ধুলোয় ছেয়ে গেছে। হয়তো মাঝে মাঝে চমক জাগে তার মধ্যে ; কিন্তু সে শুধু কাঁচের ঝলকানি, মণি-মুক্তার চেকনাই আর চোখে পড়ে না।



পর পর তৃতীয়বার লীগ চ্যাম্পিয়ান ও প্রথমবার শীল্ড বিজয়ী মহামেডান স্পোর্টিং (১৯৩৬)
উপরের সারি—বাচ্চি খাঁ, রসিদ (ছোট), রহিম, ওসমান, এম. এ. জাফর, সাবু, মাসুম ও আকিল আহমেদ।
মাঝের সারি—আজমৎ আলি, আব্বাস, খাজা নাজমুদ্দীন, কে নুরুদ্দীন, নুরমহম্মদ (বড়) ও সাফি ইস্পাহানি।
নীচের সারি—সাকি ও জুম্মা খাঁ।

ইস্টবেঙ্গলের জয়যাত্রা এরাই সুরু করেছিলেন ১৯৪২ সালে



উপরের সারি—সুহাস চক্রবর্তী, টবি বোস, সুশীল চ্যাটার্জী, নগেন রায় ও সোনু দত্ত।

দ্বিতীয় সারি—পরিতোষ চক্রবর্তী, ফটিক সিংহ, খগেন সেন, অজয় বোস, রবি দে ও আমিন।

উপবিষ্ট—রাখাল মজুমদার, প্রমোদ দাশগুপ্ত, সোমানা (অধিনায়ক), সুনীল ঘোষ ও গিয়াসুদ্দিন।

ভূমিতে—নীহার মিত্র, আপ্পা রাও ও অমিতাভ মুখার্জী।

দিকে দিকে বিজয় কেতন ওড়ে

পরাধীন দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামী সৈনিকের যে মহান ভূমিকা, কলকাতা ফুটবলের রণাঙ্গনে সে ভূমিকা মোহনবাগানের; আর উত্তর-স্বাধীনতা কালের দিগ্বিজয়ীর গৌরব-দীপ্ত ভূমিকা অভিনয় করেছে ইস্টবেঙ্গল। ফুটবলে যখন ইয়োরোপীয়ান যুগ চলেছে পুরোমাত্রায়, সে যুগেও ইস্টবেঙ্গল যথেষ্ট জন প্রিয় ও শক্তিশালী, লীগ তালিকায় একাধিকবার মোহনবাগানের উপরে থেকেছে। তবু সে যুগে গণমানস আচ্ছন্ন করেছিল মোহনবাগান, তাদেরই জাতীয় দল বলে গণ্য করেছে লোকে। ইস্টবেঙ্গল-কে বলেছে আর পাঁচটা ক্লাবেরই মত একটা ক্লাব, নিছক ক্লাব ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ফুটবলে যখন ভারতীয় যুগ এল, সাহেব ও গোরা-পল্টনদের সঙ্গে জাতিগত সংগ্রামের প্রশ্ন গেল লোপ পেয়ে, সেদিন থেকে খেলার জোরে ইস্টবেঙ্গলই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করলে। সত্য বটে ১৯১১ সালের অভাবনীয় কীর্তির অধিকারী মোহনবাগান, অর্ধশতাব্দীর উপর তাদের গৌরবময় ইতিহাস; জনসাধারণকে ফুটবলের রসে মজানোর কৃতিত্বও তাদের। কিন্তু যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোভাগে এল নতুন মূল্যবোধ। অর্থাৎ পরাধীনতার যুগে সাহেবদের পরাজিত করেছি, শুধুমাত্র সেই দাবীর জোরে বা প্রাচীনত্বের ওজুহাতে দল-বিশেষকে প্রধানের সম্মান দিতে অনেকেই অস্বীকার করলে। তারা বললে, সে যুগের সঙ্গে সে যুগের মূল্যবোধও লোপ পেয়েছে। এখন এস, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বীরত্ব যাচাই কর। সত্য কথা বলতে কি, এই যাচাই-এ ইস্টবেঙ্গল-ই জয়ী হয়েছে।

মহামেডান স্পোর্টিং-এর দুর্ধর্ষ বিজয় অভিযান কোন দিন শেষ হবেনা মনে করে যখন জনসাধারণের উৎসাহে প্রায় ভাঁটা পড়ে আসছে, এমন সময় সে অভিযান রুখে দিলে ইস্টবেঙ্গল ১৯৪২ সালে। এবং সেই থেকে দশ-বছরে পাঁচবার শীল্ড নিলে তারা, লীগ চ্যাম্পিয়ান হল ছবার, আর লীগ ও শীল্ডের যুগ্ম-মুকুট মাথায় তুললে তিনবার। পর পর তৃতীয়বার শীল্ড জয়ের মর্যাদা ভারতীয় দল হিসেবে ওরাই পেলে সর্বপ্রথম, রোভার্স ও ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতায়ও জয়ী হল। মহামেডান স্পোর্টিং-এর চেয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ান-শিপে একবার কম হলেও, আর সবদিকে তাদের রেকর্ড পর্যন্ত ভেঙে দিলে। লীগ শীল্ডের জোড়া-মুকুট ক্যালকাটা পর্যন্ত দুবারের বেশী মাথায় তুলতে পারেনি, মহামেডানও তাই; আর মোহনবাগান তা প্রথম তুলেছে ১৯৫৪ সালে, ইস্টবেঙ্গলের নবছর পরে।

পুরাণো যুগের ফুটবল দর্শক যাঁরা, তাঁরা হয়তো ইস্টবেঙ্গলের এই রেকর্ডকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন; বলবেন, ক্যালকাটা ড্যাল-হৌসী, ও কাস্টমস লোপ পেয়েছে, বিদায় নিয়ে চলে গেছে সব বৃটিশ পল্টন; এই অবস্থায় রামা-শ্যামার প্রতিযোগিতা, নামে তা আই, এফ. এ. শীল্ড, ডুরাণ্ড কাপ বা রোভার্স কাপ—যাই হোক না কেন, তাতে চূড়ান্ত সার্থকতা এমন আহা মরি কিছু নয়। কিন্তু ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় প্রাচীন কালের আন্তর্জাতিক আই.এফ.এ. শীল্ডের রেকর্ড ভাঙ্গাই ইস্টবেঙ্গল-এর পরম গৌরব নয়। স্বাধীন দেশের ফুটবল দল ইস্টবেঙ্গল-ই প্রকৃত পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় ফুটবলের মর্যাদা উচ্চে তুলে ধরেছে। স্বাধীন ভারতে সর্ব-প্রথম বিদেশ থেকে জাতীয় ফুটবল দল খেলতে এলো, ১৯৩৬ সালের স্মৃতির চমক জাগিয়ে, চীনা ওলিম্পিক টিম। ইস্টবেঙ্গল ধরে দুগোলে হারিয়ে দিলে তাদের। তারপর ভারতের মাটিতে ইয়োরোপীয়ান ফুটবল দলের দ্বিতীয় পরাজয়ও ঘটলো ইস্টবেঙ্গলের হাতে, যখন সুইডেনের গোটেবার্গ-কে

ওরা হারালে। বিদেশী দলের প্রথম পরাজয় ঘটেছিল ঢাকায় ১৯৩৭ সালে। দেশের মাটিতে বসে বিদেশী দলকে ঘরে পেয়ে হারাণো-ই বীরত্বের পরাকাষ্ঠা নয়। তাই ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দল ইউরোপ আক্রমণ করলে ১৯৫৩ সালে। সেখানকার প্রথম খেলাতেও বুখারেস্টের প্রতিযোগিতায় অস্ট্রিয়ার গ্রেজার এথলেটিক ক্লাবকে হারালে দুগোলে। রাশিয়ার ফুটবল খ্যাতি তখন দুনিয়ার সর্বত্র সোরগোল তুলেছে। তা সত্বেও চরম দুঃসাহস নিয়ে রাশিয়া অভিযান করলে ইস্টবেঙ্গল এবং প্রথম খেলাতেই মুখোমুখি হল রুশ জাতীয় চ্যাম্পিয়ান মস্কো টরপেডো-র। সে খেলায় ইস্টবেঙ্গল জিতবে এমন আশা সে ক্লাবের কোন উন্মাদ ভক্তও করেনি, বরং ওদের শোচনীয় পরাজয় সম্বন্ধেই নিশ্চিত হয়ে ছিল এদেশের জনসাধারণ। ইস্টবেঙ্গল পরাজয় এড়ালে সে খেলায়, কোনমতে ঠেকাঠুকি দিয়ে বা প্রাণপণে গোল বাঁচিয়ে নিরামিষ গোলশূন্য ড্র নয়। মার-খেয়ে মার দিতে ছাড়েনি ইস্টবেঙ্গল। তিন গোল খেয়েছ বটে, দিয়েছেও তিনটে। সমানে সমানে লড়াই করেছে। তারপর কি অবস্থায় কাদের বিরুদ্ধে কতগুলি গোল খেয়েছে সে দেশে ইস্টবেঙ্গল, তা ধর্তব্যই নয়। কাইরাস, দরায়ুস, নেপোলিয়ান, হিটলার—ইতিহাসের কোন যুগে কোন্ মহাবীর পুরুষই বা পর্যুদস্ত না হয়ে ফিরেছে রাশিয়া অভিযান থেকে?

অনেকের ধারণা যে ইস্টবেঙ্গলের গৌরবের যুগ কলকাতা ফুটবলে ইয়োরোপীয়ান যুগ ও মহামেডান স্পোর্টিং-এর যুগের অবসানে। কিন্তু ইয়োরোপীয়ান আধিপত্যের মধ্যেই দীর্ঘকাল ইস্টবেঙ্গল কলকাতার ফুটবলে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় দল হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছে।

আর আর যে সব প্রধানদল, তাদের জীবন ও কার্যকলাপ সুরু হয়েছিল অতি সাধারণ ভাবে। তারপর দীর্ঘকালের সাধনায় অনেক উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছে তারা। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের

ইতিহাস একেবারে অন্য ধরণের। উদ্দেশ্য স্থির করে, পরিকল্পনা সাঙ্গ করে, দলগঠন সমাপ্ত করে, ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে প্রথম আত্মপ্রকাশেই তারা প্রচুর সোরগোল তোলে এবং অবিলম্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে।

কলকাতা ফুটবলের প্রধান খেলোয়াড় তখন গোষ্ঠ পাল। তাজহাট, স্পোর্টিং ইউনিয়ান প্রভৃতি দল তখন পূব বাংলার খেলোয়াড়ে পুষ্ট। কিছু দিন আগেই ঢাকা উয়াড়ী লীগ চ্যাম্পিয়ান লিঙ্কনস্ এবং মোহনবাগানকে হারিয়ে দিয়ে পূর্বঙ্গীয় ফুটবলারদের যোগ্যতা প্রমাণ করে গিয়েছে। মোহনবাগানে তখন পূর্ব্ব বাঙলার অনেক খেলোয়াড় থাকলেও, ক্লাব পরিচালনার কর্তৃত্ব রয়েছে কলকাতার অভিজাত সমাজের হাতে। এই অবস্থায় জন-কয়েক পূর্ববঙ্গীয় বর্দ্ধিষ্ণু ও অভিজাত ফুটবল-রসিকের মনে বাসনা জাগে পূব বাঙলার খেলোয়াড়দের জড়ো করে পূর্বঙ্গীয়দের নিজস্ব ক্লাব প্রতিষ্ঠা করবার, এবং সর্বপ্রযত্নে সে ক্লাবকে কলকাতা ফুটবলে অন্যতম প্রধান ক্লাবে পরিণত করবার।

কুমারটুলি পার্কে ক্যালকাটা ইউনিয়ান বলে ছোট ছেলেদের যে ফুটবল ক্লাব ছিল, তাকে কেন্দ্র করেই জোড়াবাগানের সুরেশ চৌধুরী, কুমারটুলির তড়িৎ রায়, উয়াড়ীর নসা সেন প্রভৃতি মিলিত হলেন এবং ১৯২০ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করলেন, বাঙলার অন্যতম ক্রীড়া-গুরু অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়কে সভাপতি করে। প্রথম বছরে দলগঠন করে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হলনা। আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাকে লোকসমাজে প্রচার করবার উদ্দেশ্যে তারা শ্যাম স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হারকিউলিস কাপ-এর সিক্স-এ-সাইডে প্রতিযোগিতায় যোগ দিলে। সেই প্রথম কলকাতা ফুটবলে লাল-সোনালি জামা আত্মপ্রকাশ করলো, যে জামার ইজ্জৎ আজ ভারত-জোড়া, ভারতের বাইরে ইয়োরোপ এবং দূরপ্রাচ্যেও যা পরিচিত এবং সম্মানিত। একটা খবর আজ অনেকেরই জানা নেই যে, প্রথম যে দল

সে জামা গায়ে পরে মাঠে নেমেছিল, তাদের অধিনায়ক ছিলেন স্বয়ং গোষ্ঠ পাল।

প্রতিযোগিতা সিক্স-এ-সাইড হলেও এবং শ্যাম পার্কে অনুষ্ঠিত হলেও তাতে ডি. সি. এল. আই. 'এ.' ও 'বি.' টিম যোগ দিয়েছিল। ইস্টবেঙ্গলের দল গঠন ছিল—গোলে নগেন কালী, ব্যাক গোষ্ঠ পাল, হাফ-ব্যাক নসা সেন, আর ফরোয়ার্ডে উল্টেপাল্টে খেলেছিলেন জ্ঞানা পোদ্দার, ধীরা মিত্র, ক্রিকেটার শৈলেন বসু ও প্রশান্ত বর্ধন। ডি, সি. এল. আই. 'বি' টিমকে সেমি-ফাইনালে এক পয়েণ্টে (কর্ণার) ও ফাইনালে 'এ' টিমকে এক গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়। এক আনা টিকেট দিয়ে সে খেলা দেখবার জন্য শ্যাম পার্ক লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল, অবশ্য এখনকার চেয়ে বেশ কিছু বড় ছিল তখন সে পার্ক।

পরের বছর পাকাপাকি দল গঠন করে দ্বিতীয় বিভাগ লীগে তাজহাটের শূন্য স্থান দখল করলে ইস্টবেঙ্গল। গোষ্ঠবাবু আর কোন দিনই খেলেননি সে দলে, কিন্তু তাজহাট দলের অধিকাংশই ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিলে। প্রথম বছরেই ইস্টবেঙ্গল ২৪টা খেলায় ৩২ পয়েণ্ট করে এবং একটি মাত্র খেলায় পরাজয় বরণ করে তৃতীয় স্থান দখল করলে। দলের সংগ্রামী শক্তি আরও পরিস্ফুট হল, শীল্ডের খেলায়। কারণ প্রথম রাউণ্ডেই ওদের খেলতে হল লীগ চ্যাম্পিয়ান ড্যালহৌসীর সঙ্গে। তিন দিন ড্যালহৌসীকে রুখলে শিশু ইস্টবেঙ্গল, তারপর চতুর্থ দিনে বৃষ্টির মধ্যে দুগোলে হেরে গেল।

পরের বছর লীগে এক ধাপ নেমে গেল বটে, তবে ৮২ গোল-করা এবং একটাও গোল-না-খাওয়া চ্যাম্পিয়ান দল দুর্ধর্ষ ৫১ কোং আর. জী. এ-কে যে একটিমাত্র পয়েণ্ট হারাতে হয়েছিল, তা ইস্টবেঙ্গলের-ই কাছে। কিন্তু জনচিত্ত জয় করলে ইস্টবেঙ্গল সে বছরের শীল্ড প্রতিযোগিতায়। প্রথম রাউণ্ডে একদিকে মোহনবাগানের খেলা পড়েছে চ্যাম্পিয়ান ক্যাল-

কাটার সঙ্গে, অপর দিকে ইস্টবেঙ্গলের ভাগ্যে জুটেছে আর. জী. এ-র মুখোমুখী হওয়া।

মোহনবাগান যখন হেরে গেল, সমগ্র বাঙালী ম্রিয়মান, জাতির মর্যাদা প্রথম রাউণ্ডেই ধূলিসাৎ হয়েছে। কেউ আশা করেনি যে আর. জী. এ-কে হারিয়ে সে মর্যাদা উদ্ধার করবে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু সত্যিসত্যিই যখন ৩-১ গোলে জিতে গেল ইস্টবেঙ্গল, রাইট-আউট থেকে একাই দুটো গোল করলেন আশু দত্ত, তখন আনন্দে আত্মহারা হল দলমতনির্বিশেষে সকল বাঙালী। ভেবেছ কি? না হয় দাদাকে কাৎ করেছ, তা বলে ছোট ভাই কি ফেল্না? জাতির মুখরক্ষা করতে সেই যুঝবে। প্রাণপণ যুঝলেও তারা। পরের খেলা কাস্টমসের সঙ্গে। ক্যালকাটার সবচেয়ে শক্তিমান দলের বিরুদ্ধে একটি মাত্র পয়েণ্ট ছিনিয়ে ও একটি মাত্র গোল করে রয়েল আইরিশের রেকর্ড পুনরাবৃত্তির পথে অন্তরায় হয়েছে কাস্টমস। তা হোক, কুছ পরোয়া নেহি। প্রাণপণে খেলে এক গোলে হারিয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। এবার আর কথা নেই, পূব বাঙলার লোক আর পশ্চিম বাঙলার লোক, মোহনবাগান-পাগলের দল—সবাই এক যোগে স্বপ্ন দেখতে লাগলো, এবার বুঝি বাঙালী দ্বিতীয়বার শীল্ড-বিজয়ী হয়। কিন্তু বর্ষাই বাদ সাধলে। জামালপুরের ফিরিঙ্গীদল মাথায় রুমাল বেঁধে ধাক্কাধাক্কি করে ড্যালহৌসী মাঠের ছর্‌ছরে জলের মধ্যে দু গোলে হারিয়ে দিলে ইস্টবেঙ্গলকে। ইস্টবেঙ্গলের প্রতি এতখানি আস্থা জেগেছিল যে, ইস্টবেঙ্গলকে যারা হারিয়েছে তারাই যে শেষ পর্যন্ত শীল্ড জিতবে, এমন কথাও বলেছে অনেকে।

পরের বছর একটু দুর্বৎসর গেল। কিন্তু ১৯২৪ সালে যোগ দিলেন হেমাঙ্গ বোসের সঙ্গে মোনা দত্ত।

১৯২৪ সালে দ্বিতীয় বিভাগ লীগে যে কৃতিত্বের জোরে ইস্টবেঙ্গল প্রথম বিভাগে খেলবার দাবী জানায় এবং সে দাবী স্বীকৃতির জন্য আইন

পরিবর্তনের সার্থক আন্দোলন চলে, তা নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। একাধিক পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হয়েছে যে ইস্টবেঙ্গল সে বছর চ্যাম্পিয়ান ক্যামেরন 'বি'র সঙ্গে সমান পয়েণ্ট পেয়েছিল। কিন্তু আই, এফ, এ-র সরকারী নথীতে অন্য কথা আছে এবং তাকে অস্বীকার করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এই নথীমত ১৯২৪ সালে দ্বিতীয় বিভাগ লীগে চ্যাম্পিয়ান হয় পুলিশ। তাদের হিসেব ছিল ২৪-১৫-৭-২-৩৭—৬-৩৭। সমান পয়েণ্ট করেও গোলের হিসেবে ক্যামেরন 'বি' হয় রাণার্স-আপ। ইস্টবেঙ্গল ২৪-১৩-৬-৫-৩৪-১৭-৩২ এই হিসেবে খেলা শেষ করে তৃতীয় স্থান লাভ করে। কি অবস্থায় ইস্টবেঙ্গল পরের বছর প্রথম বিভাগে খেলবার অধিকার পেয়েছিল, তা বিশদভাবে অন্য প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম বিভাগে ওঠার পর ইস্টবেঙ্গলের দল আরো শক্তিশালী হল। এরিয়ান্স থেকে এল গোলকীপার পূর্ণ দাস, হাফ-ব্যাক হারাণ সাহা ও তুলসী দাস এবং ফরোয়ার্ড সূর্য চক্রবর্তী। মোহনবাগান থেকে এলেন হাফ-ব্যাক মণি দাস। প্রথম খেলায় ক্যালকাটার কাছে ১-৪ গোলে হেরে গেলেও, ষোলটা খেলার আটটায় জয়ী হয়ে চতুর্থ স্থান পেলে ওরা; গোল দিলে মোট ১৭টা, অধিকাংশই মোনা দত্তর জোরে। সব চেয়ে উদ্দীপনা জাগলো যখন প্রথম সাক্ষাৎ হল মোহনবাগানের সঙ্গে। লেফট-আউট নেপাল চক্রবর্তী গোল করে জিতিয়ে দিলে সে ম্যাচ। শীল্ডের খেলায় কাস্টমস্ ও ড্যালহৌসীকে হারিয়ে তৃতীয় রাউণ্ডে উঠেছিল সেবার। দুদিন অবিরত আক্রমণ করেও হেভি ব্যাটারির গোলকীপার ব্যামস্ফোর্ডকে গোল দিতে না পেরে, তৃতীয় দিনে বৃষ্টির মধ্যে হেরে গেল তিন গোলে।

পরের বছর মোনা দত্ত চলে গেল মোহনবাগানে। ফলে গোল দেওয়ার ব্যাপারে যে দুর্বলতা এল, তাতে লীগ তালিকায় অনেক নীচে পড়ে থাকতে

হল। কিন্তু ডুরাণ্ড কাপ খেলতে সিমলা গিয়ে চতুর্থ রাউণ্ড পর্যন্ত উঠে গেল, তারপর দুর্ধর্ষ ডারহাম্‌স্‌-এর কাছে হারতে হল শোচনীয়ভাবে।

কিন্তু খেলার চেয়ে সেখানে বেশি উত্তেজনার সৃষ্টি হল প্রশান্ত বর্ধনের এক অদ্ভুত খেয়ালের ফলে। এক পাহাড়ী একটা সাপ ধরে নিয়ে দেখাতে এসেছিল বাঙালী বাবুদের। কি খেয়ালে সাপটা কিনে ফেললেন বর্ধন এবং সিজার্স সিগারেটের একটা বড় টিনের গায়ে অনেকগুলো ফুটো করে তার মধ্যে রাখলেন সেটাকে; তারপর দড়ি দিয়ে কষে বাঁধলেন টিনটা। ঢালা বিছানারই এক পাশে দেওয়ালের ধারে-রাখা সাপের টিন দেখে সবাই ভয়ে জড়সড়, সসর্প গৃহে বাস তো শাস্ত্রমতে মৃত্যুরই সামিল। অনেকে ঝগড়াও করলে বর্ধনের সঙ্গে, সে কিন্তু নাচার। প্লেটে দুধ ঢেলে সাপের মুখ চেপে ধরে পরম ধৈর্যে দু ঘণ্টা ধরে এক চামচ দুধ খাওয়ায়। একদিন বিকেলে দেখা গেল টিনের বাঁধন আল্‌গা, সাপ উধাও। বর্ধনের সে কি দুঃখ! অন্য সবার মনে দারুণ ভয়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ঘরময় বিছানা কম্বল পেঁটরা ছড়ানো। এরমধ্যে কোথায় লুকিয়ে রইল সাপ? সব ওলোট পালট করে খোঁজা হল, কিন্তু কোন হদিশ পাওয়া গেল না। মহা ভয়ে সারারাত জেগেই কাটালে সবাই, আর প্রশান্তকে শাপান্ত করলে।

১৯২৮ সালে এল দুর্দিন। মোনা দত্ত ফিরে এসেছে, আগের বছরই দুলাল এসেছে চাটগাঁ থেকে, দুর্দান্ত টিম। তবু কি যেন অভিশাপ লাগলো! পূর্ণ দাস খেলা ছেড়ে দিয়েছে, এমন অবস্থায় অপর গোলকীপার মণি তালুকদার পড়লো রোগে। পর পর ডজন খানেক গোলকীপার বদল করেও কোন সুরাহা হল না। ৪২টা গোল খেয়ে আর এগারটা খেলায় হেরে লীগ তালিকায় সবার নীচে পড়ে থাকতে হল, মাত্র ন' পয়েন্ট সম্বল করে। তবু শীল্ডে শেরউড ফরেস্টার্সের সঙ্গে ড্র খেললে একদিন। পর দিনও দুগোল খেয়ে দুগোল শোধ করলে, তারপর আর এক গোল খেয়ে হারলে।

দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে হল পরের বছর। কিন্তু খেলোয়াড়দের দলপ্রীতি অপূর্ব। মোনা দত্তই যা ফের মোহনবাগানে চলে গেল, আর কেউ দল ছাড়লে না। বাঘা বাঘা খেলোয়াড়, আন্তর্জাতিক খেলায় স্থান যাদের বাঁধা, তারাও পরম নিষ্ঠায় দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে লাগলো হাসি-মুখে। তবু শেষ পর্যন্ত হাওড়া ইউনিয়ান থেকে আট পয়ণ্টে পিছিয়ে থাকতে হল রাণার্স-আপ হয়ে।

ত্রিশ সালে লীগ খেলা বন্ধ। কিন্তু একত্রিশ সালে দারুণ রোখ নিয়ে খেললে। ২২টা খেলায় ৫৭টা গোল করে আর ৩৭ পয়েণ্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হল। যোগ্যতা প্রমাণ করে স্বাধিকার বলে আবার উঠে এল প্রথম বিভাগে।

যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে হৃত মর্যাদা উদ্ধার করলে, তারই জোরে এবার ওরা আরও উঁচুতে হাত বাড়ালে। দুর্দান্ত বিক্রমে খেলে সবার আগে চলতে লাগলো, পিছনে তেড়ে আসছে ডারহামস। ৩-৩ গোলে ড্র করলে তাদের সঙ্গে। কিন্তু শেষ তিনটে খেলায় কি যে হল! স্পোর্টিং ইউনিয়ান, কাস্টমস ও এরিয়ানের কাছে হেরে গেল। এক পয়েণ্ট এগিয়ে থেকে ডারহামস-ই হল চ্যাম্পিয়ান।

কুছ পরোয়া নেহি, বেটার লাক নেক্‌স্ট টাইম। পরের বছরও চললো আগে আগে, কিন্তু লাক আর বেটার হল না। শেষ পর্যন্ত আবার এক পয়েণ্টের জন্য রাণার্স-আপ হতে হল, সেই ডারহামস-এরই পিছনে। মহামেডান স্পোর্টিং-এর প্রথম বছরের সার্থকতার পরেই, পথ রোধ করে দাঁড়ালো ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু মোহনবাগানকে চার গোলে হারিয়েও বগি টিম এরিয়ান্সের কাছে হেরে গিয়ে আবার সেই এক পয়েণ্টের ঘাটতি। এমনি করে তিন তিন বার ঠোঁটের ডগা থেকে পিছলে গেল প্রথম বিভাগ লীগের কাপ।

১৯৩৭ সালেও রাণার্স-আপ হয়ে এতদিনে খেলোয়াড়দের মনোবলে

ভাঁটা পড়েছে। বিশেষ করে ই বি আর, কাস্টমস, হাওড়া ইউনিয়ান ও দিল্লী এফ-এ-র কাছে পরাজিত হয়ে শীল্ডের খেলায়ও বিদায় নিতে হয়েছে এক দু রাউণ্ডে। ১৯৪১ সালে কোয়ার্টার-ফাইনালে পৌঁছেও এরিয়ানের হাতে মার খেয়েছে। এমন সময় নতুন করে দলগঠন করলেন নতুন সহ-সম্পাদক জ্যোতিষ গুহ ও নতুন ফুটবল সম্পাদক সুধীর সেন। অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসানে যে দল খাড়া হল, তার মধ্যে পুরাণো খেলোয়াড় রইলেন একমাত্র ব্যাক প্রমোদ দাশগুপ্ত, আর অগের বছরের সুনীল ঘোষ, সোমানা ও আপ্পারাও। কিন্তু এরাই পত্তন করলে ইস্টবেঙ্গলের নতুন গৌরবদীপ্ত যুগ। সামান্য'র জন্য বারবার যে ব্যর্থতা এসেছে, তার গ্লানি মুছে ফেললে। মহামেডান স্পোর্টিং-কে তিন পয়েণ্টে পিছিয়ে ফেলে লীগ চ্যাম্পিয়ান হল ১৯৪২ সালে। এমন কি শীল্ডের ফাইনালেও পৌঁছলো এই প্রথম। কিন্তু মহামেডানের কাছে ২-১ গোলে হেরে জোড়া-মুকুটের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হল।

তবে কিন্তু কলকাতা ফুটবলে ইস্টবেঙ্গলের যুগ সুরু হয়ে গেল। কারণ, পরবর্ত্তী দশ বছরে লীগে দুবার মাত্র মোহনবাগানের পিছনে রইল ওরা, ১৯৪৩ সালে দু পয়েণ্ট পিছিয়ে আর পরের বছর এক পয়েণ্ট। আরও দুবার এর মধ্যে লীগ পায়নি ওরা; ১৯৪৮ সালে যেবার লণ্ডন ওলিম্পিক উপলক্ষ্যে ওদের অধিকাংশ খোলোয়াড় অনুপস্থিত, আর ১৯৫১ সালে যেবার অস্বাভাবিক পরিবেশে রাজস্থান ও জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে চার পয়েণ্ট হারাতে হয়েছিল। শীল্ডের ফাইনালে পৌঁছতে পারেনি মাত্র দুবার। একবার সেমি-ফাইনালে হারে ভবানীপুরের কাছে, আর একবার বাঙ্গালোর ব্লুজ-এর কাছে হারে তৃতীয় রাউণ্ডে। বাকী প্রতি বছরই শীল্ড ফাইনাল পর্যন্ত গতি হয়েছে অবাধ।

ইস্টবেঙ্গল জাতীয় দল বলে মর্যাদা পায়নি সে যুগে, সে খ্যাতিতে

একাধিপত্য ছিল মোহনবাগানের। আর এ যুগের পরিবর্তিত পরিবেশে জাতীয় দলের প্রশ্নই লোপ পেয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি সাহেব ও গোরা-পল্টনের যুগেও দু-দুবার ডারহামসকে বিভীষিকা দেখিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। বোধ-হয় বিধাতার-ই নির্দেশ ছিল-শ্বেত-প্রাধান্যের হানি হবে না এইকালের মধ্যে; নইলে অমন ভাবে ভাঙা শামুকে পা কাটে বার বার!

সব যুগেই মহামহারথী খেলোয়াড়ের দেখা পাওয়া গেছে ইস্টবেঙ্গলের দলে। প্রথম যুগে মোনা মল্লিক, প্রশান্ত বর্ধনের মত আউট, ধীরা মিত্র ও সূর্য চক্রবর্তীর মত ইন কলকাতা ফুটবলের অঙ্গনে চমক জাগিয়েছে। ধীরা মিত্র ও বর্ধন নিয়মিত খেলেননি প্রথম বিভাগে ওঠার পরে। কিন্তু মোনা মল্লিক ও সূর্য চক্রবর্তীর খেলা আজও ভোলা সম্ভব হয়নি, ভারতীয় দলে তাঁদের স্থান ছিল বাঁধা। মোনা মল্লিক অদ্ভুত ফাস্ট, রাণিং-বলে সেণ্টার করায় ছিল অনবদ্য দক্ষতা। ছোটখাটো মানুষটি সূর্যবাবু, কিন্তু সর সর করে যখন বেরোয়, কে ঠেকায় তাকে? তারপর ১৯২৭ সালে আসেন দুলাল গুহ ঠাকুরতা। বল একটু থামিয়ে সেণ্টার করলে, ফ্রী-কীক বা কর্ণার-কীক করলে, বিপদ ঘটতোই বিপক্ষ এলাকায়। দুলালবাবু দীর্ঘদিন খেলেছেন, তাঁরই অধিনায়কতায় ইস্টবেঙ্গল সে যুগের সবখানি সাফল্য অর্জন করেছে।

সে যুগের অপর ক্ষুরধার খেলোয়াড় দানাপুরের রেলকর্ম্মচারী মজিদ। ইনের খেলোয়াড়। পায়ে আঠা না মাখিয়েও বল নিয়ে বিপক্ষকে নাচাতে পেরেছে যে কজন মুষ্টিমেয় খেলোয়াড়, মজিদ তাদের অন্যতম। একাই বিপক্ষের এগারজনকে নাচিয়ে ছেড়েছিল ১৯৩১ সালে সারা ভারত রেলদল বনাম আই. এফ. এ-র খেলায়। কলকাতার মাঠে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেই খেলায় মজিদের দেওয়া গোলেই রেল দল ৩-১ গোলে জয়ী হয়েছিল।

১৯৩৪ সালে ভারতীয় দলের দক্ষিণ অফ্রিকা সফরের সবচেয়ে সার্থক খেলোয়াড় লক্ষ্মীনারায়ণ ও রমন ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে বাঙ্গালোর ফুটবলে উৎকর্ষ প্রথম দেখায়। এযুগের অন্যান্য কৃতী খেলোয়াড়দের মধ্যে হীরু সেন, মুরুগেশ; হীরা দাস ও পাখী সেন উল্লেখযোগ্য। ১৯৪১ সালে দলে আসে সোমানা, আপ্পারাও-এর মতে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ সেণ্টার-ফরোয়ার্ড। ১৯৪৫ সালের সার্থকতার মূলে ছিল সেণ্টার-ফরোয়ার্ড নায়ার, সে বছরে তার গোল দেওয়ার রেকর্ড আজও অটুট। এযুগের অন্যতম সার্থক ফরোয়ার্ড সুনীল ঘোষ। আর পাগ্সলে দুপায়ের শটে গোল-কীপারদের কাঁপিয়ে দিত। শেষের যুগে আহ্মেদের ভেল্কি দেখে বিদেশীরা তাজ্জব বনেছে; ভেঙ্কটেশ ও সালেহ্ বিপক্ষের বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে, ধনরাজ পরম নৈপুণ্যে আক্রমণে সংহতি রক্ষা করেছে। তবু ইস্টবেঙ্গলের এযুগের মহাগৌরব-স্তম্ভের প্রধান স্থপতি আপ্পারাও। ধীর, শান্ত, নম্র, চমক নেই; কিন্তু এমন কার্যকরী খেলা, আক্রমণকে এমন হুহু করে এগিয়ে দেবার ক্ষমতা, আর কারো মধ্যে দেখা যায়নি এযুগে। নিজে গোল করার চেষ্টা নেই, কিন্তু অন্যকে গোল করবার সদর রাস্তা খুলে দেবেই সে বার বার। আর এমন ক্লাব প্রীতি যে, বার বার অবসর নিয়েও এই পক্ককেশ প্রবীন আজও ক্লাব থেকে আহ্বান গেলে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেন।

কলকাতার ফুটবলে স্মরণীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে আর যাঁরা ইস্টবেঙ্গলে খেলেছেন, তাঁদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় সেণ্টার-হাফ ননী গোঁসাই এবং গোলকীপার মণি তালুকদার। পূর্ণ দাসের মত চমক ছিল না; কিন্তু তারই যুগেও গোলকীপার হিসেবে তালুকদারের দাবী স্বীকৃত হয়েছে; আর পূর্ণ দাসের পরে বহুদিন সেই ছিল নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ গোলকীপার। ননী গোঁসাই বোধ হয় কলকাতা ফুটবলের সর্বশ্রেষ্ঠ সেণ্টার-হাফ। নূর মহম্মদ ও আকিল আহমেদের সঙ্গে তাঁকে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সেণ্টার-হাফ

বলা যায়। আর আর হাফ-ব্যাকদের মধ্যে কমল গাঙ্গুলী এবং পরবর্তী যুগের অজিত নন্দী ও বেবী গুহ উল্লেখযোগ্য। ইস্টবেঙ্গলের প্রথম যুগে একসাথে চারজন শ্রেষ্ঠ ব্যাক ছিল সে দলে। প্রফুল্ল চ্যাটার্জী ১৯২৪ সালের দূর প্রাচ্য সফরকারী বাঙলা দলে ঠাঁই পেয়েছিলেন। ভানু দত্ত রায়, ভোলা সেন ও দীনেশ গুহ ভারতীয় দলে খেলবার মর্যাদা পেয়েছেন অনেকবার। পরের যুগে যে সব ব্যাক ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ বিভাগের দৃঢ়তা বজায় রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় পরেশ মজুমদার ও প্রমোদ দাশগুপ্ত। সবাই চতুর্থ দশকের খেলোয়াড়। তারও পরের যুগে নাম করেন মোহনবাগান-ফেরত পরিতোষ চক্রবর্তী, মহামেডান স্পোর্টিং ও ভবানীপুর-ফেরত তাজমহম্মদ, রাখাল মজুমদার এবং ব্যোমকেশ বোস।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সংগঠকদের মধ্যে নাম করতে হয় প্রথম যুগে বনোয়ারীলাল রায় ও জিতু মুখার্জী, আর পরের যুগে কপি ঘোষ ও জ্যোতিষ গুহ। পঞ্চম দশকের শেষের দিকে যে দল ইস্টবেঙ্গলকে গৌরবের সপ্তম স্বর্গে তুলে দিয়েছিল, সে দল-গঠনের যুগ্মকৃতিত্ব তদানীন্তন সম্পাদক কপি ঘোষ ও জ্যোতিষ গুহ-র। জ্যোতিষ বাবু নিজে প্রথম শ্রেণীর গোলকীপার ছিলেন, এরিয়ানের হয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে পরে স্পোর্টিং ইউনিয়ান ও ইস্টবেঙ্গলে খেলেন। ১৯৩৩ সালে সিংহল সফরকারী দলে ছিলেন তিনি। পরে কিছুদিন আই. এফ. এ-র সম্পাদক হয়েছিলেন।

বয়সে মোহনবাগান, এরিয়ান্স এবং মহামেডান স্পোর্টিং-এর চেয়ে নবীন হলেও ইস্টবেঙ্গল আজ ফুটবলে ভারতের অন্যতম প্রধান সংগঠন। ইংল্যাণ্ডের ফুটবল বার্ষিকীতে পর্যন্ত গে স্বীকৃতি মিলেছে। অনবদ্য সংগ্রামী ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করেই তারা এ যুগের বিজয় স্তম্ভ গড়ে তুলেছে।

একাল ও সেকাল

আমার যৌবনেই পৃথিবী ছিল সবচেয়ে সুন্দর ও মধুর ; দুনিয়ার সবকিছু সে যুগে যত ভাল ছিল, তেমনটি আর হবেনা কোনদিন। প্রবীণমাত্রই যে পুরানো যুগের ফুটবলের আলোচনায় গদ্গদ হয়ে পড়েন, তার মধ্যে এই মনোভাব অনেকখানি কাজ করে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় দশকে গোষ্ঠ পাল-কুমার-গাঙ্গুলী-মোনাদত্ত-সূর্য চক্রবর্ত্তী—মোনা মল্লিক-সামাদ-কলভিন-বেনেট-ড্যালজিল-ফেন-হোসী-নাইট-এর খেলা দেখে আমরা যখন বিস্ময়মুগ্ধ, তখনও বুড়োর দল বলেছে, এখনকার খেলা আর কি দেখবো, যে সব খেলা দেখেছি! পর পর সব যুগেই এই মনোভাব নিজের এবং অপরের মধ্যে অনুভব করছি।

তাবলে আজকের ফুটবলের মান যে আগের যুগের ফুটবলের চেয়ে মোটামুটি অনেক নিচে, একথা কোনমতেই অস্বীকার করা চলেনা। অবশ্য সে যুগের দর্শক যে এ যুগের খেলায় থ্রিল খুঁজে পায়না, তার প্রধান কারণ ফুটবলের পরিবেশ আজ একেবারে বদলে গেছে। সেদিন পরাধীন ভারতের লাঞ্ছিত জনসাধারণের সমগ্র চেতনা ছেয়েছিল বৃটিশ-বিদ্বেষ, আর ফুটবলেই ছিল সে বিদ্বেষকে রূপ দেবার প্রধান সুযোগ। অথচ নিরাসক্ত মন নিয়ে উচ্চাঙ্গের খেলা উপভোগ করবার সুযোগও ছিল সে যুগে, যখন বৃটিশ সামরিক ও বে-সামরিক দলের সংঘর্ষ হত। বিশেষ করে শীল্ডের প্রথম দিকে দেশী দলগুলি বিদায় নিতেই মনে এতটুকু ভাবপ্লাবন না জাগিয়েই খেলা দেখতে যাওয়া চলতো, যেমন চলতো ইংল্যাণ্ড বনাম

স্কটল্যাণ্ডের বার্ষিক খেলা দেখতে যাওয়া। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে যে সব খেলোয়াড় পল্টনী দলগুলির হয়ে কলকাতায় খেলেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই পল্টন ছেড়ে বৃটিশ পেশাদারী ফুটবলে যোগ দিয়ে খ্যাতি ও সম্পদ অর্জন করেছে। তাদের খেলা, আর শুধুপায়ে বাঙালীর হাতে তাদের ভেল্কিনাচন—সবসময়েই অপরিসীম আনন্দ দিত।

তারপর ছিল ভারতীয় দল ও ইয়োরোপীয় দলের মধ্যে আন্তর্জাতিক খেলা। ইয়োরোপীয়ান-মার্কা দল ই. বি. আর-এর ভারতীয় খেলোয়াড় সামাদকে ভারতীয় দলে খেলতে দেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। লীগ ও শীল্ডে সাহেবদের একচেটে শ্রেষ্ঠত্বের যুগেও ভারতীয় দলই অধিকাংশবার জয়ী হয়েছে, তিনগোল পাঁচগোল পর্যন্ত দিয়েছে। সেদিন তাতে যেভাবে জাতীয় শ্লাঘা চরিতার্থ হয়েছে, তা ভাবতেও শিহরণ জাগে। কিন্তু খেলোয়াড়দের মধ্যে জাতীয় চেতনা যে ক্রমে কমে আসে তার প্রমাণ, ইয়োরোপীয়ান প্রাধান্যের যুগ অবসান হবার পরে ইয়োরোপীয়ান দল আগের চেয়ে বেশী সার্থকতা অর্জন করেছিল এই আন্তর্জাতিক খেলায়। এমন কি ১৯৪০ সালে, ফুটবলে যখন ভারতীয়করণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে বলা যায়, সেবারে অধিকাংশ কলকাতা-জনম ফিরিঙ্গী নিয়ে গড়া ইয়োরোপীয়ান দল জিতেছিল ৩-১ গোলে। কিন্তু ১৯১৩ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক খেলায় ভারতীয় ও ফিরিঙ্গীরা ছিল একদল, অপর দল ছিল ইয়োরোপীয়ান। শীল্ডের সময় সামরিক বনাম বে-সামরিক, অথবা স্থানীয় বনাম আগন্তুক দলের খেলায় উৎসাহ জাগতো প্রচুর, এমন কি বাঙালী খেলোয়াড়রা দলে পড়বার আগে থেকে। ১৯১৫ সালে সুকুল, শিবদাস ও অভিলাষ ঘোষই স্থানীয় দলের প্রথম বাঙ্গালী খেলোয়াড়।

খেলার মাঠে সাহেব মারার উত্তেজনায় "মেরে মরো ভাই" চীৎকার ছিল বাঁধা। আর বুট পায়ে ষণ্ডামার্কাদের বিরুদ্ধে মারলে যে মরতে হবে,

এবিষয়েও সংশয় ছিলনা। তাই মারবার বা মরীয়া হয়ে খেলবার নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে এই আশ্বাসও দেওয়া হত গ্যালারী থেকে, "ঠ্যাং রেখে যাও ভাই সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব"। বলা বাহুল্য, চঞ্চলমতি জনতা কালকের বীরকে সহজেই ভুলে গেছে।

আজ দেশ স্বাধীন, বৃটিশ বিদ্বেষও নেই, বৃটিশের ফুটবল শক্তিও অন্তর্হিত। তাই আজকের ফুটবলে উৎসাহের মূল প্রেরণা কোন জাতিগত বিদ্বেষ নয়, ক্লাবপ্রীতিই আজ প্রধান প্রেরণা, প্রবীণদের সেকেলে মন তাতে ভরুক আর নাই ভরুক।

আজ ফুটবল-প্রেমিকের সংখ্যা অনেক অনেক বেশী। কিন্তু বিশেষ মনোভাবে সেদিনের ফুটবলে আকৃষ্ট হত যারা, তাদের মনের শূন্যতা আজকের নতুন পরিবেশে আর মিটছেনা। তারা বলছে, সবই বুঝলাম কিন্তু মোহনবাগানের মোহন কোথায়? যাদ থাকেই, অচিন্ত্য সেনগুপ্তের ভাষায় "মোহন সিরিজের উপন্যাসের মতই তা বাসি"। ইস্টবেঙ্গলের সেকেলে ভক্তরা বলছেন, বেঙ্গল যদিওবা থাকে, ইস্টের কণামাত্র আজ নেই।

তবে এই স্বাভাবিক পরিণতি। জনগনকে রিক্রিয়েশন দেওয়া ও আন্তর্জাতিক ফুটবলের ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধিতে পুরানো দৃষ্টিভঙ্গীর স্থান নেই। তাই আজ জাতির নিজস্ব শুধুপায়ের ফুটবল-মণীষা বিসর্জন দিয়ে বুট পরে বিশ্বের সার্বজনীন কৌশল গ্রহণ করতে হয়েছে। ফুটবল যে দেশে এত জনপ্রিয়, সে দেশের ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে দেহে মনে ও কৌশলে দুনিয়ার সঙ্গে টক্কর দেবার মত ফুটবল দল গড়ে তোলা একেবারেই অসম্ভব নয়। কিন্তু স্বাধীন দেশের পরিবেশ ও প্রয়োজন বদল হয়ে থাকলেও, সংগঠকদের মধ্যে নবচেতনা জেগেছে কি?
